কার্ল পি. সোয়ানসন

জীবকোষ

জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও জৈব রসায়ন অনুষদের স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উপযোগী।

তপন চক্রবর্তী
অনূদিত

বাএ ২৫৭৭

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, নভেম্বর ১৯৮১। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, উপপরিচালক, বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : কাশবন মুদ্রায়ণ, ১ ভিতরবাড়ি লেন, ঢাকা-১১০০। বাংলাদেশ। প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ ইদ্রিস। প্রকাশনার সার্বিক তত্ত্বাবধান : চৌধুরী আবদুর রহমান। মূল্য : ৯০.০০ টাকা

JIBA KOSH (THE CELL by Carl P. Swanson)Translated by Tapan Chakraborty. Published by Bangla Academy, Dhaka - 1000, First reprinted in February 1992. Price : Taka 90.00. US$ 3.00.

ISBN 984-07-2586-6

banglainternet.com

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

banglainternet.com

আধুনিক জীববিজ্ঞান সিরিজের ভিত্তিসমূহ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পঞ্চাশ, পঁচিশ এমন কি দশ বছর আগের ও আজকের জীববিজ্ঞান এক নয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যন্ত্রপাতি ও কৌশলের সাহায্যে আজ গবেষণা ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা যোগ করা সম্ভব করছে, ফলে নূতন নূতন আবিষ্কার হচ্ছে এবং জীববিজ্ঞানের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। আমরা সবাই এ বিষয়ে সচেতন যে, নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ কোন আবিষ্কার কেবল আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করে না, এ আবিষ্কার আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং জীববিজ্ঞানের ভিত্তিসমূহের পুনর্মূল্যায়নেও বাধ্য করে। সুতরাং, আধুনিক জীববিজ্ঞানের গতিশীল রূপের সার্বিক উপস্থাপনা আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য এক বড় কষ্টসাধ্য কাজ। এটি তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জও বটে।

এই সিরিজের গ্রন্থকারেরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে জীববিজ্ঞানের সংঘটনকল্পে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জরুরী প্রয়োজন বোধ করেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি জীববিজ্ঞানকে ছাত্রদের কাছে সক্রিয় ও গতিশীল বিজ্ঞানরূপে তুলে ধরবে এবং তা জীববিজ্ঞানের প্রতিটি শিক্ষককে তাঁর পাঠদানের স্তর ও কাঠামো নির্ণয়ে সুযোগ দেবে। একটিমাত্র পাঠ্যপুস্তক এ ধরনের বহুমুখি দাবি মেটানোয় অক্ষম। লেখকদের দৃঢ়বিশ্বাস, ছাত্রদের প্রার্থিত চাহিদা মেটানোয় ও শিক্ষকদের বিশেষ অধিকার সংরক্ষণে, এ ধরনের সংক্ষিপ্ত, সুলিখিত, সুচিত্রিত ও স্বল্পমূল্যের গ্রন্থ-সিরিজই কাম্য। সিরিজের গ্রন্থ-প্রণয়ন অত্যন্ত পরিকল্পিত। পরিকল্পনা এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে মূল বিষয়বস্তু সহজে বোঝা যায় এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানের অবস্থা ও গতিকে সম্যক জানা যায়। আধুনিক জীববিজ্ঞান সিরিজের ভিত্তিসমূহ উপরিলিখিত সব চিন্তাভাবনার মূর্তরূপ। সিরিজের প্রতিটি ভল্যুম স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ, আবার এটি পুরো সিরিজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে।

banglainternet.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : জীবনের কৌষীয় ভিত্তি ১ — ১২

কোষতত্ত্ব ৪

কোষবিদ্যার যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল ৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : কোষের গঠন ১৩ — ৪০

কোষের উপরিতল ১৫

অন্তঃপ্লাজমীয়-জালি ২১

গলজী কমপ্লেক্স ২৫

সাইটোপ্লাজমীয়-ক্ষুদ্রাঙ্গ ২৭

কৌষীয় অন্যান্য উপাদান ৩৫

নিউক্লিয়াস ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় : কোষ-বহির্ভূত উপাদানসমূহ ৪১ — ৫০

উদ্ভিদকোষ প্রাচীর ৪২

আন্তঃকৌষীয় উপাদান ও কোষের বার্ধক্য ৪৯

চতুর্থ অধ্যায় : কোষ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ৫১ — ৮১

কোষের আকৃতি ৫২

কোষের আকার ৫৯

তুলনামূলক কোষবিদ্যা ৬৬

সংকোচনশীল কোষ ৬৮

পরিবাহী কোষ ৭১

উৎপাদক কোষ ৭৩

আদিকোষ ৭৭

ভাইরাস ৮০

banglainternet.com

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিভাজনরত কোষ ৮২ — ১০৩
মুলশীর্ষের বিভাজনরত কোষ ৮৫
প্রাণিকোষের বিভাজন ৯১
কোষ-বিভাজনে ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ ৯৩
কোষ-বিভাজনের স্থিতিকাল ৯৯
কোষ-বিভাজনের তাৎপর্য ১০১

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মিয়োসিস ও যৌন প্রজনন ১০৪ — ১২৪
মিয়োসিসের বিবিধ দশা ১০৭
মিয়োসিসের অবদান ১১৫
নিষেক ১২০
বংশগতিতে মিয়োসিসের গুরুত্ব ১২১

সপ্তম অধ্যায় ঃ দেহের বিকাশে কোষের ভূমিকা ১২৫ — ১৪২
বৃদ্ধি ১২৬
পৃথগীভবন ১২৮
পৃথগীভবন বনাম বৃদ্ধি ১৩০
বিনষ্টি বা অর্জনরূপে পৃথগীভবন ১৩৪
নিউক্লিয়াসের পৃথগীভবন ১৩৮
অখণ্ডত্ব ১৪০

অষ্টম অধ্যায় ঃ দেহের মৃত্যুতে কোষের ভূমিকা ১৪৩ — ১৫২
কোষ-প্রতিস্থাপন ১৪৪
কোষের মৃত্যু ও স্বাভাবিক বিকাশ ১৪৮

পরিভাষা ঃ ১৫৩ — ১৬০
বাংলা-ইংরেজি ১৫৩
ইংরেজি-বাংলা ১৫৭
গ্রন্থপঞ্জী ১৬১
শব্দপঞ্জী ১৬২ ১৬২ — ১৬৮

banglainternet.com

ইতিহাসের রোমাঞ্চকর নাটকসমূহের মধ্যে জানার সংগ্রাম হল একটি। প্রতিটি লোক যিনি কখনো কিছু জানার চেষ্টা করেছেন তাঁকে অল্পবিস্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

রিচার্ড আর. পাওয়েল

প্রথম অধ্যায়

জীবনের কৌষীয় ভিত্তি

আজকের জীববিজ্ঞানসমূহ আমাদেরকে গভীর ও অর্থবহ শিক্ষাদানে যে সক্ষম এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রতিটি মানুষ ও জীব যে স্বতন্ত্র ও অসাধারণ, জীববিজ্ঞান শুধু এই ধারণা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নয়, আণবিক সংজ্ঞার আলোকে জীববিজ্ঞান এই স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণও হাজির করেছে। বর্তমানে আমরা জেনেছি যে, উপরিলিখিত অসাধারণত্বের গঠন ও কার্যগত ভিত্তির মূলে রয়েছে কোষ। সুতরাং এ গ্রন্থের লক্ষ্য, কোষ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা।

আমরা জানি, আমাদের চারপাশের জগৎ এক ধরনের ঘোলাটে, নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশামাত্র নয়। বস্তু, উপাদান ও এসবের সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে জগৎ গঠিত। এসব বিষয়কে আমরা বর্ণনা করতে পারি এবং এসবের পরিমাপও নিতে পারি। এসকল সামগ্রীর প্রতিটি যে অসাধারণ তা আমরা স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ, শ্রুতি ও দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পারি। আবার এসবকে আলাদাভাবে কমবেশী শনাক্ত করাও সম্ভব। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আকাশ ও মাটিকে পানি থেকে, গ্যাস ও কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থ থেকে এবং জীবকে জড় থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে আমরা অসুবিধা বোধ করি না। আরো সূক্ষ্মভাবে, আমরা অমসৃণতার হার, রঙের মাত্রা ও বৈচিত্র্য (যদি বর্ণান্ধ না হয়ে থাকি) নির্ণয় করতে পারি এবং লবণ, মিষ্টি ও তেতোর সাথে অম্ল স্বাদের প্রভেদ বুঝতে পারি। প্রভেদ নির্ণয়ে মানুষের সংবেদন-ক্ষমতা সীমিত। মানুষ শব্দ-তরঙ্গের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই শুধু শুনতে পায়। আলোক বর্ণালীর সে অংশটুকুই দৃষ্টিগোচর হয় যেটুকুকে বলা যায় বর্ণালীর দর্শনক্ষম অংশ (চিত্র ১.১)। যখন আমরা শ্রবণ ও দর্শনের এই

banglainternet.com

সীমা অতিক্রমণের প্রয়াস পাই তখন বস্তুর ভৌত-প্রকৃতি আর উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে তখন আমাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়।

সুতরাং যন্ত্র মানুষের বাড়তি বোধিরূপে কাজ করে। মাউন্ট প্যালোমারের ২০০ ইঞ্চি দীর্ঘ হেলি টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাবিশ্বের সহস্র সহস্র আলোকবর্ষের দূরস্থিত ছায়াপথ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আর অলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্র এবং ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র ক্ষুদ্রতর বিশ্বের অদৃশ্য অক্ষরসমষ্টিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলে। একইভাবে আমাদের চোখের তুলনায় আলোক-চিত্রের প্লেট অধিকতর সুবেদী (sensitive) এবং এটি আমাদেরকে অধিক আলোক-রশ্মি ব্যবহারে সাহায্য করে। তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে সাধারণত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আলোক-সুবেদী তল ব্যবহার করে আমরা বর্ণালীর একপাশে অবলোহিত রশ্মি এবং অপর পাশে হ্রস্ব অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি ও গামা-রশ্মিকে ধরতে পারি।

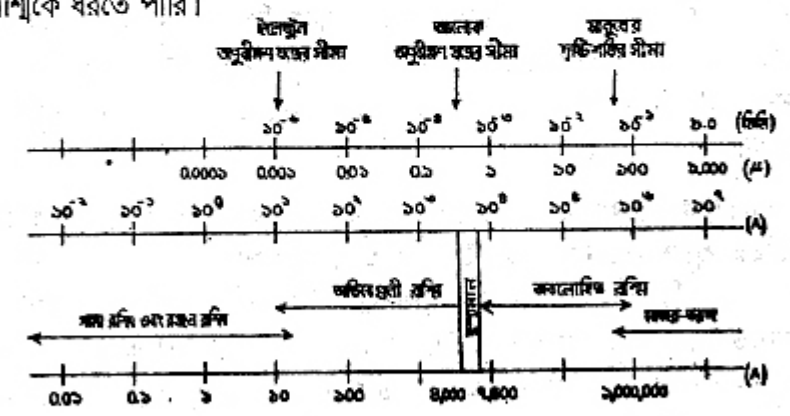

চিত্র ১.১ ঃ লগ স্কেলে তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীকে মিলিমিটার (mm), মাইক্রন (μ) এবং এঙ্গস্ট্রম (Å) এককের পরিমাপে দেখানো হচ্ছে। ১ μ = ০.০০১ মিমি = ১০,০০০ Å। মানুষের চোখের, সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রের ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের ক্ষমতার নিম্নসীমা এতে দেখানো হয়েছে।

যে উপায়ই অবলম্বন করি না কেন আমরা যে 'সামগ্রী'কে পর্যবেক্ষণ করি তাকে একটি এককের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পাই। আমাদের জ্ঞান যত সূক্ষ্ম হয়, যন্ত্র ও প্রয়োগ কৌশল যতই শক্তিশালী হয় এবং আমরা প্রভেদ নির্ণয়ে

যতই সক্ষম হই, ততই এসব এককের সংজ্ঞা সংক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ এককের সীমা ও মূল চরিত্র সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায়। যদি আমরা শ্রেণীবিন্যাসে আগ্রহী হই তাহলে দেখব, কোন কোন সময় এই এককসমূহ দলবদ্ধ হয়ে একটি অর্থবহ পদ্ধতিতে পরিণত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, অক্ষর জ্ঞান না থাকলে পাঠক এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহ পড়তে পারতেন না। পারতেন না মেট্রিক ও শততমিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে। অথচ এসব অক্ষর আমাদের ভাষার মূল একক।

পরমাণুর পর্যায়-সারণী (periodic table of atoms) এ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশক একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটির বড় কৃতিত্ব এই যে, এর সাহায্যে নির্দিষ্ট ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিমণ্ডলে বস্তুর অবস্থা কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা জীববিজ্ঞান নির্বিশেষে বিজ্ঞানের প্রথম লক্ষ্য হল, বস্তু সম্পর্কিত এককের অসাধারণত্ব নির্ধারণ করা। কারণ, নির্দিষ্ট গবেষণাক্ষেত্রে ওসব একক যদি সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বজনবোধ্য না হয় তাহলে বিজ্ঞানের সেই শাখায় বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

বিজ্ঞান দুধরনের এককে ব্যবহার করে। বর্ণনা বা সময়, ওজন ও দূরত্ব মাপার জন্য ব্যবহৃত এককসমূহের ইচ্ছামত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কিন্তু ওসবকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে স্ট্যাণ্ডার্ড এককরূপে মেনে নেই। যেমন, তড়িৎচুম্বক বর্ণালী মাপার জন্য মিলিমিটার (mm), মাইক্রন (μ) বা এঙ্গস্ট্রমস (Å), প্রভৃতি এককসমূহের সুবিধাজনক সাহায্য নেওয়া হয় (চিত্র ১.১)। অবশ্য ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন প্রভৃতি এককের ভৌতিক অস্তিত্ব থাকে। এসবকে যে কেউ যন্ত্র ও যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করতে পারেন।

জীবনের মৌল একক স্বরূপ অপর যে এককটি সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করব এর নাম কোষ। কোষের ভৌতিক অস্তিত্ব রয়েছে। পদার্থবিদরা অণুকে যেমন করে ভাঙ্গেন, আমরা কোষকে এর চেয়েও বেশী ভেঙে নির্বাচিত অংশসমূহকে বের করে আনতে পারি। কোষের ভগ্নাংশ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এর কাজ চালাতে পারে। যেমন, অক্সিজেন গ্রহণ, শর্করা গাজান এবং এমনকি নূতন মৌল সৃষ্টিতেও এটি সক্ষম হয়। কিন্তু এই সব অংশ এককভাবে আর জীবন গঠন করতে পারে না। একইভাবে অণুর অংশবিশেষ অণুর আচরণের সমান আচরণ প্রদর্শনে সক্ষম হয় না। কোষের ভগ্নাংশে অনির্দিষ্টকাল জীবনের স্পন্দন থাকে না। সুতরাং, উপসংহারে

banglainternet.com

কোষকে ভৌতিক একক বলা যায় যা জীবনকে ধারণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও, আমরা দেখি, কোষকে একক হিসাবে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়।

অবশ্য, পরমাণু ও অণুর তুলনায় কোষ আকার ও জটিলতার বিচারে অনেক বড় একক। কোষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ। কোষের নির্দিষ্ট সীমানা আছে। সীমানার ভিতরে অবিরাম রাসায়নিক ক্রিয়া চলে। রাসায়নিক ক্রিয়াহীন কোষ মৃত। কোষতত্ত্ববিদরা কোষের ধরন নির্ণয়ের প্রয়াস পান ; কোষের অংশসমূহের স্বতন্ত্র ও সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের নিরিখে এর আকার ও গঠন-প্রকৃতি জানতে চান ; সর্বোপরি কোষকে শুধু একটি আলাদা সত্তারূপে দেখার পরিবর্তে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখতে চান।

কোষতত্ত্ব

কোষ যে জীবনের মূল একক, বর্তমানের এই সুপরিচিত ধারণাকেই 'কোষতত্ত্ব' বলা হয়। কোষতত্ত্বকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ না করে একে কোষ সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ বলেই মেনে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ কোষতত্ত্ব শুধু এটুকুই জানায় যে, জীবসমূহের দেহ কোষ দ্বারা গঠিত। ১৮৩৮-৩৯ সালে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী এম. জে. শ্লাইডেন ও প্রাণিবিজ্ঞানী থিয়োডর শোয়ান কোষতত্ত্বকে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার চূড়ান্ত সংঘটিত ও সংশ্লেষিত রূপ হিসাবে দাঁড় করান যা পরবর্তীকালে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমপর্যায়ের কীর্তিরূপে গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, ডারউইনের বিবর্তনবাদও আধুনিক জীববিজ্ঞানের একটি ভিত্তি প্রস্তর। বস্তুত জীবন বলতে আমরা যে পর্যন্ত বুঝি সে পর্যন্ত কোষের আকার ও কার্যাবলী বোঝা যায়।

সাধারণত ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মহৎ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উদ্ভব ঘটে। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ ও তাঁদের চিন্তাধারা কালের প্রবাহে টিকে থাকে। কোষ আবিষ্কারের ইতিহাসে ১৮৩৮-৩৯ সাল এবং শ্লাইডেন-শোয়ানের নামের গুরুত্ব প্রথমবারের মতো আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। ইংরেজ রবার্ট হুক সর্বপ্রথম ১৬৬৫ সালে তাঁর নূতন আবিষ্কৃত সেকেলে অণুবীক্ষণযন্ত্রে (চিত্র ১.২) একখণ্ড কর্কের মধ্যে কোষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অবশ্য, হুকের আবিষ্কার জীবন্ত দেহের আকৃতির উপর সুসংবদ্ধ গবেষণার অংশবিশেষ নয়। ফলে, বহু বছর যাবৎ এসব আবিষ্কার চমকপ্রদ আকস্মিক ঘটনা হিসাবেই থেকে গেছে। জীববিজ্ঞান গবেষণার

সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য, রবার্ট হুকই তাঁর নূতন আবিষ্কৃত জগতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠসমূহকে কোষ নামে অভিহিত করেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ যে কোষ ও কোষ-উদ্ভূত পদার্থ দিয়ে গঠিত এই তথ্যকে প্রথমে বিশ্বাস ও প্রচার করার কৃতিত্ব শুধু শ্লাইডেন ও শোয়ানের নয়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের অনেক গবেষক কোষের ব্যাখ্যা দেন এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে

চিত্র ১.২ : বৃত্তে রবার্ট হুক অঙ্কিত কর্কের আণুবীক্ষণিক চিত্র ; যে অণুবীক্ষণযন্ত্রে চিত্রটি ধরা পড়ে তার ছবি ; গবেষণা সম্পর্কিত হুকের প্রতিবেদন :— "আমি কর্কের ভালো, স্বচ্ছ একটি টুকরো এবং ক্ষুরধার একটি ছুরি নেই। কর্ক থেকে একটি টুকরো এমনভাবে কেটে নেওয়া হয় যাতে এর উপরিতলকে খুব মসৃণ দেখায়। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সহায়তায় পরিশ্রম সহকারে খণ্ডটিকে পর্যবেক্ষণ করি। মনে হল ওতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এসব আদৌ ছিদ্র কিনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হল না। . . . মসৃণ টুকরো থেকে অতি সরু একটি খণ্ড কেটে নিয়ে কালো প্লেটের উপর রাখা হয়। তারপর সমতল ও উত্তল আয়নার সাহায্যে খণ্ডটির উপর আলোকপাত করা হয়। এভাবে আমি সহজে একে চমৎকার মৌচাকের ন্যায় রন্ধ্রময় দেখতে পেলাম। কিন্তু ছিদ্রগুলিকে সুবিন্যস্ত দেখলাম না। . . . ছিদ্র বা কোষসমূহকে খুব গভীর মনে হল না তবে এসবকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্সের ন্যায় দেখা গেল। বাক্সসমূহ পরস্পর কতিপয় পর্দা দ্বারা বিভক্ত থাকার কারণে এদের মধ্যে দীর্ঘ ছিদ্র পরিলক্ষিত হল। ব্যাপারটি শুধু কর্কের ক্ষেত্রেই নয়। আমার অণুবীক্ষণযন্ত্রে এলডার গাছের মজ্জা এবং অন্য সব গাছ ও সব্জী ধরনের গাছ যথা ফেনেল, ডগকাস, রীড-ডকস, টিসেলস, ফার্ন প্রভৃতির ফাঁকা কাণ্ডে বা মজ্জায় একই ধরনের শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করেছি।"

banglainternet.com

বলেন। ১৮০০ সালে উন্নত ধরনের অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। কাজেই, সে সময় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়। ১৮০০ সালে সব গবেষকই মোটমুটি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, জীবাঙ্গসমূহ কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের সংজ্ঞা, উৎস এবং দেহের বৃদ্ধিতে কোষের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও মতভেদ ছিল প্রচুর। শ্লাইডেন ও শোয়ান এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা ও গবেষণাকে সংকলন করে একটি বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ হিসাবে একে হাজির করেন।। জীববিজ্ঞানের সেই যুগে এই মতবাদ একটি পূর্ণ অর্থ বহন করে। বর্তমানে আমরা জানি তাঁদের চিন্তাধারায় অনেক ভুল ছিল। যদিও তাঁরা কোষের মূল আবিষ্কারক নন, তবু তাঁরা কোষ-তত্ত্বকে যেভাবে সংশ্লেষ ও সংঘটন করেন তা বিশেষ লক্ষণীয়। কোষের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে, দেহের সংঘটন ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোষ একটি গঠনগত ও কার্যগত একক। সমসাময়িককালে তাঁরা জীববিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করেন এবং কোষের আকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোষের গঠন সম্পর্কিত ধারণা না থাকলে জীববিজ্ঞান বিশুদ্ধ বর্ণনামূলক অবস্থা থেকে অগ্রসর হতে পারত না।

শ্লাইডেন ও শোয়ানের প্রায় বিশ বছর পর জার্মান ডাক্তার রুডল্‌ফ্ ফিরখভ্ একটি নূতন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করে বলেন, **পূর্বস্থিত কোষ থেকেই নূতন কোষের উদ্ভব ঘটে।** শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সংযোগে গর্ভাধান প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলে এটি আরো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জীবন বংশপরম্পরায় কোষের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারারই অনুবৃত্তি। সুতরাং, কোষের বৃদ্ধি, বিকাশ, উত্তরাধিকার, ক্রমবিবর্তন, রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু কোষেরই বিবিধ আচরণের প্রতিরূপ।

অধিকাংশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, যা এসবের বিশ্বজনীন স্বীকৃতিতে সন্দেহের ছায়াপাত করেছে। এটি কোষতত্ত্বের ব্যাপারেও সত্য। কিন্তু কোষের আকার সম্বন্ধে বিশদ পর্যবেক্ষণের আগে আমরা এসব ব্যতিক্রমের ব্যাপারে একটি ভিন্ন দৃষ্টির আশ্রয় নেব। বর্তমানে প্রচলিত কোষতত্ত্বের ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যাক। এই সম্পর্কিত ধারণা তিন প্রকার।

প্রথমত, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কোষতত্ত্বানুসারে শুধু কোষের মধ্যেই জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সুতরাং জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগত কাজের অভিব্যক্তির উপর জীবদেহের কাজ নির্ভর করে। আমরা দেখব, ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদের এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন দরকার হবে। কারণ, প্রচলিত অর্থে ভাইরাসের দেহে কোষের আকার নেই। দ্বিতীয়ত, প্রথম সিদ্ধান্তের

banglainternet.com

পরিপূরক হিসাবে কোষতত্ত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় যে, জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের একটি কৌষীয় ভিত্তি আছে। আমরা এখন এই বক্তব্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত গুণের অবিরাম প্রবাহের ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে পারি। এই প্রবাহে কেবল পুরো কোষই অংশ গ্রহণ করে না। বস্তুত কোষের কতিপয় ক্ষুদ্রতম অংশ যথা ক্রোমোজোম ও জিন এতে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয়ত, কোষের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। একে পারস্পরিক সম্পূরক তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এর অর্থ হল, কোষের নির্দিষ্ট গঠন-প্রণালীর উপর এর জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। কোষের বিবিধ অংশ আলোচনার সময় এ বিষয়ের উপর আবার আলোকপাত করা হবে।

ফ্রান্সের জীবাণুতত্ত্ববিদ আঁদ্রে লোফ কোষতত্ত্বের সারমর্ম অন্যভাবে উপস্থিত করেছেন ঃ*

যখন জীবজগৎকে কোষস্তরে বিবেচনা করা হয় তখন এর মধ্যে একত্বের সন্ধান মিলে। এই একত্ব তিন প্রকারের ; **পরিকল্পনা, কাজ ও গঠনের একত্ব।** প্রত্যেক কোষের প্রোটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস ডুবে থাকে। এটি হল পরিকল্পনার একত্ব। প্রত্যেক কোষে বিপাক ক্রিয়া মোটামুটি এক ধরনের। এই বিষয়টি কাজের একত্বের সাক্ষ্য দেয়। তৃতীয়ত গঠনের একত্ব ; জীবের প্রধান বড় অণুগুলি একই ধরনের ছোট অণু দ্বারা গঠিত। জীবের ব্যাপক বিবিধায়নের জন্য প্রকৃতি কড়াকড়ির মাধ্যমে মাত্র কতিপয় নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচিত করেছে। স্বল্প সংখ্যক নির্মাণ সামগ্রী বড় অণুতে নিপুণভাবে সংগঠিত হবার ফলে জীবের বিবিধায়ন, উত্তরাধিকার এবং প্রজাতি বিবিধায়নের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব হয়েছে। বড় অণুগুলির নির্দিষ্ট কাজ থাকে। মেশিন শুধু সীমিত নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তৈরি হয়। আমরা এর প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু এতে অভিভূত হওয়া উচিত নয়। জীবিত তন্ত্রসমূহ যদি এর করণীয় কাজ সম্পন্ন না করে, তাহলে এসবের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমাদের শুধুই জানা দরকার তন্ত্রসমূহ কিভাবে করণীয় কাজ সম্পাদন করে।

banglainternet.com

* A. Lwoff, Biological Order. (Cambridge, Mass. N. I. T. Press, 1962), P. 11,13.

কোষবিদ্যার যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল

জীববিজ্ঞানসমূহের অগ্রগতি সোজা পথে আসেনি। সূক্ষ্মযন্ত্রের বিকাশ ও বিশ্লেষণের কৌশলের উপর এর অগ্রগতি নির্ভরশীল ছিল। সূক্ষ্ম যন্ত্র ও কৌশল বিশেষ করে সাইটোপ্লাজম-বিষয়ক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য ছিল। কতিপয় কোষ এত বড় যে

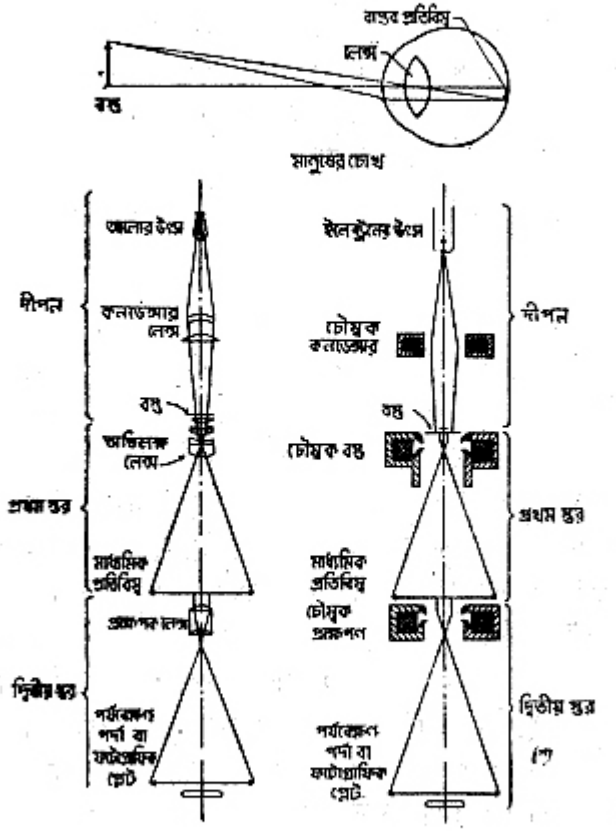

চিত্র ১.৩ : চোখের, সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রের ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের অপটিক্যাল সিস্টেম বা আলোক-পদ্ধতি নক্‌শার সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

এসবকে খালি চেখেই দেখা সম্ভব। কিন্তু কোষের ভিতরের গঠনশৈলী পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোষকে অতি বড় করে দেখানো দরকার। এ কারণে, সময় সময় কোষের নির্বাচিত অংশে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

banglainternet.com

কোষতত্ত্ববিদ ও জ্যোতির্বিদ উভয়ের কাছেই যথেষ্ট মাত্রায় বিবর্ধনের ব্যাপারটি একটি সমস্যা। দ্রষ্টব্য বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে কোষতত্ত্ববিদকে দেখতে হয় ক্ষুদ্র কোষ আর জ্যোতির্বিদকে পাড়ি দিতে হয় দীর্ঘ পথ। আমাদের সুবিধার্থে বিবর্ধন সমস্যাকে লেন্সের **বিশ্লেষণ ক্ষমতার** (resolving power) নিরিখেই বিচার করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ ক্ষমতার সহায়তায় ঘনসন্নিবিষ্ট দুটো বস্তুকে দেখার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে স্পষ্ট শনাক্ত করা যায়। যেমন, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি তারাকে সাধারণের চোখে একটি তারারূপেই প্রতিভাত হবে। কিন্তু অধিক বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সে দুটি তারাই স্বতন্ত্রভাবে ধরা পড়বে। জটিল অণুবীক্ষণযন্ত্রে (compound microscope) প্রথম বিবর্ধক লেন্সের বিশ্লেষণ ক্ষমতা হচ্ছে এর ক্রান্তি গুণাঙ্ক (critical factor)। ১.৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, জটিল অণুবীক্ষণযন্ত্রে বীক্ষণ সামগ্রীর নিকটস্থ **অবজেকটিভ** বা **অভিলক্ষ্য** (objective) লেন্সই হল মূল চাবিকাঠি ; কারণ, **প্রোজেক্টর** বা **প্রক্ষেপক** (projector or ocular) লেন্স শুধু অভিলক্ষ্যে বিশ্লেষিত বস্তুর বিবর্ধন ঘটাতে সক্ষম।

মানুষের চোখের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ০.১ মিলিমিটার। মানুষের চোখে ০.১ মিলিমিটারের চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত রেখাসমূহকে একটি রেখারূপে দেখা যায়। আবার দ্রষ্টব্য বস্তুটি ০.১ মিমি এর-চেয়ে ক্ষুদ্র হলে এটিকে আর দেখা যাবে না। দেখা গেলেও ঝাপ্‌সা দেখাবে। মানুষের চোখের বিবর্ধন-ক্ষমতা নেই। মানুষ বস্তুর আকারকে মনে মনে আন্দাজ করে নেয়। মানুষের নির্ভুল হিসাবের মাপকাঠি হল অভিজ্ঞতা। কিন্তু, অণুবীক্ষণযন্ত্রের যুগপৎ বিশ্লেষণ ও বিবর্ধন-ক্ষমতা রয়েছে। অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা নির্ভর করে কি ধরনের দীপন (illumination) ব্যবহৃত হচ্ছে এর উপর। আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রে দীপিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে পরিষ্কার ধরা যাবে না। অতি নিখুঁত গ্রাউণ্ড-লেন্স ব্যবহার করেও গড় ৫৫০০ এঙ্গস্ট্রম (Å) তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সাদা আলোতে অণুবীক্ষণযন্ত্রের অভিলক্ষ্য ২৭৫০ এঙ্গস্ট্রম বা ০.২৭৫ (μ) মাইক্রন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ব্যাসবিশিষ্ট কোনো বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম নয়। কোষের বহু অংশ এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা সম্ভব নয়। অধিকতর বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাই এসবের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ভিন্ন ধরনের দীপন ব্যবহার করে এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আলোক-তরঙ্গের পরিবর্তে এ স্থলে অতি দ্রুত গতি-

banglainternet.com

সম্পন্ন ইলেকট্রনকে প্রয়োগ করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবিষ্ট হবার সময়, কোষের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মাত্রায় ইলেকট্রন শুষে নেয়। এভাবে ইলেকট্রন-সংবেদী ফটোগ্রাফিক প্লেট বা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর বস্তুটি বিম্বিত হয়। মানুষের চোখ ইলেকট্রন দ্বারা উত্তেজিত হয় না, এই কারণেই প্রতিপ্রভ পর্দার প্রয়োজন হয়। ইলকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের আলোক-দীপন পদ্ধতি আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রের (চিত্র ১.৩) অনুরূপ। পার্থক্য হলো এতে প্রচলিত কাচের লেন্সের বদলে চৌম্বক লেন্স থাকে।

অণুবীক্ষণযন্ত্রের মধ্যে ৫০,০০০ ভোল্ট চার্জের সাহায্যে চালিত হবার সময় ইলেকট্রনসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে ০.০৫ Å। ইলেকট্রনের এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় গড়ে ১০০০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তত্ত্বগতভাবে তাই ইলকেট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে ০.০২৫ Å-এর অর্ধেক বা ০.০২৫ Å ব্যাসবিশিষ্ট বস্তুকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উপরিলিখিত ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের চেয়ে অনেক কম (হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাস ১.০৬ Å)। কিন্তু এ ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স তৈরী করা দুরূহ। সর্বাধিক নিপুণ আধুনিক ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের লেন্সের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ১০ Å পর্যন্ত হতে পারে। মোটামুটিভাবে মানুষের চোখ ১০০μ আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্র ০.২μ এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র ০.০০১μপর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে পারে। অন্যকথায়, মানুষের চোখের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা যদি এক হয়, তাহলে আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রের ও ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ ও ১০,০০০। এভাবে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র কোষতত্ত্ববিদদের জন্যে নয়া দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ফলে, বেশ কিছু পরিমাণ কৌষীয় পদার্থের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কোষ-গবেষণার ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণযন্ত্রের স্পষ্ট বিশ্লেষণ ও উচ্চ বিবর্ধন ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়। কোষের নির্বাচিত অংশকে চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ থেকে আলাদাভাবে স্পষ্ট করে তোলাই মুখ্য কথা। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র নির্বাচিত অংশকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। কারণ, কোষের কতিপয় অংশ ইলেকট্রন শোষণ করে বিধায় এসব অংশকে 'ঘন' দেখায় এবং আলোক-সংবেদী ফিল্ম সেই পরিমাণে কালো হয় যে পরিমাণে ইলেকট্রন কোন বস্তুর মধ্যে দিয়ে এসে ফিল্মে পড়ে। আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রে এ ধরনের পার্থক্য অর্জন প্রায় অসম্ভব, কারণ এক্ষেত্রে আলো সরাসরি কোষের প্রায় সকল অংশকেই অনায়াসে অতিক্রম করে। এ সমস্যার

সমাধানের জন্যে কোষতত্ত্ববিদরা বস্তুতে যথাযথ বন্ধক ও রঞ্জক (fixative and stain) পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে ঈপ্সিত বস্তুকে পরিস্ফুট করে তোলেন। অদ্যাবধি বন্ধক ও রঞ্জক ব্যবহারের শত শত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সব কোষতত্ত্ববিদদের স্ব-সৃষ্ট পদ্ধতি। তাঁরা সুষ্ঠু কোষ-গবেষণার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের নিরন্তর প্রয়াসে রত আছেন। এই সকল পদ্ধতি বিশেষভাবে কোষরসায়ন (cytochemistry) এবং কলারসায়ন (histo-chemistry)-এর কাজে সাহায্য করে।

মৃত কোষের তুলনায় জীবন্ত কোষ সব সময় বেশী আকর্ষণীয়। কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া একটি অতি চমকপ্রদ জৈববৈজ্ঞানিক ঘটনা। দশা-বৈসাদৃশ্য শনাক্তকারী অণুবীক্ষণযন্ত্রে (phase contrast microscope) কোষতত্ত্ববিদদের উক্ত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। জীবন্ত কোষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে কিঞ্চিৎ দশা

চিত্র ১.৪ ঃ দশা-বৈসাদৃশ্য শনাক্তকারী অণুবীক্ষণযন্ত্রে তোলা টিস্যু-কালচারে উৎপাদিত মানুষের ক্যান্সার-কোষের চিত্র। নিউক্লিওলাসসহ নিউক্লিয়াসকে কোষের কেন্দ্রস্থলে দেখা যাচ্ছে। সাদা দাগগুলি প্রতিসরিত তরল বস্তুর। এসব বস্তু কালচারের সময় ব্যবহৃত হয়। সরু বড় দাগগুলি হল মিটোকণ্ড্রিয়া। বাইরের সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ টেস্ট-টিউবে কালচারকৃত মুক্ত কোষ গঠিত মাইক্রোফিব্রিল।

বহির্ভূত আলোক-রশ্মি অতিক্রান্ত হবার সময় বিভিন্ন অংশ বেশ স্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়ে। ১.৪ নং চিত্রে দশা-বৈসাদৃশ্য শনাক্তকারী অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত মানুষের

banglainternet.com

ক্যান্সার কোষের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। প্রচলিত আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রে প্রত্যেকটি কোষকে প্রায় আকারহীন দেখাত।

জীবন্ত কোষের গবেষণার আরেকটি বিকল্প উপায় হল কোষটিকে 'গুঁড়ো' করে এর অংশসমূহকে পর্যবেক্ষণ করা। একটি বিশেষ ধরনের খল ও নোড়ার সাহায্যে কোষ ভেঙে এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুকে একটি দ্রবণে ফেলা হয়। দ্রবণটিকে সতর্কতার সাথে কেন্দ্রাতিগভাবে সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে নাড়তে হয়। ফলে কম ও বেশী গতিতে যথাক্রমে ভারী ও হালকা অংশসমূহের তলানি পড়ে। এ পদ্ধতিতে এমনকি দুর্নিরীক্ষ্য অংশকেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাওয়া যায় এবং তুলনামূলক বিচারে এসবকে অন্যান্য অংশ থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। অংশসমূহ একবার আলাদা হলে, প্রতিটি অংশের রাসায়নিক সংঘটনকে বিশ্লেষণ করা যায়। অথবা এসবের রাসায়নিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায়। কারণ, টেস্ট-টিউবে ওসব অংশ অবিকৃত কোষের মতো কিছুক্ষণের জন্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মতো উদ্ভিদের, জীবজন্তু ও মানুষের কোষকে সহজে কালচার বা আবাদ করা যায়। বিবিধ প্রক্রিয়ার সহায়তায় এসব কোষের সাড়া দেবার ধরন ও এদের ভবিষ্যৎ আচরণ পরীক্ষা করা হয়। কোষকে অণু-সুঁই (micro-needle) দ্বারা বিদ্ধ করা, অণুশল্য (micro surgery) ব্যবচ্ছেদ করা এবং অণু-নলিকার (micro-pipettes) সহায়তায় দ্রবণসহ প্রবেশ করানো সম্ভব হয়। কোষকে যে সমস্ত উপাদান পান করানো হয় সে সব উপাদানের পরমাণুসমূহ তেজস্ক্রিয়। এই তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে অনুসরণ করে কোষের প্রক্রিয়াকে উদ্‌ঘাটিত করা যায়।

সুতরাং কোষতত্ত্ববিদদের কোষ-রহস্য আবিষ্কারের জন্য রকমারী অস্ত্রসহ বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারের মালিক হতে হয়। নির্দিষ্ট একটি সমস্যাকে সমাধানের জন্য একটি যন্ত্র বা কৌশল যথেষ্ট নয়। এর জন্য একাধিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কোষ-বিষয়ক অর্জিত আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের এই বিশ্বাসকে মজবুত করেছে যে—কোষই জীবনের মূল ভিত্তি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে কোষের জটিলতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক বেশী।

banglainternet.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোষের গঠন

রাসায়নিক ক্রিয়াহীন কোন জৈবিক কর্মকাণ্ড কল্পনা করা অসম্ভব। শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁটা, দেখা, স্বাদ গ্রহণ, চিন্তা করা বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তির দরকার। প্রতিটি কোষের ভিতরে সম্পন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল হল এই শক্তি। আবার অঙ্গসমূহের গঠন-প্রকৃতির উপর কোষের প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। ফলে, অঙ্গের গঠন-প্রকৃতি জানা না থাকলে কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যাখ্যাদানও অসম্ভব। যেমন, শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুস ও ডায়াফ্রাম (বুক ও পেটের সন্ধিস্থলে স্থিত পর্দা — অনু), চলাফেরায় পেশী ও হাড়, দর্শনে লেন্স, রেটিনা ও চক্ষুস্নায়ু ইত্যাদির গঠন পুর্বেই জেনে নিতে হয়। এসব অঙ্গ অবশ্যই কোষগঠিত। কোষসমূহের বিন্যাসের প্রকৃতিই উপরিলিখিত অঙ্গসমূহের আকৃতি ও কার্যাবলীর জন্যে দায়ী।

কাজেই, কোষকে একটি সংঘবদ্ধ রাসায়নিক কারখানাই বলা যায়। এটি সকল উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম কারখানারূপেও অভিহিত হতে পারে। কারণ, এই কারখানা জীবনপ্রবাহ সচল রাখার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও সব কাজ করায় সক্ষম। এককোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি সর্বাংশে সত্য। অথবা একে একটি বিশেষ দোকানের সাথেও তুলনা করা যায় যেটিতে শুধু এক ধরনের জিনিসই পাওয়া যায়। যেমন, স্নায়ুকোষ ও পেশীকোষ যথাক্রমে শুধু যোগাযোগ ও নড়াচড়ার কাজ করে থাকে। কোষের প্রকৃতি যাই হোক দক্ষতা অর্জনের জন্য কোষেরও ঠিক কারখানার মতোই একটি সংঘটন থাকা চাই। থাকা চাই নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র, যেখান থেকে নির্দেশ আসবে কি করতে হবে, কখন করতে হবে, ইত্যাদি। এটি শক্তির বিতরণ এবং উৎসস্থলও বটে। তদুপরি এতে থাকবে যন্ত্রপাতি। উৎপাদন ও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এসব যন্ত্রপাতি আবশ্যক। গঠন, আয়তন ও কাজের ক্ষেত্রে কোষসমূহের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকলেও, অনেক বিষয়ে ওদের ভিতরে সাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য বিশেষ ধরনের কোষে পরিবর্তিত সংঘটন আশা করা যায় এবং এতে নূতন অংশও সম্ভবত সংযোজিত হয়, কিন্তু তা মৌলিক

বৈশিষ্ট্যসমূহের বিনিময়ে নয়। এই কারণে জীববিজ্ঞানীরা আকার ও কাজকে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ কাজকে কোষের বিভিন্ন অংশের সুবিন্যস্ত সংঘটনেরই ফল বলা যায়।

জীববিজ্ঞানীরা প্রতিটি জীবকে অদ্বিতীয় বলে গণ্য করেন। কাজেই, কোন নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদকে সমগ্র প্রাণী বা উদ্ভিদকুলের প্রতিনিধি বলে মনে করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এ চিন্তাকে আমরা কোষের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে পারি। প্রতিটি যে কোন ধরনের কোষ বা নির্দিষ্ট কোষই অনুরূপভাবে অদ্বিতীয়। এই বক্তব্যের সমর্থনে বিশিষ্ট গুণ-সমন্বিত একটি 'নির্দিষ্ট' কোষকে আলোচনার জন্য বিবেচনা করা যায়। কোষটির জীবন্ত অংশের বহিপ্রান্ত প্লাজমা-ঝিল্লী দ্বারা সীমাবদ্ধ। ঝিল্লী কোষটিকে চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং কোষের প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহকে এর মধ্যে দিয়ে ভিতরে-বাইরে যেতে সাহায্য করে। কোষে একটি **নিউক্লিয়াস** রয়েছে। নিউক্লিয়াস কোষের সমুদয় কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোষের সবিরাম অস্তিত্বের জন্য নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি যদিও একান্ত অপরিহার্য তবু বিভিন্ন ধরনের কোষ ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা পর্যন্ত নিউক্লিয়াসহীন অবস্থায় কাজ চালিয়ে নিতে পারে। প্লাজমা-ঝিল্লী ও নিউক্লিয়াস ছাড়া কোষের অবশিষ্ট অংশকে **সাইটোপ্লাজম** বা কৌষীয় প্রাণসত্তা বলা হয়। সাইটোপ্লাজমে বিবিধ ঝিল্লী-পদ্ধতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ও দ্রবীভূত পদার্থ থাকে। এসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোষের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লেষণ এবং শক্তির আদান-প্রদান ও রূপান্তরকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। এতদসত্ত্বেও, কোষ নামক এই কারখানায় অনুষ্ঠিত সংহতিপূর্ণ কাজ বোঝার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানা নেই। যদিও কোষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ যুক্তিযুক্তভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

জীবরসায়নবিদ ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণবিদদের আবিষ্কারের আনুকূল্যে আমরা অধিকাংশ জ্ঞান লাভ করেছি। জীবরসায়নবিদরা কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং অণুবীক্ষণবিদরা কোষের সংগঠনগত অঙ্গ-সংস্থান সম্পর্কে নূতন ধারণা পেতে সাহায্য করেছেন। আণবিক অর্থে কোষের সূক্ষ্ম অংশসমূহ সম্পর্কে আমরা কিছুটা নিশ্চয়তার সাথে প্রতিবেদন রাখতে পারি। তদুপরি এসব অংশের কাজের আলোকে এদের গঠন-প্রকৃতি পরখ করতে পারি।

banglainternet.com

উল্লেখ্য যে, কোষের সূক্ষ্ম অংশের বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহারকে ফলপ্রসূ করে তুলেছিল সমসাময়িক আরেকটি আবিষ্কার। সেটি হল কোষকে অতি পাতলা ফালিতে কাটার কৌশল। পূর্বে আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ মাইক্রোটোমী মেশিনে ৪-৫ মাইক্রন পুরু খণ্ড তৈরি করা যেত। ফলে, ৩০ μ ব্যাসবিশিষ্ট একটি কোষকে বড়জোর ৬-৭ খণ্ডে ভাগ করা সম্ভব হত। এ ধরনের পুরু খণ্ড ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখার উপযুক্ত নয়। কারণ, এই পরিমাণ বস্তু ইলেকট্রন রশ্মির অধিকাংশই শুষে নেয়। সুতরাং কৌষীয় অঙ্গ-সংস্থানের সামান্য মাত্র এতে ধরা পড়ে। কাটার নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হবার ফলে এখন ১০০-৫০০ এঙ্গস্ট্রম ($\frac{১}{১০০}$ — $\frac{১}{২০}$ মাইক্রন) পুরু স্লাইস কেটে নেওয়া সম্ভব। উপরিলিখিত মাপের একটি কোষকে তাই এখন প্রায় ৬০০টি খণ্ডে ভাগ করা যায়। অবশ্য এ ধরনের সূক্ষ্ম কৌশল আবিষ্কৃত হবার ফলে, অতি উচ্চ বিশ্লেষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র যে কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুধু কোষের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। অর্থাৎ কোষের ক্ষুদ্র একটি অংশের বিশদ বিবরণের স্বার্থে কোষ সম্পর্কিত সামগ্রিক ধারণা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এই পুস্তকে মুদ্রিত আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রে ও ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত আলোকচিত্রের তুলনামূলক বিচার করলে বিগত বিশ বছরে অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা কি পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে তা ধরা পড়বে।

কোষকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা বা সেকশান করার প্রয়োজনে যে সংরক্ষণ করতে হয় তার জন্য বন্ধক (fixative) ব্যবহার ও পাতানোর (embedding) নয়া কৌশলও বের করতে হয়েছে। সফল বন্ধকের মধ্যে রয়েছে ওসমিয়াম টেট্রাক্সাইড, পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ও ফরমালডিহাইড। সরু সেকশান পেতে হলে বস্তুটিকে সচরাচর ব্যবহৃত প্যারাফিনের বদলে প্লাস্টিক রেজিনে পাতানো প্রয়োজন।

কোষের উপরিতল

ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যাপক ব্যবহারের আগে অনুমান করা হত যে কোষের পরিধি একটি ঝিল্লী দ্বারা আবৃত যা কোষকে বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং জৈব-অবয়বের মৌল একক হিসাবে কোষের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত গবেষণায় এই প্লাজমা-ঝিল্লীর সার্বিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্লাজমা-ঝিল্লী মাত্র ১০০ Å বা ০.০১μ পুরু বলে আলোক-

banglainternet.com

অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায় না। প্লাজমা-ঝিল্লীর দ্বৈতপ্রকৃতি (double nature) ও আণবিক গঠন ২১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমা-ঝিল্লী লিপোপ্রোটিন (লিপিড + প্রোটিন) দ্বারা গঠিত বলে ধারণা পাওয়া যায়। এই ধারণার কারণে বিবিধ কোষের ঝিল্লীর ভেদ্যতা (permeability), পৃষ্ঠটানের (surface tension) উপর প্রাথমিক গবেষণায় পূর্বে ধরা পড়ে। ঝিল্লী প্রোটিন গঠিত বলেই কোষ নমনীয় হয়েছে ও এর সিক্ত হবার ক্ষমতালাভ সম্ভব হয়েছে। লম্বা জটিল প্রোটিন অণু যুগপৎ যখন ভাঁজবন্ধ ও ভাঁজহীন হতে পারে তখন ঝিল্লীও সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। ফলে ঝিল্লী পরস্পরের মধ্যেকার ফাঁক দিয়ে কোষাভ্যন্তর থেকে নির্গমনকারী এবং পরিবেশ থেকে কোষে প্রবেশকারী অণুসমূহকে সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ধরনের ঝিল্লীকে নৈর্বাচনিক ভেদনযোগ্য ঝিল্লী (selectively permeable membrane) বলা যায়। ঝিল্লীর অবস্থার উপর (নির্দিষ্ট কোন সময়ে) অণুসমূহের আদান-প্রদান নির্ভর করে। উপরিলিখিত ঝিল্লী সমুদয় কোষের বা এর অংশবিশেষের বৃদ্ধি ও নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন এমিবাকে কাচের উপর চলার সময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঝিল্লীর সংকোচন, প্রসারণ বা বৃদ্ধির প্রযুক্তিক দিক অবশ্য পুরো জানা যায়নি।

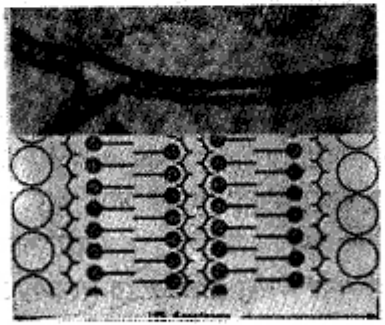

চিত্র ২·১ : উপরে; পার্শ্ববর্তী কোষসমূহের ঝিল্লী। ঝিল্লীর স্তরসমূহও দেখা যাচ্ছে। নীচে; প্লাজমা-ঝিল্লীকে অণু-বিন্যাসের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে। বাইরের ও ভিতরের শূন্য বৃত্তগুলি প্রোটিন অণু, এবং ব্যাডাচির মত পর পর অবস্থিত কালো বৃত্তগুলি লিপিডের (স্নেহ জাতীয় পদার্থ) অণু। সব মিলিয়ে এটিকে 'একক ঝিল্লী' বলা যায়।

ঝিল্লীতে লিপিড আছে বলে মনে করা হয় এই কারণে যে চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ থেকে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দ্রবণ কোষে দ্রুত প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু লিপিডের কাজ ও গঠনগত ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার জানা যায়নি।

banglainternet.com

তবু ২·১ চিত্রে প্রদর্শিত ঝিল্লীর মূল গঠন-প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে অন্যান্য প্রতিটি কোষ-ঝিল্লীর বৈশিষ্ট্যও অনুরূপ। ঝিল্লীর এ ধরনের আণবিক সংঘটন হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ এতে নির্দিষ্ট কৌষীয় বিক্রিয়াসমূহ তুলনামূলকভাবে সহজে সম্পন্ন হতে পারে। কোষের মিটোকণ্ড্রিয়া-ঝিল্লীর বর্ণনার সময় আমরা এই সমস্যার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ব্যাকটেরিয়া কোষের ঝিল্লীতে পারমিয়াসেস নামক এক গ্রুপ এনজাইম থাকে। এইসব এনজাইম কোষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বা শুধু কোষসংলগ্ন অবস্থায় থাকতে পারে। কোষে বিভিন্ন প্রকারের অণুর আগমন নির্গমনকে এনজাইম অংশত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঝিল্লীর ভেদ্যতা বিষয়ক অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে এই সিরিজের অন্য ভল্যুমে* আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় যে, মুক্ত কোষসমূহ একটি বা দুটি পদ্ধতিতেই চতুষ্পার্শ্বস্থ তরল মাধ্যম থেকে বস্তু আত্মসাৎ করতে পারে। পদ্ধতি দুটির নাম হল পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস (Pinocytosis and Phagocytosis)। যেসব মুক্ত কোষের কথা আলোচিত হচ্ছে সেসব কোষ টিস্যু কালচারের সময় উৎপাদিত হয়ে থাকে। 'পান করা' ও 'কোষ' কথাদ্বয়ের গ্রীক প্রতিশব্দ থেকে পিনাকো-সাইটোসিসের নামকরণ হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি আক্ষরিক অর্থেই পান করার ব্যাপার। নমনীয় প্লাজমা-ঝিল্লী, কোষে একটি নালী সৃষ্টি করে। কোষে তরল পদার্থ প্রবেশ করে এই নালী দিয়ে। নালী সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি পকেট সৃষ্টি করে। পকেটসমূহ পরে সাইটোপ্লাজমে মিশে যায় এবং পকেটস্থিত তরল পদার্থ কোষ দ্বারা ভুক্ত হয়ে জীর্ণ হয়। (চিত্র ২·২)। উপর্যুক্ত উপায়ে যে সমস্ত বড় অণু ঝিল্লী দিয়ে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হয় সেসব দ্বিতীয় উপায়ে কোষে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। ফ্যাগোসাইটোসিসের (গ্রীক phagein-খাওয়া) ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমের শাখাসমূহ ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় কঠিন পদার্থকে বেষ্টন করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে। বস্তুটি সাইটোপ্লাজমে আসার সময় কোষ-ঝিল্লী ছিঁড়ে যায়। সাইটোপ্লাজমস্থিত এনজাইম সেসব বস্তুকে হজম করে (চিত্র ২·৩)।

banglainternet.com

* W. D. McElroy, Cell Physiology and Biochemistry, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N. J : Prentice-Hall, 1964)

সুতরাং প্লাজমা-ঝিল্লীকে জীবন্ত কোষের অংশ বলে আমরা মেনে নিতে পারি। প্লাজমা-ঝিল্লীর সঙ্গে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ঝিল্লীতন্ত্রের নিবিড় সংযোগ (চিত্র ২৪) ; সুচ দিয়ে বিদ্ধ করলে বা কোন কারণে ঝিল্লী ছিঁড়ে গেলে এটির পুনর্গঠিত হবার ক্ষমতা, কোষাভ্যন্তরে এর পিনোসাইটোসিস, ফ্যাগোসাইটোসিস বা গতি নির্দেশক তৎপরতা, ইত্যাদি থেকে এই মতবাদের দৃঢ় সমর্থন মেলে। আমাদের অবশ্যই

চিত্র ২২ : জীবন্ত এমিবার কোষের কিনারা। এতে পিনোসাইটোটিক কোষ-খাত দেখা যাচ্ছে। (কালো রেখাগুলি কোষকেন্দ্রের দিকে মিলিত হচ্ছে)। এসব খাত দিয়ে তরল পদার্থ যাতায়াত করে। তরল পদার্থ ঝিল্লীবদ্ধ বিন্দুরূপে গঠিত হয়। বিন্দুসমূহ পরে কোষাভ্যন্তরে দ্রবীভূত হয়। (সৌজন্য, Dr. David Prescott.)

চিত্র ২৩ : ফ্যাগোসাইটোটিক পদ্ধতিতে কোষের খাদ্যগ্রহণের দৃশ্য। সাইটোপ্লাজম সৃষ্ট 'বাহু' বাইরের শক্ত বস্তুকে গিলছে। খাদ্যবস্তু কোষের ভিতরে নীত হলে কোষস্থিত এনজাইমের সংস্পর্শে আসে। পরে সাইটোপ্লাজমস্থিত এনজাইম খাদ্যবস্তুকে হজম করে।

স্বীকার করতে হয় যে কতিপয় কোষের ঝিল্লী স্থিতিস্থাপক, পরিবর্তনশীল ও নমনীয় ; আবার অন্য কতকগুলি কোষের ঝিল্লী দৃঢ় ও অনমনীয়। ১.৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত কোষের ঝিল্লী হল পাতলা, অথচ কতিপয় সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বকোষের ঝিল্লী পুরু। এমিবার ঝিল্লী মসৃণ ও প্যারামেসিয়ামের ঝিল্লী সিলিয়াবহুল। আমাদের আরো স্বীকার করতে হয় যে কোষ-ঝিল্লীর উপরিতলের

ভিন্নতার কারণে কোষের শারীরবৃত্তিক সাড়া ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। 'A' 'B' ও 'O' লোহিত কণাকে আকৃতি বিচারে আলাদা করে চেনা যায় না। কিন্তু এসব রক্ত-সিরামের সংস্পর্শে এসে সত্বর এমন সব প্রক্রিয়া শুরু করে, ফলে তখন সহজে এদের আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়। তরল পদার্থে রাখা একই টিস্যু বা কলার কোষসমূহকে আলাদা করে বাছাই করা যায়। যেমন, মুরগীর ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড ও রেটিনার কোষ অবিমিশ্রভাবে তরল পদার্থে রাখলে হৃৎপিণ্ড ও রেটিনার কোষ আলাদাভাবে জড়ো হয়ে থাকে। সুতরাং কোষ-ঝিল্লী গতিশীল এবং এতে পরস্পর আসঞ্জনশীল হবার মতো স্বতন্ত্র গুণাবলী বিদ্যমান। প্লাজমা-ঝিল্লী-সংলগ্ন অণু, ঝিল্লীতে কতিপয় গুণাবলী আরোপিত করে। এক্ষেত্রে রক্তকণিকার গ্লাইকো বা মিউকো-প্রোটিনের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ঝিল্লীর স্বকীয় স্পষ্ট সংঘটন থাকতে পারে যা এর চূড়ান্ত কার্যক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে

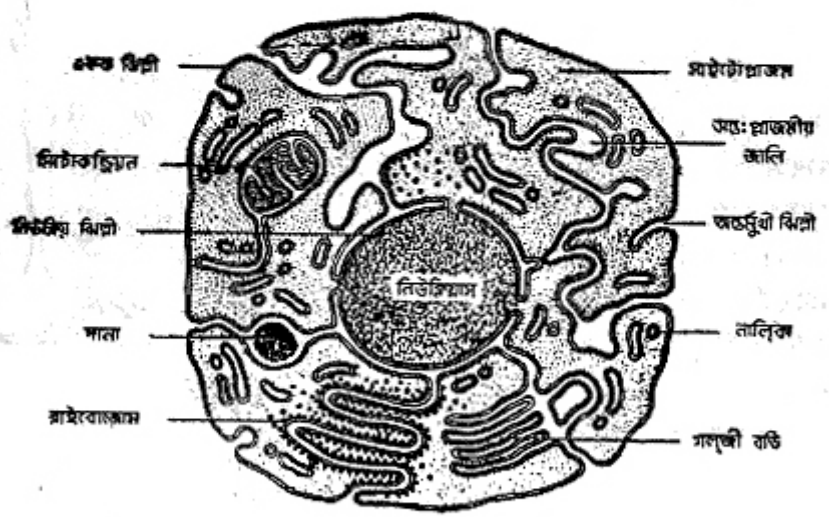

চিত্র ২৪ : কোষের বাইরের ও ভিতরের ঝিল্লীর বিন্যাসের নক্‌শা। কোষস্থিত বস্তুসকলের পারস্পরিক সম্পর্ক এতে বিধৃত। চিত্রে ঝিল্লীর উৎস ও আকার এক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (সৌজন্য, Dr. J. D. Rovertson)

ঝিল্লীসমূহের পরস্পরের মধ্যেকার যে সাদৃশ্য ধরা পড়ে তা বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং এতে ঝিল্লীস্থিত অণুসমূহের বিবিধ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত নাও হতে পারে যা একমাত্র অন্যবিধ কলা-কৌশলের সহায়তায় পরীক্ষিত হলে ধরা পড়তে পারে।

banglainternet.com

প্লাজমা-ঝিল্লী সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে, আমাদের এই ধারণা হওয়া উচিত নয় যে এটি কোষবস্তুর চতুষ্পার্শ্বে পাতলা প্লাস্টিকের থলের অনুরূপ একটি সাধারণ খামমাত্র। কতিপয় বিশেষ কোষের ক্ষেত্রে ঝিল্লীর অবয়ব কিভাবে রূপান্তরিত হয় দুটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। ২৫ চিত্রে ইঁদুরের ক্ষুদ্রান্ত্রগাত্রের কলামনার এপিথেলিয়ামের কোষ দেখানো হয়েছে। এ সমস্ত কোষ হজমকৃত খাদ্যাংশের শোষণের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। প্লাজমা-ঝিল্লী এখানে অনেকগুলি ভাঁজে পরিণত হয়েছে এবং এতে পার্শ্ববর্তী কোষের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবার জন্যে সুচারু ব্যবস্থা রয়েছে। সংযোগকারী এই অংশের নাম ডেসমোজোমস (desmosomes)। অন্যদিকে কোষের উপরিতল একটি ব্রাশের আকার ধারণ করেছে। 'ব্রাশ কিনারার' উদ্গত অংশ-সমূহকে মাইক্রোভিলি (microvilli) বলা হয়ে থাকে। এসব মাইক্রোভিলির পর্যাপ্ত শোষণ ক্ষমতা

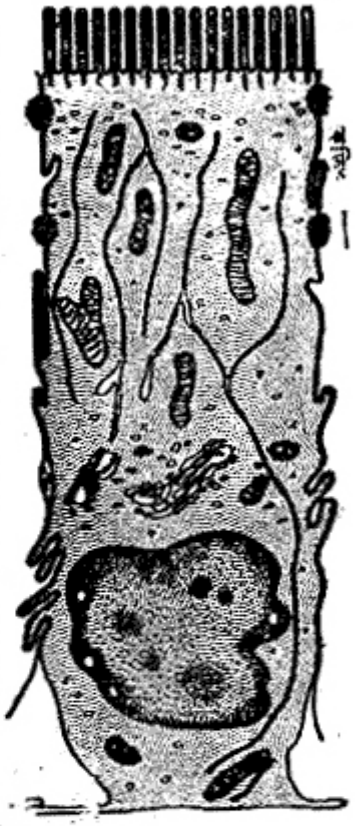

চিত্র ২৫ : ইঁদুরের ক্ষুদ্রান্ত্রের এপিথেলিয়েল কোষের নক্‌শা। কোষের পার্শ্বের ঝিল্লী কিরূপ ভাঁজবিশিষ্ট হতে পারে এবং (চিত্রের উপরিভাগে) ভাঁজগুলি কত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে মাইক্রোভিলিতে পরিণত হয় তা দেখা যাচ্ছে। মাইক্রোভিলি শোষণ কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেয় (২১০ নং চিত্রে বিশদ দেখুন) (সৌজন্য, H. Zetterquist, Thesis, U, of Stockholm, 1956)

রয়েছে। এ ধরনের একটি কোষে প্রায় ৩০০০ মাইক্রোভিলি থাকে। অন্ত্রের এক বর্গ মিলিমিটারে ২০০,০০০,০০০ মাইক্রোভিলি থাকে। অন্ত্রের গাত্রের জল শোষণ ক্ষমতার সাথে তোয়ালের জল শোষণ ক্ষমতার তুলনা করা যায়।

স্নায়ুকোষ ও এর সাথে যুক্ত শোয়ান (schwann) বা স্যাটেলাইট (satellite) কোষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপর এক দৃশ্য দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্লাজমা-ঝিল্লী

banglainternet.com

প্রলম্বিত আকার ধারণ করে। ২৬ নং চিত্রে একটি শোয়ান কোষকে স্নায়ু-সূত্র বা এক্সনের মধ্যে জড়ানো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এক্সন স্নায়ুর প্রসারিত অংশ। ২৭ নং চিত্রে কোষদ্বয়ের প্যাঁচালো অবস্থান প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শোয়ান কোষের সমুদয় সাইটোপ্লাজমকে নিঙড়ে বের করা হয়। এক্সন বহুস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লীর দ্বারা

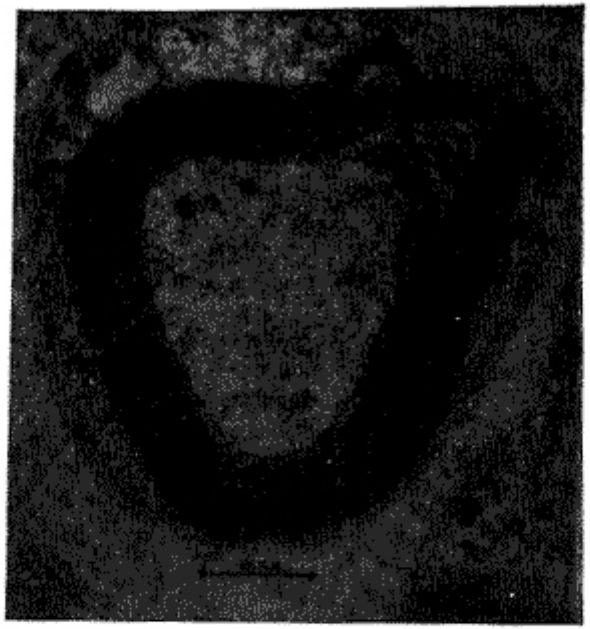

চিত্র ২৬ : স্নায়ুসূত্র ও কেন্দ্রীয় এক্সনকে জড়ানো শোয়ান কোষের ঝিল্লীর ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। ঝিল্লীর বাইরে ও চিত্রের উপরে ডানে বিচ্ছিন্ন দুটি ঝিল্লীর ভিতরে শোয়ান কোষের সাইটোপ্লাজম দেখা যাচ্ছে। বহির্কোষিক বস্তু বেসমেন্ট ঝিল্লী সম্পূর্ণ চিত্রকে ঘিরে একেবারে বাইরে অবস্থিত। (সৌজন্য, Dr. L. G. Elfvin)

আবৃত থাকে। সম্ভবত এসব ঝিল্লী স্নায়ুকে রক্ষা করে এবং স্নায়ু-তরঙ্গ বহনে সহায়ক হয়। তদুপরি ঝিল্লী, অতি দীর্ঘ ও সরু এই সূত্রসমূহকে পুষ্টিদান করে বলেও ধারণা করা হয়।

অন্তপ্লাজমীয়-জালি

জীবন্ত কোষের ঝিল্লী ছিঁড়ে গেলে এর সাইটোপ্লাজম চটচটে তরল পদার্থের আকারে বেরিয়ে আসে। এতে ধারণা করা হয় যে সাইটোপ্লাজমের কিছুটা আকারগত গঠন

banglainternet.com

আছে। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত কণিকা ছাড়া প্রায় সব ধরনের কোষে ব্যাপক ঝিল্লীর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এই ঝিল্লীসমূহ কোষের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঝিল্লীকোষ

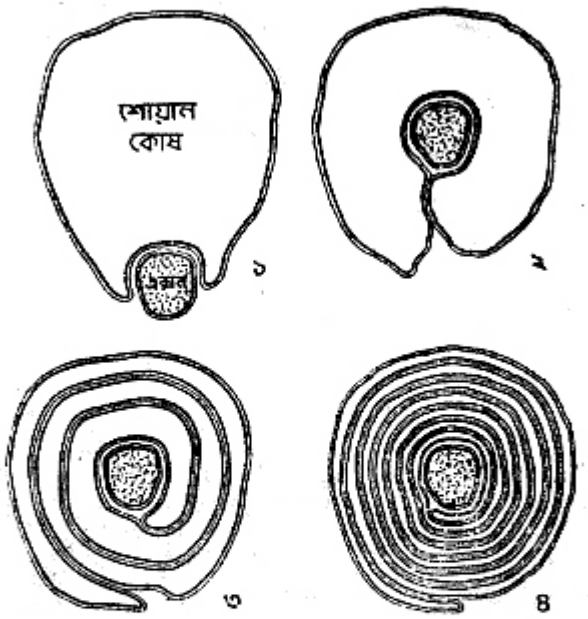

চিত্র ২৭ ঃ Dr. Betty G. Green-এর বর্ণনানুসারে শোয়ান কোষের ঝিল্লী দ্বারা এক্সনের ক্রমশ খামবদ্ধ হবার নক্‌শা । এ ধরনের এক্সনকে মাইয়েলিনেটেড (myelinated) এক্সন বলা হয়।

বস্তু নির্মাণে সহায়তা করে। এই ঝিল্লীসমূহকে **অন্তপ্লাজমীয়-জালি** (endoplasmic reticulum) বলা হয়। এর অপর নাম **এরগ্যাস্টোপ্লাজম** (ergastoplasm) (চিত্র ২৮)। **নিউক্লিয়-ঝিল্লী** থেকে প্লাজমা-ঝিল্লী পর্যন্ত জালিটি বিস্তৃত। এটি কুণ্ডলী আকারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁজ সৃষ্টি করে প্রসারিত থাকে। নিউক্লিয়-ঝিল্লীকে এর অংশ বলা যায়। অথবা অন্যভাবে একে জালির বর্ধিত অংশও বলা যায়। ২৪ নং চিত্রে নিউক্লিয়-ঝিল্লী কিভাবে অন্তপ্লাজমীয়-জালি ও প্লাজমা-ঝিল্লীর সাথে অবিচ্ছিন্ন রয়েছে তা দেখা যাচ্ছে।

banglainternet.com

অন্তপ্লাজমীয়-জালির আকার ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যদিও প্রতিটি কোষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অন্তপ্লাজমীয়-জালি থাকে, কিন্তু এটিকে সাইটোপ্লাজমের পরিবর্তনশীল অংশরূপে ধরে নিতে হয়। কারণ, এই জালি খুব সম্ভবত সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতিকে দ্রুত বদলিয়ে দেয়। ২৮ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে অন্তপ্লাজমীয়-জালি সাইটোপ্লাজমে শিথিলভাবে বা আঁটসাটভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে। উপরন্তু, ঝিল্লীসমূহ মসৃণ বা খসখসেও হতে পারে।

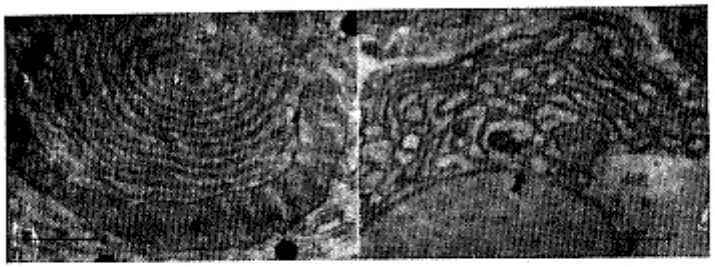

চিত্র ২৮ ঃ ইঁদুরের লালাগ্রন্থির একিনাস কোষের অন্তপ্লাজমীয়-জালি

বাম ঃ মিটোকণ্ড্রিয়নের উপর খসখসে, দানাদার অন্তপ্লাজমীয়-জালি। এতে রাইবোজোম আছে। জালির নীচের অংশ অধিকতর সংগঠিত। অনেকগুলি জালি সাইটোপ্লাজমে গিয়ে শেষ হয়।

ডান ঃ অন্তপ্লাজমীয়-জালিসমূহ খসখসে, অবিরাম শাখাবিশিষ্ট ও পরস্পর যুক্ত। এসব নিউক্লিয়-ঝিল্লীর (তীরচিহ্নিত) বহির্ভাগের সাথেও যুক্ত। (সৌজন্য, Dr. H. F. Parks)

প্রোটিন সংশ্লেষী কোষসমূহে অসংখ্য খসখসে ও দানাদার অন্তপ্লাজমীয়-জালি দেখা যায়। ইলেকট্রন ভর্তি কণাসমূহ কোষের সংশ্লেষ-ক্ষমতার উৎসস্থল। কণায় অধিকমাত্রায় আর. এন. এ (RNA) বা রাইবোজ নিউক্লিয়েইক এসিড থাকে। যেহেতু রাইবোজোম সাইটোপ্লাজমে মুক্তাবস্থায়ও থাকতে পারে, সেহেতু, এদের সাথে অন্তপ্লাজমীয়-জালির সম্পর্ক থাকবে এমন কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে, যে সব ব্যাকটেরিয়ায় স্বল্প পরিমাণ বা একেবারেই অন্তপ্লাজমীয়-জালি থাকে না সেসবে রাইবোজোম কণিকাও কখনো বেশী থাকে না। অপরদিকে রাইবোজোম ও জালি একত্রে সমুদয় কোষটির নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহায়ক হয়। এ প্রসঙ্গে, লক্ষণীয় যে, প্রোটিন গঠনের ক্ষেত্রে রাইবোজোমগুলির প্রত্যেকের ক্ষমতা সমান নয়, যদিও সব রাইবোজোম আকৃতিতে একই ধরনের। কারণ প্রতিটি কোষকে

banglainternet.com

গঠনগত ও কার্যগত প্রয়োজনে এর চাহিদামাফিক প্রোটিন অণু সৃষ্টি করতে হয়। আরো লক্ষণীয় যে কোষের অভ্যন্তরভাগে অন্তপ্লাজমীয়-জালির ঝিল্লীসমূহও অধিকতর উপরিতলের আয়তনের সৃষ্টি করে। যদি আমরা ধরে নেই যে এনজাইমসমূহ অন্তপ্লাজমীয়-জালির অংশবিশেষ, তাহলে কোষ প্রয়োজনীয় সংশ্লেষ ক্ষমতার অধিকারী বলা যায়।

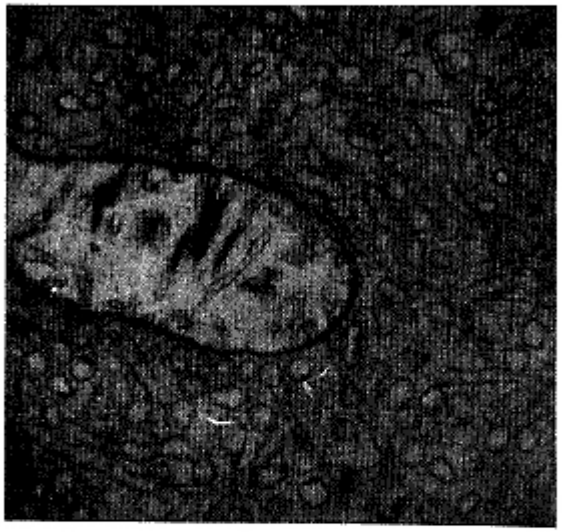

চিত্র ২৯ ঃ ওপোসামের শুক্রাশয়ের একটি কোষের একাংশের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। এতে দানাহীন বা মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালি পরিলক্ষিত হচ্ছে। (সৌজন্য, Dr. H. F. Parks)

মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালির ক্রিয়াকাণ্ড উপর্যুক্ত ধারণাকে আরো দৃঢ় সমর্থন দান করে। অবশ্য এই জালি রাইবোজোমহীন (চিত্র ২৯)। মসৃণ ও খসখসে অন্তপ্লাজমীয়-জালির মধ্যে কোন স্পষ্ট আকারগত বিচ্ছিন্নতা সম্ভবত নেই। কিন্তু চর্বি সংশ্লেষকারী কোষে মসৃণ জালির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন লিপিড সংশ্লেষের কথা ধরা যায়। সেবাসিয়াস গ্রন্থি (sebaceous glands) ও কতিপয় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (endocrine glands) স্টেরয়ড হরমোনে লিপিড রয়েছে। এসবের সংশ্লেষে এনজাইমের দরকার হয়। এই এনজাইমসমূহকে অন্তপ্লাজমীয়-জালির অংশবিশেষ বলে ধারণা করা হয়। এ বিষয় আগে আলোচিত হয়েছে। এনজাইমকে ঝিল্লীর খণ্ডাংশসমূহ থেকে ভৌতিকভাবে আলাদা করা যায় না বলে এমন ধারণা করা হয়।

banglainternet.com

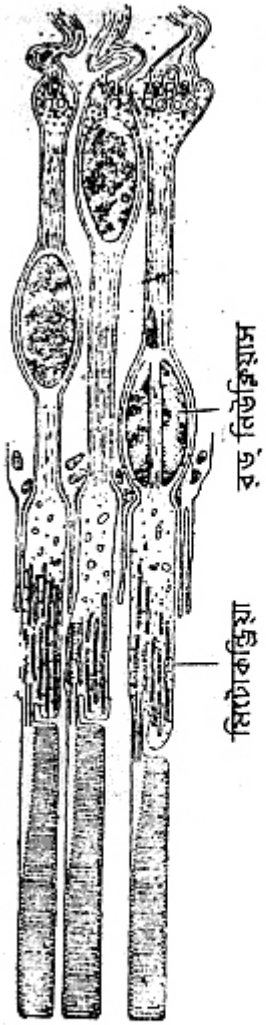

চিত্র ২১০ ঃ গিনিপিগের রেটিনার বড় কোষের (আলোক-গ্রাহী) নক্শাঃ

উপরের মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালি পরপর ভাঁজ হয়ে বহুস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লী সৃষ্টি করে। প্রতিটি ঝিল্লীতে আলোক-সংবেদী রঞ্জক পদার্থ থাকে। আলোক-সংবেদী অঞ্চলের ঠিক নীচে মিটোকন্ড্রিয়াসমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট। রড্ নিউক্লিয়াসকেও স্পষ্ট দেখা যায়। একেবারে নীচে প্রতিটি কোষের সাথে স্নায়ুসূত্রের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

(Dr. F. S. Sjostrand, International Review of Cytology, vol. 5, 1956 ; with permission, Academic Press)

সুতরাং অন্তপ্লাজমীয়-জালি এক ধরনের সাইটোকংকাল বা সাইটোপ্লাজমের কাঠামো। এই কাঠামো রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিসর সৃষ্টি করে, বস্তু স্থানান্তরে পথরূপে কাজ করে এবং তা সংশ্লেষিত বস্তুর আধার হিসাবে গণ্য হয়। বিশেষ করে যেসব কোষের একটি নির্দিষ্ট আকার থাকা অপরিহার্য, সেসব কোষে মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কাজেই একে সেসব কোষে আকার-স্রষ্টারূপে চিহ্নিত করা যায়। জালির এই ভূমিকা প্রাণীর অক্ষিপটের (retina) আলো-গ্রাহী (light receptor) কোষের ক্ষেত্রে প্রকট। এসব কোষে অন্তপ্লাজমীয়-জালি দীর্ঘ, জটিল ও জাফরি কাটার মতো বিস্তৃত হয় (চিত্র ২১০) এই কোষসমূহ আলো গ্রহণ করে এবং তা ঝিল্লীর মাধ্যমে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। তবে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

গলজি কমপ্লেক্স

মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালির সাথে গলজির তুলনা করা হয়। তবে গলজি তুলনামূলকভাবে জালির মত অবিচ্ছিন্ন নয়। এটি জালির চেয়ে আকারে ছোট ও জটিল। আবিষ্কারকের নামানুসারে এর নাম **গলজি কমপ্লেক্স** রাখা হয়। সাইটোপ্লাজমে গলজিও

বিশিষ্টতার দাবিদার। একে ডিক্টিওজোম (dictyosome) নামেও অভিহিত করা হয়। জালি ও গলজির মধ্যে আকারগত দিক থেকে কোন সম্পর্ক আছে কি না তা আজো বিতর্কের বিষয়। ওসমিয়াম (osmium) বা রূপা (silver) গঠিত রঞ্জক (stain) ব্যবহার করে গলজির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা যায়। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত গলজির বিশদ আলোক চিত্র ২১১ নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

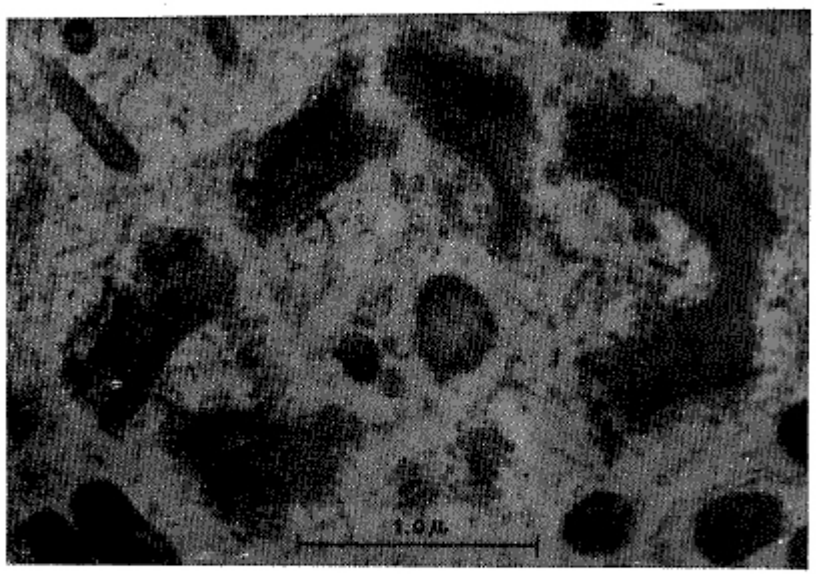

চিত্র ২১১ ঃ শামুকের শুক্রাশয় (অপরিপক্ক) গলজি কমপ্লেক্সের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। (সৌজন্য, Dr. A. H. Dalton)

গলজির কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। গলজিতে আর. এন. এ-র (RNA-ribose nucleic acid) পরিমাণ স্বল্প। সুতরাং গলজি প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে না। বরং সবার ধারণা, লিপিড জাতীয় পদার্থের সম্ভাব্য পরিবর্তনে ও সঞ্চয়ে গলজি ভূমিকা পালন করে। এই ধারণা সমর্থিত হবার কারণ হল, প্রাণিদেহে চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তন ঘটলে প্রাণীর কোষে গলজির চেহারা পাল্টে যায়।

banglainternet.com

সাইটোপ্লাজমীয়-ক্ষুদ্রাঙ্গ

কোষের সাইটোপ্লাজমীয়-ঝিল্লীসমূহ কৌষীয় উপাদান সৃষ্টির জন্যে পুরোপুরি দায়ী নয়। অথবা শুধু গঠনের ক্ষেত্রেও এসব ঝিল্লী ব্যবহৃত হয় না। একটি উপাদানের উৎপাদন, একটি গঠন এবং একটি কাজ সম্পাদনের জন্য (যেমন স্নায়ুর সংজ্ঞা চালানো) শক্তির দরকার। অথবা দরকার খাদ্যের। পুরো কোষের কল্যাণে কোষের

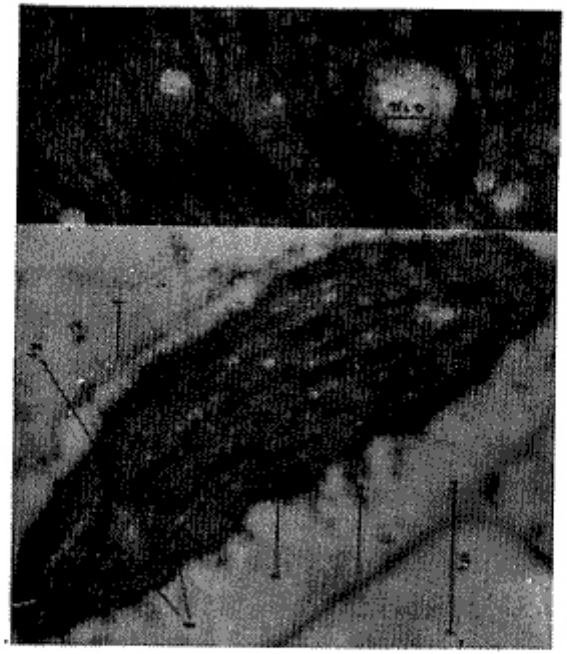

চিত্র ২১২ ঃ শাক-পাতার ক্লোরোপ্লাস্টের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। এতে গ্র্যানা (g), আন্তগ্র্যানা শূন্যস্থান (ig), স্ট্রোমা (s), একটি ভ্যাকুওলকে ঘিরে ঝিল্লী (l) এবং কোষপ্রাচীর (cw) দেখা যাচ্ছে।

ডানে, গ্র্যানার উচ্চতর বিবর্ধিত চিত্র। এতে ল্যামেলা-র বিন্যাসক্রম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে (সৌজন্য, Schidlofsky)

কতিপয় অংশকে উপরিবর্ণিত সব কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। খাদ্যদ্রব্য বাইরের পরিবেশ থেকে প্লাজমা-ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। এখানে আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নেব যে কোষের জন্যে অবিরাম শক্তির উৎস ও খাদ্য মজুদ থাকে। তদুপরি কোষ এসব খাদ্য ও

banglainternet.com

শক্তিকে বিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে এর অন্যান্য উপাদানে পরিণত করছে। ব্যাপক সংখ্যক প্লাস্টিড (plastid) ও মিটোকণ্ড্রিয়া (mitochondria) প্রধানত কোষের শক্তি-সমস্যার সাথে জড়িত। বলাবাহুল্য, প্লাস্টিড ও মিটোকণ্ড্রিয়ার গঠন-প্রকৃতিও ঝিল্লীর অনুরূপ।

জীবন রক্ষা ও এর অবিরাম প্রবাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির চরম উৎস হল সূর্য। পৃথিবীতে এই শক্তি তাপ ও আলোকের আকারে সূর্য থেকে আসে। যেহেতু কোষ সীমাবদ্ধ তাপমাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকে সেহেতু এটি তাপশক্তিকে অধিকহারে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু আলোক-শক্তিকে বেশী মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে। দীর্ঘকাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কোষে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ ঘটেছে যার দ্বারা কোষ আলোক-শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে।

আলোক-শক্তিকে ধরা ও একে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানির অণুতে আলোক-শক্তিকে মজুদ করা ইত্যাদি ব্যাপারকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এখানে আমাদের শুধু লক্ষ্য করা দরকার যে, পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিল আলোক-শক্তিকে শোষণ করার ফলে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাইটোপ্লাজমীয়-ক্ষুদ্রাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টই হল পত্রহরিতের উৎস — যেখানে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে ক্লোরোপ্লাস্টকে মোটামুটি জটিল আকৃতির অঙ্গরূপে দেখা যায় (চিত্র ২১২)। ক্লোরোপ্লাস্টের চতুষ্পার্শ্ব একটি ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। এর অভ্যন্তরভাগে সারি সারি স্তরবিশিষ্ট (lamellar) ও স্তরহীন (non-lamellar) অংশ রয়েছে। পূর্বোক্ত অংশকে গ্র্যানা (grana) ও শেষোক্তটিকে বলা হয় স্ট্রোমা (stroma) অঞ্চল। স্বল্প সংঘটিত স্ট্রোমা অঞ্চলে গ্র্যানাসমূহকে স্তরীভূত প্লাই উডের মতো দেখায়। গ্র্যানার অভ্যন্তরস্থিত প্রোটিন স্তরসমূহের ভিতরে এবং লিপিড ও ক্যারোটিনয়ডের (চিত্র ২১৩) খুব কাছে একস্তরবিশিষ্ট ক্লোরোফিল অণুগুলিকে দেখা যায়। ক্লোরোফিল অণুর এই বিন্যাস-প্রকরণ শুধু আলোক-শক্তি ধরার সহায়ক নয়, এতে সালোক সংশ্লেষণে শক্তির ব্যবহার ও পরিবহণের সুবিধা হয়। স্ট্রোমা ক্লোরোপ্লাস্টের জলীয় অংশরূপে অধিকতর বিবেচ্য। এই জলীয় অংশে লবণ ও এনজাইম দ্রবীভূত থাকে। কিন্তু ক্যালভিনের চিত্রে এনজাইমকে গ্র্যানারও অংশরূপে বিবেচনা করা হয়।

banglainternet.com

গ্র্যানাস্তরে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন এক-কোষী শৈবাল ইউগ্লিনাকে দীর্ঘদিন অন্ধকারে রাখা হলে এর দেহের বর্ণ লোপ পায়। ফলে ক্লোরোপ্লাস্টের অংশবিশেষ ও গ্র্যানার স্তরসমূহ অন্তর্হিত হয়। ইউগ্লিনার দেহ পুনরায় আলো পেলে এতে ক্লোরোফিল ও উল্লেখিত স্তরসমূহ গঠিত হতে থাকে। চার ঘণ্টার মধ্যে পাতলা স্তর গঠিত হয়। আর পুরো ক্লোরোপ্লাস্টটি ৭২ ঘণ্টায় গঠিত হয় বলেও প্রমাণ আছে।

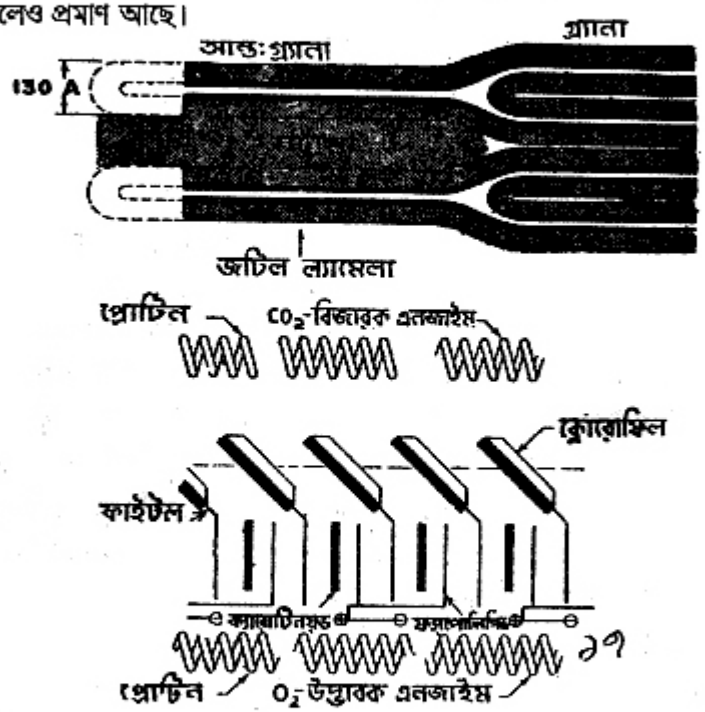

চিত্র ২১৩ : উপরে : গ্র্যানায় ল্যামেলা স্তরসমূহের বিন্যাস। নীচে : ল্যামেলার সম্ভাব্য অণু-বিন্যাস পদ্ধতি।

সালোক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী এনজাইমসমূহ প্রোটিন স্তরেরই অংশ। ক্লোরোফিল কর্তৃক ধৃত শক্তিকে, ক্যারোটিনয়ড ও ফসফোলিপিড অণু স্থানান্তর গমনে সহায়তা দান করে। (সৌজন্য, A. J. Hodge and M. Calvin)

এ ধরনের তথ্য আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় যে, আলোক-সংশ্লেষের জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের সুশৃঙ্খল স্তরবিন্যাস অপরিহার্য। শুধু তাই-ই নয়, বস্তুর গঠন ও কার্যকারিতা যে পরস্পর নির্ভরশীল তাও এর থেকে প্রমাণিত হয়। জীববিজ্ঞানীরা

banglainternet.com

দীর্ঘদিন ধরে আশা পোষণ করে আসছেন যে, টেস্টটিউবের ক্লোরোফিল দ্রবণে তাঁরা সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটাতে পারবেন। এটি সম্ভব হলে চিনি তৈরীর একটি সফল পদ্ধতি উদ্ভাবনেও তাঁরা সক্ষম হবেন। এর সম্ভাবনা আশা করা যায়। তবে ক্লোরোফিলের অণুসমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করার কোন পদ্ধতি তাঁদেরকে আগেভাগে বের করতে হবে।

ক্লোরোপ্লাস্টের আকার নানান ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন গাছের কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কতিপয় শৈবাল, যেমন স্পাইরোগাইরার কোষে মাত্র একটি ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে। কোষ বিভাজনের সময়, এটিও বিভাজিত হয়। অথচ ঘাসের নরম ডগার প্রতি কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা ৩০–৫০। অপরিপক্ক বা প্রাক-প্লাস্টিড (proplastid) অবস্থায় এসব ক্লোরোপ্লাস্ট বিভাজিত হয়। তবে কোষ বিভাজনের সাথে উপরিলিখিত প্রাক-প্লাস্টিডের বিভাজন কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। কোন কোন ক্লোরোপ্লাস্টে গ্র্যানা অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে। যেমন কিছু বাদামী রঙের শৈবালে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সমগ্র ক্লোরোপ্লাস্টের দৈর্ঘ্য জুড়ে দীর্ঘ ঝিল্লীসমূহ গ্র্যানার স্থান দখল করে এবং সম্ভবত এসব ঝিল্লী গ্র্যানার অনুরূপ কাজ করে থাকে। অপরদিকে নীল-সবুজ বর্ণের শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। বিনিময়ে সাইটোপ্লাজমে শিথিলভাবে বিন্যস্ত ঝিল্লীসমূহ থাকে। ঝিল্লীর উপরে থাকে সালোক-সংশ্লেষকারী স্তরীভূত রঞ্জক পদার্থ। শুধু ঝিল্লীহীন ব্যাকটেরিয়া কোষেরই আলোক-সংশ্লেষ ক্ষমতা আছে বলে আমাদের জানা। ব্যাকটেরিয়ায় সালোক-সংশ্লেষকারী উপাদান হল ভ্যাকুওল-সদৃশ ক্রোম্যাটোফোর (chromatophore)। কিন্তু আলোক-সংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থের অণু-বিন্যাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। যাহোক, ব্যাকটেরিয়াকে অন্ধকারে রাখলে এর দেহ ক্রোম্যাটোফোর হারায়, ফলে ব্যাকটেরিয়া সালোক-সংশ্লেষে সক্ষম হয় না। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে ক্রোম্যাটোফোর ইউগ্লিনার ক্লোরোপ্লাস্টের অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন করে। গঠনগত দিক থেকে না হলেও কার্যগত দিক থেকে ক্রোম্যাটোফোর ও ক্লোরোপ্লাস্ট সমান।

সব প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে না এবং সব প্লাস্টিড সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশও নেয় না। যেমন, গোল আলুতে প্লাস্টিড থাকে স্টার্চ বা শ্বেতসারের মজুদখানা রূপে, আবার অন্য সব কোষে থাকে তা প্রোটিন বা তৈলাধার হিসাবে। এই প্লাস্টিডসমূহের ল্যামেলা স্তরীভূত অবস্থায় থাকে না। অবশ্য, এরাও

উদ্ভূত হয় সাধারণ টাইপের প্লাস্টিড থেকে। পরিপক্ক কোষের ধরনের উপর প্লাস্টিডটি কি রকম হবে তা নির্ভর করে।

জীববিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল অধিকাংশ ছাত্রের ধারণা যে, সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া হলো — প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন অণুর সহায়তায় আলোক-শক্তি কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে (reduce) এবং ফলে সাধারণ শর্করা অণু তৈরি হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উপরিবর্ণিত হাইড্রোজেন অণু, জল বিশ্লেষিত হয়েই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ধারণাই যথেষ্ট নয়। আমরা বর্তমানে জানতে পেরেছি যে, এনজাইম নিয়ন্ত্রিত কতিপয় পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরোফিল ধৃত আলোক-শক্তিকে

চিত্র ২১৪ : ইঁদুরের অগ্ন্যাশয়িক কোষের মিটোকণ্ড্রিয়ার উচ্চতর বিবর্ধিত ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। মিটোকণ্ড্রিয়ার বহির্দেশ দ্বিত্ব আকৃতিবিশিষ্ট এবং এর ভিতরের স্তর অবিচ্ছিন্নভাবে অভ্যন্তরস্থ আড়াআড়ি ঝিল্লীর সাথে যুক্ত। (সৌজন্য, Dr. B. L. Mungov)

একটি শক্তিশালী যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। এই যৌগিক পদার্থের নাম এডিনোসিন ট্রাইফসফেট* (adenosine triphosphate or ATP)। সুতরাং ক্লোরোপ্লাস্টকে দ্বৈত-শক্তি পরিবর্তক বলা যায়। যেহেতু কোষ যুগপৎ শর্করা-শক্তি ও এডিনোসিন ট্রাইফসফেটকে বিবিধ প্রকারে ব্যবহার করতে পারে।

মিটোকণ্ড্রিয়ন (mitochondrion) অন্য টাইপের শক্তি পরিবর্তক। (চিত্র ২১৪)। বস্তুত সব টাইপের কোষে (ব্যাকটেরিয়া, নীল-সবুজ শৈবাল এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকা ভিন্ন) এদের পাওয়া যায়। জীবন্ত কোষে এরা অবিরাম গতিময় থাকে। আকারে মিটোকণ্ড্রিয়া ০ ২ — ৫.০μ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

banglainternet.com

* W. D. McElory রচিত "Cell Physiology and Biochemistry" 2nd ed. (Englewood Cliffs, N j. : Prentice-Hall, 1964)-এ বিশদ আলোচিত।

আকৃতিতে গোল বা রড-সদৃশ। অবশ্য, জীব বা কোষের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর এদের আকার, আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠন নির্ভরশীল। ২৫μ আকারবিশিষ্ট ইঁদুরের যকৃৎ কোষে ১০০০টির মতো মিটোকণ্ড্রিয়া থাকতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, দেহের যেখানে কোষসমূহ অধিক ক্রিয়াশীল থাকে সেসব অংশের কোষে এক গাদা মিটোকণ্ড্রিয়া জড়ো হবার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, দেহের সন্ধিস্থল, শুক্রাণুপুচ্ছ, অন্ত্রের এপিথেলিয়েল কোষ এবং সংকোচনী পেশী ইত্যাদি। সন্ধিস্থলে স্নায়ুকোষসমূহ সর্বক্ষণ পরস্পর মিলিত হয় এবং ঝিল্লীর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করে। শুক্রাণু পুচ্ছ অনবরত নড়তে থাকে এবং আন্ত্রিক কোষও খাদ্যসার শোষণকালে সর্বক্ষণ ক্রিয়ারত থাকে। আর সংকোচনী পেশীর কোষেরও বিশ্রাম থাকে না বললেই হয়। মিটোকণ্ড্রিয়ার এরূপ সম্মিলন আকস্মিক নয়, কারণ, বর্তমানে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে শক্তি-পরিবহণে মিটোকণ্ড্রিয়ার মতো পদার্থসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথমে মিটোকণ্ড্রিয়ার গঠন-প্রকৃতি আলোচনা করা যাক। ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চ-বিশ্লেষণী লেন্সে মিটোকণ্ড্রিয়ার আকৃতি চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। প্রতিটি মিটোকণ্ড্রিয়ার চতুষ্পার্শ্বে লিপো-প্রোটিন গঠিত দুটি ঝিল্লী থাকে। ঝিল্লী দুটি প্লাজমা-ঝিল্লি ও নিউক্লিয়াস-ঝিল্লীর প্রায় অনুরূপ। ভিতরের ঝিল্লীটি বিবিধভাবে ভাঁজবদ্ধ হয়ে থাকে। ভাঁজবদ্ধ অবস্থায় একে ক্রিস্টি (cristae) বলা হয়। বিস্তৃত এই ঝিল্লীটি ভাঁজবদ্ধ হয়ে অবস্থান করার ফলে এই ছোট্ট পরিসরেও এর স্থান সংকুলান হয়। একে ২১৫ নং চিত্রে নকশার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। বাইরের ঝিল্লীটি স্থিতিস্থাপক। মিটোকণ্ড্রিয়া এই ঝিল্লীর বদৌলতে সহজে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। ঝিল্লীর প্রসারণ ক্ষমতার উপর মিটোকণ্ড্রিয়ায় প্রবেশ্য পদার্থসমূহের আকার নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, এই ঝিল্লীর সংকোচন-বিকোচনের ক্ষমতার উপর মিটোকণ্ড্রিয়ার কার্যধারারও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিটোকণ্ড্রিয়ার ভিতরে হল তরল দশা (liquid phase) বা ম্যাট্রিক্স (matrix)। এটি ঝিল্লী-দশার (membrane phase) বিপরীত বা বিসদৃশ। এই দুই দশা কোষের বিপাক ক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ডিফারেন্সিয়েল সেন্ট্রিফিউগেশনের (differential centrifugation) মাধ্যমে বার্স্ট কোষ (burst cell) থেকে বিচ্ছিন্ন করা মিটোকণ্ড্রিয়ায় উপরিলিখিত দশা দুটিকে যুগপৎ আলাদা করা ও পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

মিটোকণ্ড্রিয়া কোষের শ্বাস কেন্দ্র। মিটোকণ্ড্রিয়ার বাইরে বিপাক জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট এনজাইম দ্বারা এসবের ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রতর অংশসমূহের নাম যথাক্রমে পাইরুভিক, এমিনো এসিড ও ফ্যাটি এসিড। এসিডসমূহ মিটোকণ্ড্রিয়ার ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে ম্যাট্রিক্স বা ধাত্রে (matrix) প্রবেশ করে। ধাত্রে এনজাইম প্রক্রিয়ার ফলে পাইরুভিক ও এমিনো এসিড থেকে একসাথে একটি এবং ফ্যাটি এসিড থেকে দুটি কার্বন পরমাণু বিচ্ছিন্ন হয়। জারণ (oxidation) নামে পরিচিত এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অংশগ্রহণ করে।

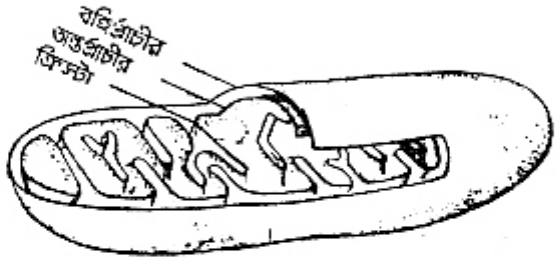

চিত্র ২১৫ ঃ সাধারণ মিটোকণ্ড্রিয়ার একটি নক্শা (সৌজন্য, Dr. A. H. Lehninger)

প্রক্রিয়া শেষে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, পানি ও রাসায়নিক শক্তি উৎপাদিত হয়। অবশ্য শক্তি এখানে তাপ হিসাবে রূপান্তরিত না হয়ে পুনরায় রাসায়নিকরূপে শেষাবধি এটিপি (ATP)-তে চালিত হয়। ক্লোরোপ্লাস্টে মিটোকণ্ড্রিয়ন আলোক-শক্তি-ধরার ক্রিয়ার অংশরূপে এটিপি গঠন করে। শক্তির আধার এই সব 'এটিপি' কোষের যে অংশে যখন প্রয়োজন তখনি প্রেরিত হতে পারে। মিটোকণ্ড্রিয়ার অভ্যন্তরের তরল পদার্থে অনেক এনজাইম দ্রবীভূত থাকে। এই তরল পদার্থে উল্লিখিত বিপাক জ্বালানীসমূহ ভেঙ্গে যায়। মিটোকণ্ড্রিয়ার ঝিল্লীর প্রাথমিক কাজ হলো এটিপি উৎপাদন করা। অবশ্য ভিতরে ঝিল্লীর সূত্রসমূহে এনজাইমসমূহের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এসব এনজাইম এপাশ থেকে ওপাশে ইলেকট্রনকে স্থানান্তর করায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রনসমূহ এটিপি-তে মিশে না যায় ততক্ষণ ইলেকট্রনের এই ছোটাছুটি চলতে থাকে। আলোচিত এই প্রক্রিয়ার নাম অক্সিডেটিভ ফসফোরাইল্যাশন (oxidative phosphorylation)।

banglainternet.com

মিটোকণ্ড্রিয়াকে ছিঁড়ে এনজাইমের দুটো পদ্ধতিকে পরীক্ষামূলকভাবে আলাদা করা যায়। মিটোকণ্ড্রিয়ার প্রায় সত্তরটি এনজাইমকে জানা গেছে। এসব জারণকারী এনজাইমকে দ্রবণেই পাওয়া যায়। কিন্তু ঝিল্লীর ফসফোরাইল্যাটিং এনজাইমকে আলাদা করে বের করা শক্ত ব্যাপার। ২.১৬ নং চিত্রে এনজাইমের সম্ভাব্য বিন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি মিটোকণ্ড্রিয়ায় প্রায় ২০,০০০ এনজাইমের সমাবেশ ঘটে। যদি ধারণা সত্য হয় তাহলে গঠনগত ও কার্যগত বিচারে ঝিল্লী দুটো উদ্দেশ্যই সাধন করে। আবার অন্য প্রমাণে দেখা যায়, এতে এনজাইমের যেরূপ বিন্যাস ঘটে, তদ্রূপ বিন্যাস দেখা যায় অন্তপ্লাজমীয়-জালির রাইবোজোমের এনজাইমে। কাজেই, এ বিষয়ে পুরোপুরি জানার প্রয়োজন আছে।

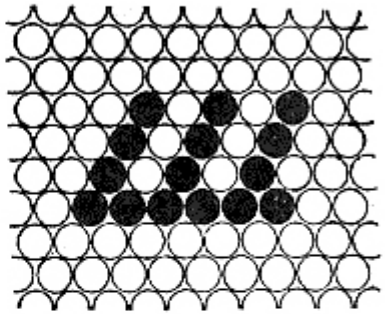

চিত্র ২.১৬ ঃ ফসফোরাইল্যাটিং এনজাইমের বিন্যাস বিষয়ক আনুমানি[illegible]কশা।
কালো বৃত্ত 'এসেম্ব্লি লাইন' ও সাদা বৃত্ত প্রোটিন-প্রাচীর সংলগ্ন এনজাইমকে চিহ্নিত করছে।
(সৌজন্য, Dr. A. H. Lehninger)

কাজেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শক্তির ধারণ, রূপান্তরকরণ ও স্থানান্তরকরণ ইত্যাদি কোষের সংগঠনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ক্লোরোপ্লাস্ট সৌরশক্তি ধারণ করে, আর মিটোকণ্ড্রিয়া এই শক্তিকে আণবিক জ্বালানীতে রূপান্তরিত করে। ক্লোরোপ্লাস্ট ও মিটোকণ্ড্রিয়া যৌথভাবে শক্তিকে শর্করা বা এটিপি-তে পরিণত করে। কোষের প্রয়োজন-মাফিক এটিপি-কে ব্যবহার করা হয়।

অধিকাংশ কোষের সাইটোপ্লাজমে মিটোকণ্ড্রিয়ার অনুরূপ অন্যান্য উপাদান দেখা যায়। এ সবের নাম **লাইসোজোম** (lysosomes)। এদেরকে মিটোকণ্ড্রিয়া থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। এসবের ভিতরে মিটোকণ্ড্রিয়ার মতো ভাঁজ বা ক্রিস্টি নেই। তদুপরি এদের এনজাইমসমূহও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লাইসোজোমকে কোষের পরিপাক-তন্ত্ররূপে ধরে নেওয়া হয়। এর এনজাইমসমূহ মূলত হাইড্রোল্যাসেস (hydrolases)। এনজাইমের প্রধান কাজ হল বড় বড় অণু ও এমনকি ঝিল্লীর ভগ্নাংশকে পানি যোগে ভাঙা। এর থেকে উপজাত বস্তুসকল সম্ভবত

banglainternet.com

লাইসোজোম থেকে চুয়ে মিটোকণ্ড্রিয়ায় যায়। এসব বস্তু মিটোকণ্ড্রিয়ায় শ্বাস-ক্রিয়া-কালে আরো ভেঙে যায়।

কৌষীয় অন্যান্য উপাদান

নিউক্লিয়াস ছাড়া অপর যে দুটি উল্লেখযোগ্য উপাদান কোষে রয়েছে সেসব হল ঃ ভ্যাকুওল ও সেন্ট্রোজোম। কিছু পরেই আমরা নিউক্লিয়াস নিয়ে আলোচনা করব।

ভ্যাকুওল সাইটোপ্লাজমের ভিতরে ঝিল্লী-বদ্ধ ফাঁকা স্থান যা তরল পদার্থে পূর্ণ। প্রাণিকোষের চেয়ে উদ্ভিদকোষেই এর প্রাধান্য বেশী। সম্ভবত অন্তপ্লাজমীয়-জালির ফাঁকা অঞ্চল সম্প্রসারিত হয়ে ভ্যাকুওলের জন্ম দেয়। এই সিদ্ধান্ত, কোষের বিকাশপর্যায় গবেষণার ফল নয়। ভ্যাকুওলের ঝিল্লী বা টোনোপ্লাস্ট বিচার করেই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়। বলাবাহুল্য, এই ঝিল্লী অন্তপ্লাজমীয়-জালির অনুরূপ। বিভাজনরত কোষ ভিন্ন উদ্ভিদের অধিকাংশ কোষের প্রায় সবকটুকু জায়গা জুড়ে অবস্থান করে ভ্যাকুওল (চিত্র ২.১৭)। সাধারণত ভ্যাকুওল কোষের কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং সাইটোপ্লাজমকে কোষপ্রাচীর সংলগ্ন হয়ে থাকতে বাধ্য করে। ফলে, সাইটোপ্লাজম কোষের বাইরের পরিবেশের সাথে গ্যাসের ত্বরিৎ আদান-প্রদানের

চিত্র ২.১৭ ঃ উদ্ভিদকোষের তিনটি উদাহরণ ঃ ভ্যাকুওল গঠনের ফলে সাইটোপ্লাজম কিভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং এর সাথে বাইরের আদান-প্রদান কিরূপে হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে।
ক. এক কোষ স্তরবিশিষ্ট পেঁয়াজের সেকশান থেকে নেওয়া কোষ।
খ. স্পাইডার উর্টের (Tradescantia) ফুলের পরাগদণ্ডের রোম থেকে নেওয়া কোষ।
গ. পাতার সাধারণ কোষ। এতে প্লাস্টিড, নিউক্লিয়াস এবং কোণঠাসা সাইটোপ্লাজমকে দেখা যাচ্ছে।
'খ' চিত্রানুরূপ সাইটোপ্লাজমের সূত্র কোন কোন সময় আড়াআড়িভাবে থাকতে পারে।

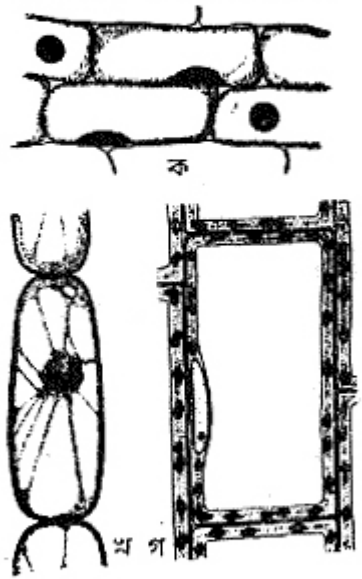

সুযোগ পায়। সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ারত কোষে সাইটোপ্লাজমের উক্ত সুবিধা থাকা অপরিহার্য। কারণ, তখন পুরো সাইটোপ্লাজম স্তর দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের আদান-প্রদান হতেই হয়।

banglainternet.com

কোষের অভ্যন্তরীণ পরিমিত চাপও বজায় রাখে এই ভ্যাকুওল। বাইরের পরিবেশের তুলনায় ভ্যাকুওলের তরল পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা বেশী। কারণ, এর তরল পদার্থে শর্করা, লবণ ও অন্যান্য উপাদান দ্রবীভূত থাকে। সে সঙ্গে আস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষে পানি প্রবেশ করে এবং কোষকে স্ফীতকায় রাখে। প্রোটোজোয়ায় একপ্রকার আরো জটিল ভ্যাকুওল দেখা যায়। এটি সংকোচনশীল। সম্ভবত কোষ থেকে অতিরিক্ত পানি ও বর্জনীয় পদার্থ বাইরে নিঃসরণে এই সংকোচনশীল ভ্যাকুওল অংশ নেয়। প্রোটোজোয়ায় খাদ্য-ভ্যাকুওলও থাকে। এই ভ্যাকুওলে ঝিল্লীবদ্ধ খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয়। পরিপাক করায় এনজাইম। সাইটোপ্লাজমই এনজাইম নিঃসরণ করে এবং এতে সরবরাহ করে।

উদ্ভিদকোষে ভ্যাকুওল অপ্রয়োজনীয় পদার্থের ভাগাড় হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এতে অনেক ধরনের স্ফটিক উপাদান থাকে। বিশেষ করে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের স্ফটিক বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ফলে কোষ অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহার্য দূষিত উপাদান থেকে মুক্ত থাকে।

সেন্ট্রিওলসহ সেন্ট্রোজোম উদ্ভিদকোষের তুলনায় প্রাণিকোষে অধিক পরিমাণে থাকে। নিউক্লিয়াসের ঝিল্লীর বাইরে এর খুব কাছে এটি অবস্থিত। সেন্ট্রোজোম কোষ-বিভাজনে অংশ নেয়। দীর্ঘদিন থেকে এর ভূমিকা সুপরিজ্ঞাত। এর গঠন-প্রকৃতি অবশ্য রহস্যাবৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র কোষের অন্যান্য উপাদানের মত এরও উন্নত জটিল গঠন-প্রকৃতি উদঘাটন করেছে। সেন্ট্রোজোম দৈর্ঘ্যে ৩০০০-৫০০০ Å এবং পরিধিতে নয়টি জোড়া নালিকা বলয়াকারে থাকে। এর প্রতি নালিকার পরিধি ২০০ Å। শুক্রাণুর

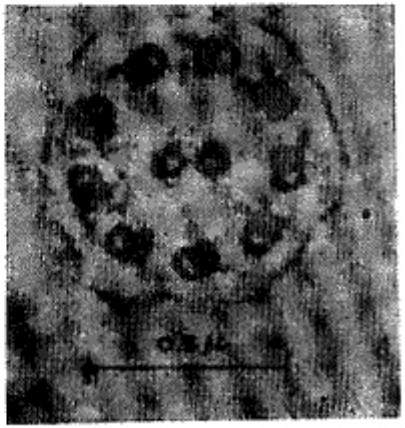

চিত্র ২১৮ : ইঁদুরের শুক্রাণু পুচ্ছের প্রস্থচ্ছেদের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ।

নয় জোড়া নালিকা একটি বলয় সৃষ্টি করেছে বাইরে এবং কেন্দ্রে এক জোড়া নলিকা। যদি চিত্রের কেন্দ্রীয় নালিকা-জোড়া না থাকতো তাহলে একে সেন্ট্রিওলের চিত্রের অনুরূপ বলা যেতো। (সৌজন্য, Dr. T. Nagano)

banglainternet.com

পুচ্ছ, সিলিয়া এবং ফ্লাজেলার প্রস্থচ্ছেদে ওধরনের সেন্ট্রিওল দেখা যায় (চিত্র ২১৮), তবে সেন্ট্রিওলে কেন্দ্রীয় নালিকা জোড়া লাগানো থাকে না।

নিউক্লিয়াস

অণুবীক্ষণযন্ত্রে কোষের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা হল এর নিউক্লিয়াস (চিত্র ১.৪)। নিউক্লিয়াস কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। কারণ, নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম ও জিন থাকে। ক্রোমোজোম ও জিন প্রতিটি কোষের স্বতন্ত্র চরিত্র নির্ধারণ করে।

দু'ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব বিচার করা যায়। যেমন, এমিবার দেহ থেকে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে বা অণু সুঁইয়ের (microneedle) সহায়তায় নিউক্লিয়াসকে আলাদা করা যায়। এ ধরনের ব্যবচ্ছেদের ফলে সাইটোপ্লাজমের কোন ক্ষতি হয় না বরং সাইটোপ্লাজমে প্রয়োজনীয় উপাদান ও এনজাইম যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ এতে বিপাক ক্রিয়া চলতে থাকে। বিপাক ক্রিয়া কয়েকদিন বা সপ্তাহব্যাপী চলতে পারে। এরপর স্বাভাবিকভাবে কোষটি নেতিয়ে পড়ে এবং অপর একটি নিউক্লিয়াস এতে প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এটি সক্রিয় হয়ে ওঠে না। সুতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি যে নিউক্লিয়াসহীন কোষের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং এরই বদৌলতে নিউক্লিয়াস কোষের অপরিহার্য অঙ্গ। সাইটোপ্লাজম অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে পারে।

নিউক্লিয়াস তথ্যেরও উৎস এবং এটি কোষের আকার নিয়ন্ত্রক। বহু এককোষী জীবের স্পষ্ট আকার দেখে আমরা এ বিষয়টি অনুমান করতে পারি। জার্মান জীববিজ্ঞানী মাক্স হেমারলিং উষ্ণ সামুদ্রিক জলের এককোষী শৈবাল গবেষণা করে এর সত্যতা চমৎকারভাবে সপ্রমাণ করেছেন। এসিট্যাবুল্যারিয়ার দুটি প্রজাতির পার্থক্য শুধু টোপর বা ক্যাপের আকারের ক্ষেত্রে (চিত্র ২১৯)। ক্যাপ কেটে দিলে সেটি পুনর্গঠিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ক্যাপ বিচ্ছিন্ন নিউক্লিয়াসহীন এসিট্যাবুল্যারিয়ার উপর অপর প্রজাতির নিউক্লিয়াসসহ একটি খণ্ডকে প্রতিস্থাপন করা যায়। প্রতিস্থাপিত প্রজাতিতে যে ক্যাপটি নতুন করে গজায় সেটি মূল এসিট্যাবুল্যারিয়ার ক্যাপের অনুরূপ নয়। যে প্রজাতির অংশবিশেষকে নিউক্লিয়াসসহ প্রতিস্থাপন করা হলো ক্যাপটি সে প্রজাতির অনুরূপ ক্যাপের আকার ধারণ করল। তাহলে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের ভূমিকাই মুখ্য দেখা গেল। অবশ্য, প্রতিস্থাপিত এসিট্যাবুল্যারিয়ায় যদি উভয় প্রজাতির নিউক্লিয়াস বর্তমান থাকে, তবে

banglainternet.com

ক্যাপটি সংকর আকৃতি নেবে। অর্থাৎ এটি হবে মাঝারি ধরনের। এখানে যুগপথ দুটি নিউক্লিয়াসেরই প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সুতরাং নিউক্লিয়াসই কোষকে সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

নিউক্লিয়াসকে সাধারণত গোলাকার দেখায়। যদিও এটি চ্যাপ্টা লেন্সের মতো বা লোবের (lobe) মতো হতে পারে। নিউক্লিয়াস দ্বিস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। ২৪ নং চিত্রানুযায়ী বাইরের ঝিল্লীটিকে অন্তপ্লাজমীয়-জালির সাথে অবিরাম সংযোজিত দেখা যায়। ২২০ নং চিত্রে এটি আরো স্পষ্ট। নিউক্লিয়াসের ঝিল্লীসমূহের গঠন বিন্যাস এই কথায় প্রমাণ করতে চায় যে এটি বহির্প্লাজমা-

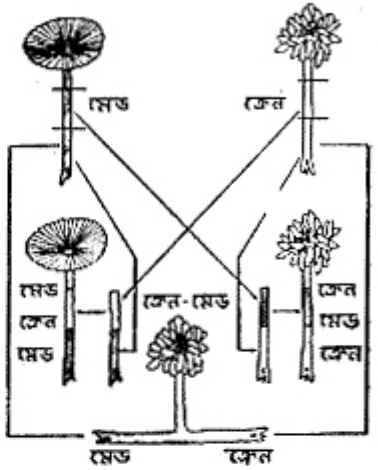

চিত্র ২১৯ ঃ এসিট্যাবুল্যারিয়ার বিকাশে নিউক্লিয়াসের প্রভাব। নিউক্লিয়াসসহ *A. crenulata*-র রাইজোয়ডে *A. mediterranea*-এর অংশবিশেষ এবং একইভাবে *A. mediterranea*-র রাইজোয়ডে *A. crenulata*-এর অংশবিশেষ প্রতিস্থাপিত। যে প্রজাতির নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপিত প্রজাতিতে থাকে, সে প্রজাতির অনুরূপ ক্যাপই সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিস্থাপিত প্রজাতিতে উভয় প্রজাতির নিউক্লিয়াস থাকলে ক্যাপের আকার হয় অন্যরূপ। যেমন *A. crenulata*-র ক্যাপটিকে শিথিল দণ্ডগঠিত এবং *A. mediterranea*-র অগ্রভাগকে সুচালো দেখাচ্ছে।

ঝিল্লীর গভীর ভাঁজদ্বারা আবৃত। যদিও স্মরণ রাখা দরকার, ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সমুদয় কোষ জুড়ে বিস্তৃত ঝিল্লী নজরে পড়ে না, কারণ, অত পাতলা সেকশানে সবটুকু উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়।

নিউক্লিয়াসের বহিঝিল্লীর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে তা' অন্য কোন ঝিল্লীতে নেই। এতে সারি সারি ছিদ্র থাকে। কোষের ধরনের উপর ছিদ্রের সংখ্যা নির্ভর করে। ২২০ নং চিত্রে তা দেখা যাচ্ছে। এসব ছিদ্র দিয়ে নিউক্লিয়াসে বড় বড় অণুরা যাতায়াতে সক্ষম কিনা বর্তমানে এই নিয়ে বিতর্ক চলছে।

ক্রিস্টাল ভায়োলেট বা হিমাটোক্সিলিন দ্বারা নিউক্লিয়াস রাঙালে দেখা যায় — কেন্দ্রস্থলে সূক্ষ্ম সূতার জাল এবং এতে ভারী পদার্থের স্থূল পিণ্ড প্রলম্বিত থাকে। এসব সূত্র হলো ক্রোম্যাটিন বা ক্রোমোজোম (আলোকচিত্র ২২১)। ক্রোমোজোম

প্রলম্বিত ও পরিব্যাপ্ত অবস্থায় থাকে। এসব চতুষ্পার্শ্বস্থ নিউক্লিয়া রসে (nuclear sap) ডুবে থাকে। অ-বিভাজনরত কোষের অতি সক্রিয় ক্রিয়ার সময় ক্রোমোজোমের এই পরিব্যাপ্ত অবস্থা অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করা হয়।

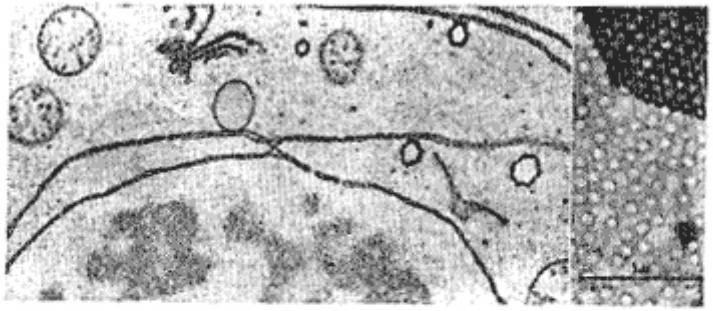

চিত্র ২২০ ঃ নিউক্লিয়-ঝিল্লীর ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ।

বাম ঃ উদ্ভিদের একটি কোষে নিউক্লিয়াস এবং নীচে অস্পষ্ট ক্রোমোজোম, নিউক্লিয়-ঝিল্লীর দ্বৈত বৈশিষ্ট্য ; ঝিল্লীর ছিদ্র ও এর বহির্দেশের সাথে অন্তপ্লাজমীয়-জালির সংযোগ দেখা যাচ্ছে। (সৌজন্য, Dr. G. Whaley)

ডান ঃ ব্যাঙের ডিমের নিউক্লিয়-ঝিল্লীর স্পষ্ট বিবর্ধিত অংশ। এতে নিউক্লিয়-ছিদ্রসমূহকে সুবিন্যস্ত দেখা যাচ্ছে। কালো অংশটুকু ঝিল্লী খণ্ডাংশ যা ছিদ্রসমূহের উপর চেপে আছে। (সৌজন্য, Dr. R. W. Merriam)

এ ছাড়া নিউক্লিয়াসে ঘন, গোলাকার নিউক্লিওলি (nucleoli) থাকে। একবচনে এর নাম নিউক্লিওলাস (nucleolus)। ২২১ ও ১.৪ নং চিত্রে এসব দেখা যাচ্ছে। বিশেষ কতিপয় ক্রোমোজোমের নিউক্লিওলার-সংগঠক নামক সক্রিয় অঞ্চল (চিত্র ৬.৪ এবং ৬.৬) নিউক্লিওলি গঠন করে। ক্রোমোজোমের উল্লিখিত অংশ নিউক্লিওলার পদার্থ উৎপন্ন করে এবং উৎপাদিত উপাদান সহযোগে নিউক্লিওলাসের জন্ম দেয়। যদিও উৎপাদন-পদ্ধতি আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। নিউক্লিওলাসে প্রচুর প্রোটিন এবং রাইবোজ নিউক্লিয়েইক এসিড (RNA) থাকে। নিউক্লিওলাস থেকে আর. এন. এ. সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোমের সাথে সম্ভবত সংযোগ সাধন করে এবং সেখানে প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়।

banglainternet.com

ক্রোমোজোম বিশ্লেষণ করে এতে চারটি প্রধান উপাদান পাওয়া গেছে। ডিসোক্সি রাইবোজ নিউক্লিয়েইক এসিড (DNA), আর. এন. এ. হিস্টোন (histone) নামক স্বল্প ওজনের প্রোটিন অণু এবং একটি আরো জটিল অণু। এই চারটি উপাদান মিলে কিভাবে ক্রোমোজোম সৃষ্টি করে এ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

চিত্র ২.২১ ঃ তরমুজের *(Citrullus vulgaris)* কোষ।

বাম ঃ কোষটি ইন্টারফেজ (interphage) স্তরে আছে। এতে একটি বড় নিউক্লিওলাস এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্রোমোসেন্টার আছে।

ডান ঃ একই কোষকে প্রোফেজ বা প্রথম দশায় দেখা যাচ্ছে। এতে নিউক্লিওলাস নেই এবং ক্রোমোসেন্টারসমূহকে স্বতন্ত্র ক্রোমোজোমের হিটারোক্রোম্যাটিকে অংশরূপে দেখা যাচ্ছে। (L. Geitler, Chromosomenbau, Berlin : Gebrueder Borntraeger, 1938, after Doutreligne)

আমরা শুধু জানি ডি. এন. এ. হল বংশ-চারিত্র্যবাহী অণু। ডি. এন. এ-র অভ্যন্তরীণ গঠনে, চুম্বক ট্যাপের মতো উত্তরাধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী গুটিয়ে থাকে। কোষ ডি. এন. এ. থেকে এসব গুণ পায়। এটিই ডি. এন. এ.-এর বিরল গুণ। অপর তিনটি উপাদানের কার্যকারিতা অনিশ্চিত। আমরা অবশ্য একটি অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি যে, এসব উপাদান ডি. এন. এ.-কে টেকসই রাখায় এবং ডি. এন. এ.-এর বংশগতীয় কার্যধারায় সহায়তা দিতে পারে। কোষ-বিভাজনের কথা স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাব ডি. এন. এ. অণুসমূহ এমনভাবে গঠিত যে এরা বারংবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে। বিস্ময়কর যে, মূল ডি. এন. এ. ও এর প্রতিলিপি পরস্পরের হুবহু অনুরূপ হয়ে থাকে।

banglainternet.com

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ বহির্গত উপাদানসমূহ

প্লাজমা-ঝিল্লীকে কোষের বহির্দেশের জীবন্ত সীমানা হিসাবে সাধারণত বিবেচনা করা হয়। একে বাইরের বা প্রান্ত-আবরণীরূপে গণ্য করার প্রয়োজন নেই। উদ্ভিদকোষে এ ধরনের প্রান্ত আবরণীর সাক্ষাৎ অধিকতর সহজেই পাওয়া যায়। এসব আবরণীর অনেকগুলিতে পুরু সেলুলোজ থাকে। প্রাণিকোষ ও অনেক এককোষী জীবেরও অনুরূপ বহির্গত উপাদান দেখা যায়। যা হোক, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কোষের যে কোন অংশ — তা ভিতরের বা অব্যবহিত বাইরের, জৈব বা অজৈব হোক, একে জীবনের সংজ্ঞা হিসাবে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সবাই জানেন, এ ধরনের সংজ্ঞা ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

কোষ বহির্গত উপাদানসমূহের অধিকাংশই হল প্রোটিন পলিস্যাকারাইড। অর্থাৎ এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু এককের পুনঃযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট বড় বড় অণু। কোন কোন সময় এসব লিপিড আকরিক পদার্থের সাথে মিলে আরো জটিল অণুর সৃষ্টি করে। এই উপাদানসমূহের ক্রিয়াকাণ্ড বিবিধ, যথা ঃ **পানি-ধারণ** ; আঠালো পদার্থ নিঃসরণকারী অনেক শৈবাল পানি ধারণ করে (কতিপয় শৈবাল থেকে উৎপাদিত মোরব্বা [agar] বাণিজ্যিক মূল্য বহন করে)। **দেহ-রক্ষা** ; কাইটিনযুক্ত দৃঢ় দেহাবরণী পতঙ্গের দেহকে রক্ষা করে। **সহায়তা-দান** ; উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ ও অস্থি-তরুণাস্থি গঠনে কোলাজেন দিয়ে সাহায্য করে। **দৃঢ় ও টেকসই করা** ; অস্থির আকরিক অংশ, দন্তসীনা ও দন্তমিনা, ডায়াটমের বালিগঠিত খোলককে এবং কাইটিনকে দৃঢ় ও টেকসই করে। **নমনীয়তা** ; ত্বক ও ধমনী প্রাচীরে নমনীয় কলা সরবরাহ করে। **আসঞ্জনশীলতা** ; উদ্ভিদকোষের মধ্য-ল্যামেলি এবং প্রাণিকোষের হায়লুরোনিক এসিড ও কন্ড্রিওটিন সালফেটকে আসঞ্জনশীল করে তোলে। **ভেদ্য-ক্ষমতা** ; এসব উপাদান কোষের মধ্যে বিবিধ পদার্থের আসা-যাওয়া ইত্যাদিকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমিবা ও অন্যান্য জলজ জীবে যে আসঞ্জনশীল পদার্থ নিঃসৃত হয় তা এসব জীবের গড়িয়ে চলার প্রয়োজনে তৈলাক্ত পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যাকটেরিয়ার অনাক্রম্য ও তীব্র ক্ষতিকর গুণাগুণকেও এসব নিঃসৃত

banglainternet.com

পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোষের উপরিতলের আসঞ্জনশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে বিভাজনরত কোষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত ; ফলে কোষের বহুকোষীরূপ ধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।

কোষ বহির্গত উপাদান-বিষয়ক আলোচনা ব্যাপক ও বিবিধ। উচ্চতর প্রাণী ও উদ্ভিদে সাধারণত যেসব উপাদান সচরাচর দেখা যায়, আমাদের আলোচনা সেসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর

৩.১ নং চিত্রে একটি সাধারণ উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও মূলের কোষ-প্রাচীরের তির্যকচ্ছেদ দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশিস্থিত কোষসমূহ **মধ্য-ল্যামেলা** নামক একটি স্তর দ্বারা বিযুক্ত থাকে। অথবা বলা যায় উভয় কোষ আন্ত-কৌষীয় উপাদান দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় দুটি কোষের মধ্যে এটি প্রথম ভেদকরূপে গঠিত হয়। পরে এটি আন্ত-কৌষীয় সিমেন্ট হিসাবে উভয় কোষকে আবদ্ধ করে। যদিও পরিষ্কার জানা যায়নি, তবু এতে

চিত্র ৩.১ : পরিপক্ক ও লিগনিন গঠিত কোষের সাধারণ কোষ-প্রাচীরের আকৃতি।
বাম ঃ প্রস্থচ্ছেদে গৌণ প্রাচীরের বিবিধ স্তর ও জটিল গঠন-প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।
ডান ঃ অনুরূপ কোষের অণুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ
(সৌজন্য, K, Esan, Plant Anatomy. New York, Wiley, 1953)

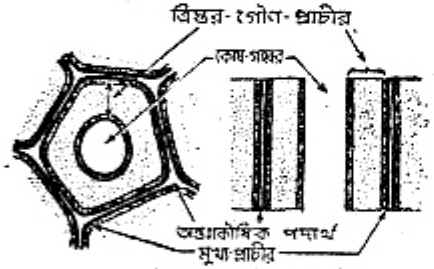

পেকটিন-এর ভাগই বেশী বলে অনুমিত হয়। পেকটিন শর্করাজাত বলেই একে সেলুলোজের সমগোত্রীয় বলা যায়। আমাদের অধিকাংশেরই জানা যে পেকটিন আসঞ্জনশীল পদার্থরূপে কাজ করে এবং কোষমধ্যস্থ জেলীর ন্যায় পদার্থকে স্থির রাখার দায়িত্ব পালন করে। মধ্য-ল্যামেলা ও প্লাজমা-ঝিল্লীর মধ্যেস্থিত মুখ্য প্রাচীর (primary wall) সাইটোপ্লাজম দ্বারা নিঃসৃত হয়। কোষ বড় হবার সময় এই প্রাচীর পাতলা, নমনীয় ও অধিক প্রসারণক্ষম হয়ে ওঠে। মূলত সেলুলোজ ও বিবিধ শর্করা দ্বারা প্রাচীর গঠিত হয়। কিছু প্রোটিনও এতে অংশ নেয়। কোষ-এর বৃদ্ধি বন্ধ হলে প্রাচীর পুরু হতে থাকে। মুখ্য প্রাচীর ও প্লাজমা-ঝিল্লীর মধ্যে গৌণ প্রাচীর

banglainternet.com

(secondary wall) গঠিত হয়। গৌণ প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। এর বর্ণও বিবিধ হয়ে থাকে। বিবিধ পর্যায়ে ও নমুনায় আবার শক্তও হয়ে থাকে। গৌণ প্রাচীরই উদ্ভিদের হরেক ধরনের কাঠ ও আঁশ তৈরি করে। উদ্ভিদের

চিত্র ৩.২ ঃ তুলার আঁশের বৃদ্ধি ও গঠন।

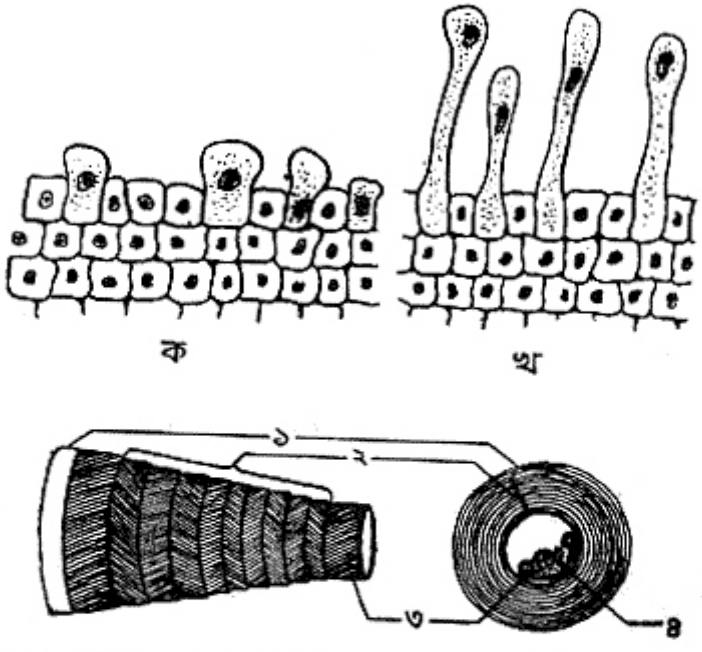

ক. ফুল ফোটার প্রথম দিনে তরুণ তুলাবীজের বহিঃকোষস্তরের আঁশের বৃদ্ধি (শুরুতে) দেখা যাচ্ছে।

খ. ২৪ ঘন্টার পরের অবস্থা

গ. পরিপক্ক তুলার আঁশের সেলুলোজের বিভিন্ন নকশা (১) বাইরের মুখ্য প্রাচীর (২) এককেন্দ্রিক অভ্যন্তরস্থ স্তরবলয়। গৌণ প্রাচীরে সেলুলোজ কিভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে তা প্রদর্শিত হয়েছে। (৩) গৌণ প্রাচীরের ভিতর দিকের শেষ স্তর।

ঘ. একই বিষয় প্রস্থচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে। (৪) এতে কোষ-বস্তুর অন্যান্য অংশ দেখানো হয়েছে।

(সৌজন্য, Brown and Ware, Cotton, 3rd ed. New York, McGraw Hill, 1958)

বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই প্রাচীরই দায়ী। আঁশের মধ্যে রয়েছে তুলা, বাঁশ ও শন। কাঠ ও আঁশ থেকে সৃষ্ট সেলুলোজ দিয়েই রেয়ন, নাইট্রো-সেলুলোজ, সেলোফিন ও কতিপয় প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়।

banglainternet.com

তুলার আঁশ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কোষ-প্রাচীর গঠনের পদ্ধতিটি পরখ করা যেতে পারে। পরিপক্ক আঁশ বা লিন্ট, দৈর্ঘ্যে আধ থেকে দেড় ইঞ্চি। বীজের খোসার কোষের একেবারে বাইরের স্তরে বা এককথায় বহিঃস্তরে (চিত্র ৩.২) প্রতিটি লিন্ট-কোষ পার্শ্ববর্তী লিন্ট কোষের সাথে একটি মধ্য ল্যামেলা দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এতে একটি পাতলা মুখ্য প্রাচীর থাকে। ফুল ফোটার দিন কোষসমূহ দীর্ঘ হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া ১৩-২০ দিন চলে এবং কোষটি ১০০০-৩০০০ গুণ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাড়ে। মুখ্য প্রাচীরের সম্প্রসারণ ক্ষমতা তখন রহিত হয়ে যায় এবং গৌণ প্রাচীরের গঠন শুরু হয়। এ সময় সাইটোপ্লাজমের শর্করা রূপান্তরিত হয়ে সেলুলোজ আঁশে পরিণত হয় এবং মুখ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে জমা হতে থাকে। ফল পরিপক্ক হওয়া অবধি সেলুলোজ ক্রমাগত জমা হতেই থাকে। তারপর কোষটি মরে, শিথিল হয়ে চ্যাপ্টা আঁশের রূপ ধারণ করে। এই আঁশ দিয়েই কার্পাস সুতা ও কাপড় তৈরি হয়।

সেলুলোজ হল বড় অণু। শর্করার (গ্লুকোজ) ক্ষুদ্র অণু এককসমূহ পুনঃ-যোজিত হয়ে ক্ষুদ্র-আঁশের সৃষ্টি হয়। এসব পরে এমন আকার ধারণ করে যা ইলেকট্রন -অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বড় অকারের বলে প্রতীয়মান হয় (চিত্র ৩.৩)। প্রস্থচ্ছেদে তুলার আঁশের পরিধি ৩০০μ^2 এবং এটি এক বিলিয়ন সেলুলোজ চেইন দ্বারা গঠিত। এসব চেইন বিভিন্ন আকারের আঁশে গ্রুপবদ্ধ হয়। প্রতিটি চেইন আঁশ বরাবর সমান্তরালভাবে সমুদয় আঁশ জুড়ে অবস্থান করে বা কোন সময় আঁশের সাথে প্যাঁচিয়ে থাকে। এসব চেইনের ভিতরকার ফাঁকের জন্যে আঁশ নমনীয় হয় এবং আঁশ রং ধারণে সক্ষম হয়। আর চেইন সমান্তরালভাবে প্রলম্বিত থাকলে আঁশ দৃঢ় ও প্রসারণক্ষম হয়। তুলার

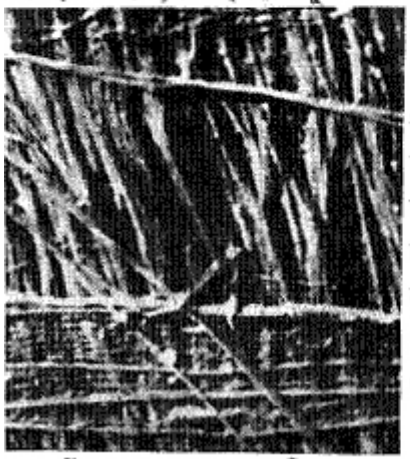

চিত্র ৩.৩ ঃ শৈবাল কোষপ্রাচীরে সেলুলোজের আঁশ গঠনের দৃশ্য। প্রতিটি আঁশ অসংখ্য ক্ষুদ্র আঁশ দ্বারা গঠিত। ক্ষুদ্র আঁশসমূহ গ্রুপবদ্ধ থাকে। (৩৪,০০০ গুণ বিবর্ধিত)। রশি বা ক্যাবলে যেভাবে আঁশ গ্রুপবদ্ধ হয় এখানেও তদ্রূপ হয়ে থাকে।

প্রতিটি আঁশে ১০ ট্রিলিয়ন সেলুলোজ অণু আছে বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ৬০ কোয়াড্রিলিয়ন গ্লুকোজ অণু থেকে এই সেলুলোজ অণু তৈরি হয়। একটি তুলাবীজের হাজার হাজার আঁশের মধ্যে এই হিসাব মাত্র একটির। মোটামুটি এই হিসাব থেকে উদ্ভিদকোষের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানিকে জৈব-অণুতে রূপান্তরকরণের বিষয়টিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে পারি। কারণ এই জৈব-অণুসমূহই তো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে একটি ব্যাপক কোষ প্রাচীরে পরিণত হয়। কোষ অণুসমূহকে পুনর্যোজিত করা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এর উপাদানসমূহের কাঠামো নির্মাণ করে। উপাদানসমূহ হল প্রোটিন, চর্বি, নিউক্লিয়েইক এসিড এবং পলিস্যাকারাইড ইত্যাদি। মানুষও অনুরূপ পদ্ধতিতে প্লাস্টিক ও কৃত্রিম আঁশ তৈরি করে।

কোষপ্রাচীরের সংঘটনে দুটি সুষ্ঠু গঠন-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। বিশুদ্ধ সেলুলোজ গঠিত তুলার আঁশের শক্তি, ক্ষুদ্র আঁশ অণুর বড় অণুতে গ্রুপবদ্ধ হবার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অণু যত বড় হয় ততই এর শক্তি বাড়ে। রশি বা ক্যাবল তৈরিতে আঁশকে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয় এক্ষেত্রেও তদ্রূপ অণু-বিন্যাস ঘটে থাকে। অন্য ধরনের কোষ-প্রাচীর বিবিধ উপাদানে পরিপূর্ণ। এসবের মধ্যে লিগনিন একটি। লিগনিন জটিল, আঁশহীন। শর্করাজাত এই লিগনিন সেলুলোজ আঁশের ফাঁকে গঠিত হয়। লিগনিন ও সেলুলোজের বিন্যাস প্রকরণ আধুনিক ইমারত নির্মাণ কৌশলের অনুরূপ। আধুনিক ইমারতে লৌহ-কাঠামোর মধ্যে কংক্রিট ঢালাই করা হয়। এখানে সেলুলোজ লৌহ-শলাকা ও লিগনিন কংক্রিটের মতো কাজ করে। সেলুলোজ প্রসারণক্ষম ও দৃঢ় এবং লিগনিন চাপরোধি। তুলার আঁশে সেলুলোজকে অবশ্য অত সুবিন্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে ফ্যাটি এসিড-জাত কিউটিন ও মোম লিগনিনের স্থান দখল করতে পারে। সেক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর কম মজবুত হয় বটে, তবে এর উপরিতল জলরোধি হয়।

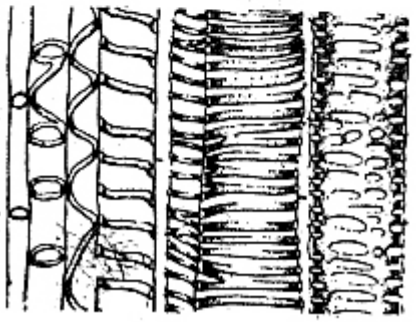

চিত্র ৩.৪ ঃ উচ্চশ্রেণীর কাঠের কোষের গৌণ প্রাচীর গঠনের বিবিধ নমুনা। বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ এত পাতলা যে এর মাধ্যমে পানি ও দ্রবীভূত পদার্থ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

banglainternet.com

অধিকাংশ উদ্ভিদকোষ পানি এবং দ্রবীভূত পদার্থ পরিবহণ করে এবং উদ্ভিদকে দৃঢ় থাকায় সাহায্য করে। কাজেই কোষের মৃত্যুর পরেও এর পুরু প্রাচীর স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন থাকে। এই বিচ্ছিন্ন পথে কোষসমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা বিবিধ প্রকারে সংঘটিত হয়। চিত্র নং ৩.৪–এ গৌণ প্রাচীরকে বলয়াকার, প্যাঁচানো ফিতা, সরু ও পুরু অঞ্চলরূপে দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের ফাঁক উদ্ভিদকে নমনীয় ও দৃঢ় হতে সাহায্য করে ও সহজ পরিবহণে সহায়তা দেয়।

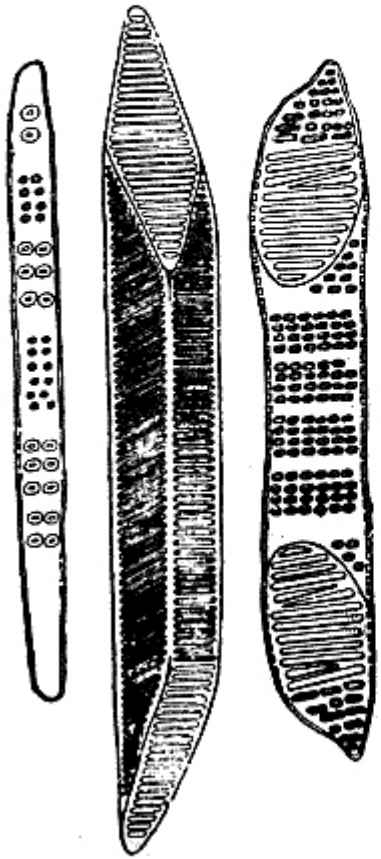

চিত্র ৩.৫ ঃ উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষসমূহের জাইলেমের পানি-সঞ্চালনকারী কোষ। কোষসমূহের পার্শ্বে নীচের প্রাচীরে গর্তসমূহের অবস্থানও দেখা যাচ্ছে। চিত্রের তিনটি কোষ sequoia (বাম) brackfern (মধ্যে) ও alder (ডানে) বৃক্ষের।

অন্যান্য কোষে নির্দিষ্ট অঞ্চল ছিদ্রময় থাকতে পারে অথবা একটি কোষের শেষাংশ ছিদ্রাল বা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে। ফলে, এভাবে সাজানো পরপর কোষগুলি একটি থামের আকার নেয়। অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলযুক্ত হয়ে একটি খাতের সৃষ্টি হয়।

প্রাণিকোষের আন্তঃকৌষিক আঠালো উপাদানত প্রধানত দুটি ঃ **হায়ালুরোনিক এসিড** (hyaluronic acid) এবং **কোণ্ড্রোইটিন** (chondroitin)। দুটোকে একসাথে বলা হয় **ভিত্তি উপাদান** (ground substance)।

হায়ালুরোনিক এসিড প্রোটিনযুক্ত কিন্তু এতে সালফার থাকে না। এটি উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট জেলীসদৃশ, অকেলাসিত এবং সান্দ্র পলিস্যাকারাইড। এটি সংসক্তভাবে পানি ধরে রাখায় সমর্থ। হায়ালুরোনিক এসিড অনেকগুলি কাজ সম্পাদন করে; আঠালো পদার্থরূপে এটি কোষসমূহকে পরস্পর আবদ্ধ করে আবার সে সঙ্গে

কোষের নমনীয়তাও রক্ষা করে। দেহের সন্ধিস্থলসমূহে এই তরল পদার্থ পিচ্ছিল বা সংঘর্ষ হ্রাসকারী পদার্থরূপে সক্রিয় থাকে। সম্ভবত আঘাত সহ্য করানোয় এর ভূমিকা রয়েছে। চোখের তরল পদার্থে এই এসিড পানি ধরে রাখায় সাহায্য করে এবং এটি চোখের আকারকে নির্দিষ্ট রাখে।

হায়ালুরোনিক এসিডের সান্দ্রতা অংশত ক্যালসিয়ামের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, সী আরচিন বা সমুদ্র সজারুর (Sea-urchin) ভ্রূণকোষকে যদি ক্যালসিয়াম-মুক্ত মাধ্যমে রাখা হয় তাহলে এর একটির পর একটি কোষ কৃশ আকার ধারণ করতে থাকে। তদুপরি ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। হায়ালুরোনিক এসিডের ব্যাপারে আরে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এটি হায়ালুরোনিডেজ (hyaluronidase) নামক এনজাইম দ্বারা দ্রবীভূত হয়। এই এনজাইমকে শুক্রকোষে দেখা যায় এবং এটি কতিপয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দ্রুত উৎপাদিত হয়। ডিম্বের চতুষ্পার্শ্বে জেলীর মতো যে আবরণী থাকে, একে ভেদ করায় এনজাইমটি শুক্রাণুকে সাহায্য করে। এর সাহায্য ছাড়া শুক্রাণু ডিম্বকে নিষিক্ত করতে পারে না। ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত এই এনজাইম তৈরির ক্ষমতার অর্থ এই-ই দাঁড়ায় যে, এসব ব্যাকটেরিয়া এর সাহায্যে সাফল্যজনকভাবে টিস্যুকে আক্রমণ করতে পারে এবং প্রবেশস্থলে থেকে রোগ সংক্রমণ শুরু করে।

কোণ্ড্রোইটিন সালফেট হায়ালুরোনিক এসিডের মতো তরল জেলীসদৃশ নয়, আরো ঘন। এটিও প্রোটিনযুক্ত পলিস্যাকারাইড। এটিকে বিশেষ করে তরুণাস্থিতে পাওয়া যায়। তরুণাস্থিতে এটি আঁশরূপ উপাদান কোলাজেনের সাথে যুক্ত থাকে। তরুণাস্থিতে এই সালফেট এমন একটি ছাঁছ তৈরি করে যেখানে তরুণাস্থি গঠনকারী কোষসমূহ খাপ খাইয়ে থাকতে পারে (চিত্র ৩.৬)। কোণ্ড্রোটিনের এই বিন্যাস-প্রকরণ অঙ্গের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ সংরক্ষণে সহায়ক হয়। অঙ্গসমূহের মধ্যে কান, নাক, পাঁজরের অগ্রভাগ, নতুন হাড়, শ্বাসনল, সন্ধিস্থল প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। বস্তুত হাড় প্রথমে তরুণাস্থিরূপে গঠিত হয়। পরে আন্তঃকৌষীয় উপাদান জমে জমে একে শক্ত হাড়ে পরিণত করে। হাড় শক্ত করার এইটি একটি প্রধান প্রক্রিয়া।

বেসমেন্ট-ঝিল্লী (basement membrane) মোটামুটি অধিকতর নির্দিষ্টভাবে সংগঠিত এবং এটি একটি বিশেষ ভিত্তি উপাদান। কতিপয় অঙ্গে একে কোষ আবদ্ধ করায় এবং নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করাতে দেখা যায়। ত্বকেই একে

banglainternet.com

উল্লেখযোগ্যভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ত্বকের বহিস্ত্বকও অন্তস্ত্বকের মধ্যে এটি ঘনীভূত আন্তঃকৌষীয় উপাদানরূপে থাকে। অন্যান্য ভিত্তি উপাদানের মতো না হয়ে এটি

চিত্র ৩.৬ ঃ হাড় গঠনকারী কোষ ও এর চতুষ্পার্শ্বস্থ বহিকৌষীয় উপাদানসমূহের মাইক্রোগ্রাফ।

A. হাড়ের কোষ ; এর কেন্দ্রস্থলে বড় একটি নিউক্লিয়াস এবং এতে পূর্ণ বিকশিত অন্ত-প্লাজমীয়-জালি দেখা যাচ্ছে।

B. কোলাজেন আঁশ

C. কোলাজেন আঁশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবস্থান। এসব পরস্পর ৬৪০ Å (এঙ্গস্ট্রম) দূরত্বে অবস্থান করে।

D. কোলাজেন আঁশ চূর্ণরহিত (decalcify) হতে শুরু করেছে। এতে হাড়ের স্বতন্ত্র apatite স্ফটিকসমূহ জমা হয়ে কালো রূপ ধারণ করেছে।

(সৌজন্য, Dr. Melvin Glimcher)

অধিকতর স্তরবিশিষ্ট হয়। উভচর প্রাণীর ত্বক-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ (চিত্র ৩.৭) এই ত্বকে বিশ বা এরও বেশী স্তর থাকে। এসব স্তরের উপর নীচে আঁশসমূহ লম্বভাবে অবস্থান করে। আঁশের এরূপ বিন্যাস ত্বককে স্থিতিস্থাপক ও মজবুত করে।

কোলাজেন, ইলাস্টিন ও রেটিকুলিন প্রভৃতি আঁশসদৃশ উপাদান ভিত্তি-উপাদানের মধ্যে থাকে। মূলত সবগুলি উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট প্রোটিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক-তৃতীয়াংশ প্রোটিন কোলাজেন বলে ধারণা করা হয়। এসব সে

banglainternet.com

সমস্ত অঙ্গে অবস্থিত যেখানে দার্ঢ্যতা অপরিহার্য (যথা, পেশী, হাড়, ত্বক ও টেণ্ডন বা রগ)। কোলাজেন তরল এসিডে দ্রুত দ্রবীভূত হয়। অনুকূল পরিবেশে দ্রবণস্থিত কোলাজেন স্বতস্ফূর্তভাবে পুনর্যোজিত হতে পারে। কোষের বাইরে ভিত্তি উপাদানে এভাবেই এরা জমায়েত হয় বলে ধারণা করা হয়।

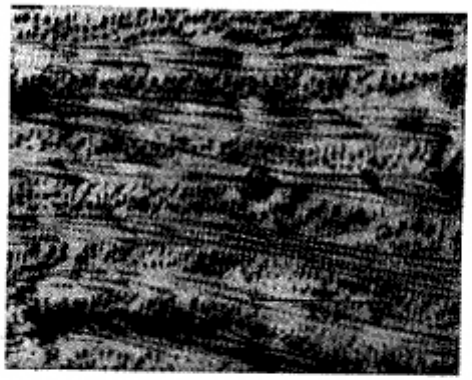

চিত্র ৩.৭ ঃ উভচর প্রাণীর ত্বকে বেসমেন্ট-ঝিল্লী ও এর স্তরীভূত রূপ।
একান্তর অবস্থিত স্তরসমূহ পরস্পর কোলাজেন আঁশ দ্বারা গঠিত। কোলাজেন আঁশ এখানে লম্বভাবে অবস্থান করে। (সৌজন্য, Dr. P. Weiss)

ইলাস্টিন ও রেটিকুলিন, কোলাজেনের ন্যায় নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট হয় না। ইলাস্টিন রজ্জুর মতো প্রোটিন। এটি রাবারের চেয়ে অধিক সংকোচনক্ষম ও প্রসারণক্ষম। যে সব অঙ্গে স্থিতিস্থাপক গুণ থাকা আবশ্যক সেসব অঙ্গেই ইলাস্টিন থাকে। যেমন ত্বক ও বড় রক্তনালীর প্রাচীরের কলায় একে দেখা যায়।

কোলাজেন ও ইলাস্টিনের তুলনায় রেটিকুলিন আরো সূক্ষ্ম আঁশ। শুধু জমায়েত হবার ক্ষমতা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে এটি কোলাজেনের সমগোত্রীয়। এর আঁশসমূহ সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। একে সাধারণত ভিত্তি উপাদানে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বেসমেন্ট-ঝিল্লীতে একে অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

আন্তঃকৌষীয়-উপাদান ও কোষের বার্ধক্য

উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, ভিত্তি উপাদান ও তৎসংশ্লিষ্ট আঁশসমূহ দেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। কোষসমূহ সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতির অঙ্গ গঠন করে। বিভিন্ন অঙ্গ তন্ত্রবদ্ধ হয়ে আস্ত, ক্রিয়াশীল জীবাঙ্গ

গঠন করে। সক্রিয় জীবাঙ্গের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল এর আসঞ্জনশীলতা, মসৃণতা, দার্ঢ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা। ভিত্তি উপাদানের গুণাগুণ ও পরিমাণ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তঃকৌষীয়-উপাদানের চরিত্র পাল্টে গেলে জীবাঙ্গেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে যায়।

আপাতঃদৃষ্টিতে, বার্ধক্য-ক্রিয়া অংশত আন্তঃকৌষীয়-উপাদানের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। আমরা কতিপয় পরিবর্তনের সাথে মোটামুটি পরিচিত। যেমন দেহের সন্ধি বা গাঁট জমে যাওয়া, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হওয়া, ধমনীর প্রসারণ-সঙ্কোচনের ক্ষমতা লোপ পাওয়া এবং বাসি কাবাবের শক্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। বার্ধক্যের সাথে সম্পর্কিত ভিত্তি উপাদানের পরিবর্তনসমূহের কারণ এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে এ সময় কোলাজেন আঁশ যে পরিমাণে বাড়ে ও আঁশ যে তুলনামূলকভাবে পুরু হয় সে বিষয়ে স্পষ্ট জানা গেছে। আরো জানা গেছে ইলাস্টিন আঁশ কম অনমনীয় ও পুরু হয়। সম্ভবত ক্যালসিয়াম আয়নের বন্ধন-ক্ষমতার বৃদ্ধির কারণে ইলাস্টিন আঁশের এমতাবস্থা সৃষ্টি হয়। এ সময় রেটিকুলিন আঁশও অধিকতর ভারী এবং ব্রাশের মতো হয়ে যায় বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। সক্রিয় অঙ্গসমূহের বিকাশকালে সেসব অঙ্গের সংঘটনের জন্যে আঁশসমূহ অতি প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, অঙ্গসমূহের পূর্ণ বৃদ্ধির পরও আঁশের গঠন অব্যাহত থাকে, তাহলে বার্ধক্যকে এরই প্রেক্ষিতে, অন্তত আংশিকভাবে, বিকাশের একটি পর্যায়রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও এই বিকাশ জীবাঙ্গের চূড়ান্ত প্রয়োজনকে অতিক্রম করেই ঘটে। আর এরও উদ্দেশ্য, জীবাঙ্গের কর্মপ্রবাহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা। কোষ আসঞ্জনশীলতা ও সংরক্ষণশীলতার মাধ্যমে বহুকোষী দশা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সে সঙ্গে জীবের জীবন-চক্রে বার্ধক্য অপরিহার্য শর্তরূপে আরোপিত হয়। প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি নির্দিষ্ট বা সীমিত মানের হয়ে থাকে। এককোষী জীবসমূহ কার্যত অমর। তুলনামূলকভাবে উদ্ভিদের দীর্ঘ জীবন, কোষের সংরক্ষণশীলতার ফল নয়। পুরনো কোষ বাতিল এবং অবিরাম নতুন কোষ উৎপাদনের মাধ্যমে এরা দীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকে। বাতিল পুরনো কোষসমূহ কাঠ, বাকল ও মরা পাতায় পরিণত হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের তফাৎটা এখানে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে যা প্রাণীতে সম্ভব নয়।

banglainternet.com

চতুর্থ অধ্যায়

কোষ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

ইচ্ছে করলে আপনি আপনার অঙ্গসমূহের একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। দৈনিক খবরের কাগজ বা কোন সাময়িকী পড়েও যদি আপনি জীববিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন তাতেও আপনার তালিকা বেশ মূল্যবান হবে। তালিকায় পেশী, স্নায়ু, ত্বক, চোখ ও হাড় প্রভৃতি থেকে অবশ্যই সব কিছু স্থান পাবে। উদ্ভিদজগৎ থেকেও কিছু উদাহরণ এতে যুক্ত হলে আরো ভালো হয়। যেমন গোলাপের কাঁটা, বায়ু-তাড়িত তুলাবীজ, বালসা গাছের নরম কাণ্ড, ওক গাছের শক্ত কাঠ এবং পাইন গাছের চিরল পাতা প্রভৃতি তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করতে পারে।

তালিকাভুক্ত অঙ্গসমূহ স্পষ্টত বিভিন্ন রকমের ও আকারের। বাইরের আকার ও কাজের বিচারে এদের মধ্যে সামান্য মিলও নেই। কিন্তু সবগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সবগুলি কোষদ্বারা গঠিত এবং অথবা কোষজাত পদার্থ দ্বারা গঠিত। একইভাবে বলা যায় এসব অঙ্গের নানান বৈশিষ্ট্য, বিবিধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কোষ ও কোষজাত উপাদানেরই অবদান। উপরন্তু এসব অঙ্গবাহী প্রতিটি জীব একটিমাত্র নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে উদ্ভূত হয়। আবার এই জীবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের সময় কোষসমূহ বিবিধ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। কোষ একটি বিস্ময়কর পরিবর্তনশীল একক এবং জীবদেহের পূর্ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কোষও যে পরিবর্তিত রূপ ধারণে সক্ষম এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিদারুণভাবে কম। কোষ-গবেষণার জগৎটি বিশাল। কোন ভাস্কর বা প্রকৌশলীর অত বড় গবেষণার ক্ষেত্র নেই।

অবশ্য, ক্ষুদ্র আকারের এই গ্রন্থে তুলনামূলক কোষবিদ্যার অসংখ্য কৌতূহল-উদ্দীপক সমস্যা নিয়ে আলাচনা সম্ভব নয়। তবু আমরা সংক্ষেপে কোষের আকৃতি, আকার ও শক্তি-বিষয়ক সাধারণ সমস্যার আলোচনা উপস্থাপন করব। তারপর তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কিছু সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের কোষকে পরীক্ষা করে দেখব। এর উদ্দেশ্য হলো, কোষের অভ্যন্তরীণ গঠন ও কার্যাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা।

banglainternet.com

কোষের আকৃতি

প্রথমে এককোষী জীবের কথা আলোচনা করা যাক (চিত্র ৪.১)। স্মর্তব্য যে, সাইটোপ্লাজম একটি সান্দ্র পদার্থ এবং এটি অর্ধ-স্থিতিস্থাপক বহিঃঝিল্লী দ্বারা আবৃত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে স্ব-নির্ভর এসব কোষ গোলাকৃতির হবে মনে করতে পারি। পৃষ্টটানের (surface tension) কারণে এরকমটি হওয়াই সমীচীন, যেমন করে বাতাস-ভর্তি সাবানের বুদ্‌বুদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বিশেষত মুক্ত ভাসমান কোষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অধিকতর প্রযোজ্য।

চিত্র ৪.১ : এককোষী জীবসমূহের কোষাকৃতির উদাহরণ।

বস্তুত অনেক কোষেরই আকৃতি গোল। বহু সামুদ্রিক প্রাণীর ডিম, বহু ইস্ট ও ব্যাকটেরিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের এককোষী শৈবালের কোষ ছাড়াও অন্যান্য অনেক কোষের আকৃতি গোল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কোষের নানা আকৃতি দেখে মনে হয় যে কোষ সহজাত ও উত্তরাধিকার সূত্রে আকৃতি অর্জন করে। এখানে পৃষ্টটান বা

বাইরের অন্য শক্তি প্রাধান্য পায় না। কতিপয় ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি রড-সদৃশ, প্যাঁচালো বা কমার মতো। শৈবালের মধ্যে ডায়াটম, ডেসমিড ও ডিনো-ফ্লাজেল্যাট এবং এসবের অস্বাভাবিক অবয়ব ও বহির্কংকাল দেখতে একেবারে উদ্ভট (চিত্র ৪.১)। এমনকি অতি পরিচিত এমিবাও স্বাভাবিকভাবে গোলাকৃতির নয়। এমিবা উপরিতলের উপর ভর দিয়ে অবস্থান করে বলেই একে চ্যাপ্টা দেখায়। এমিবার নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। বরং একে প্রোটোপ্লাজমের তরল বস্তুপিণ্ড বলা যায়। তরল পদার্থ যখন তখন এদিক-সেদিক প্রবাহিত হতে পারে। বিশ্রামের সময় বা মরে গেলে এমিবা গোলাকৃতির হয়ে যায়।

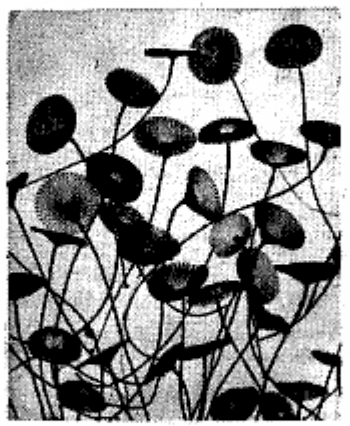

চিত্র ৪.২ : সবুজ শৈবাল এসেট্যাবুল্যারিয়া। উষ্ণ সামুদ্রিক জলেই এর জন্ম। প্রজননকালের আগে পর্যন্ত এককোষী থাকে। প্রজননকালে ক্যাপটি বিভাজিত হয়ে জননকোষে পরিণত হয়।

(Copyright, General Biological Supply House, Inc, Chicago).

এককোষী জীবের মধ্যে এসেট্যাবুল্যারিয়া (Acetabularia) একটি উল্লেখযোগ্য জীব। এই শৈবালটি উষ্ণ সামুদ্রিক জলের বাসিন্দা (চিত্র ৪.২)। এদের কোন কোনটি উচ্চতায় ৯-১০ সেমিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর সমগ্র দেহের শীর্ষদেশে থাকে একটি ক্যাপ বা টুপী। এই ক্যাপটিই এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। তবু এটি ফল দেবার পূর্ব পর্যায় পর্যন্ত একটিমাত্র কোষরূপেই থাকে। এর কাণ্ডের বা দণ্ডের গোড়ায় স্থিত মূলরূপ (rhizoid) অঙ্গের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে।

banglainternet.com

বহুকোষী জীবের কোষের আকৃতি বিচারে যখন আমরা প্রবৃত্ত হই, তখন এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। সিদ্ধান্তটি হলো, চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের সাথে কোষের বিক্রিয়ার উপর এর আকৃতি নির্ভরশীল। প্রাণীর কোষকে কালচার বা আবাদ করলে, কোষ যে আচরণ প্রদর্শন করে তা পরীক্ষা করে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায়। ৪.৩ নং চিত্রে তরল রক্তরসে পাঁচটি ভিন্ন প্রকারের সংযোজী কলার কোষকে দেখা যাচ্ছে। আপেক্ষিক অর্থে এই কোষসমূহ মুক্ত এবং যে-কোন সময় এরা যে আকৃতি ধারণ করে তা প্লাজমা-ঝিল্লীর

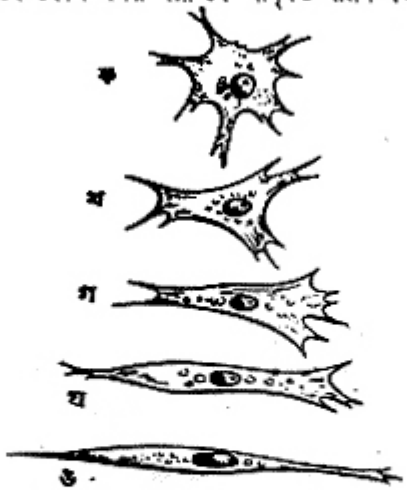

চিত্র ৪.৩ : জমাট রক্তরসের মধ্যে সংযোজী কলার কোষে কালচার বা আবাদ ; কোষ-ঝিল্লীর উদ্‌গত অংশের সংখ্যার সাথে কোষের আকৃতি সম্পর্কিত। উদ্‌গত অংশসমূহ কোষের উপরিতলে বিদ্যমান। একেবারে এক প্রান্তে উদ্‌গত অংশের সংখ্যাধিক্য ঘটলে কোষ তারার আকৃতি ধারণ করে (ক) এবং সংখ্যাল্পতা ঘটলে কোষ দ্বি-অক্ষবিশিষ্ট আকৃতি নিতে থাকে (ঙ)। (সৌজন্য, Dr. P. Weiss, and reprinted from Oncley et al. Biophysical Sciences -- A study Program, Wiley, 1960)।

সম্প্রসারণ সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। ঝিল্লীর সম্প্রসারিত অংশগুলিকে গ্লাস স্লাইডে লেগে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। ধীর কালক্ষেপক চলচ্চিত্রে একটি জীবন্ত কোষের বহিরাবরণীকে অবিরাম সক্রিয় দেখা যায়। কোষের ঝিল্লীকেও অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ঝিল্লীর সম্প্রসারণ কম সংখ্যক হলে কোষটিকে তখন লম্বাটে দেখায়। আর বেশী হলে কোষ তারার আকার পায়। তারার সুচালো অগ্রভাগ তখন বেরিয়ে থাকে। অবশ্য

banglainternet.com

রক্তরস যদি ঘন হয় বা কালচার মাধ্যম যদি অধিকতর এসিডযুক্ত হয়, তাহলে কোষের আকৃতি তারার মতো না হয়ে ক্রমশ দ্বি-অক্ষবিশিষ্ট আকৃতি ধারণ করে (চিত্র ৪.৪)। কারণ, রক্তরসে যে সব প্রোটিন-আঁশের সন্ধান মিলে সেসব, এ ধরনের পরিবেশে, পুরু হয়ে যায় ও সংখ্যায় বাড়ে। আঁশ কোষের মুক্ত জীবনকে ব্যাহত করে এবং এর আকৃতিকে এমনভাবে ঘুরাতে চায়, যাতে কোষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে। এই টানাপোড়েনের কারণে কোষ লম্বাকৃতি ধারণ করে।

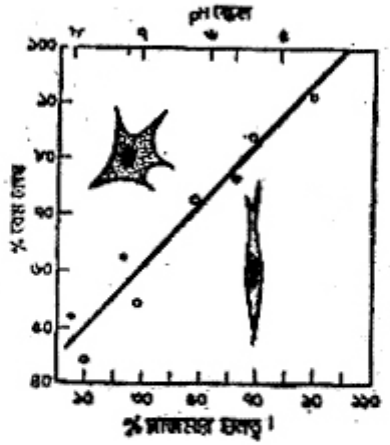

চিত্র ৪.৪ : ঘন রক্তরস বা আঁশের (কালোবৃত্ত) এবং অম্লত্বের (pH) পরিমাপের (সাদাবৃত্ত) সাথে কোষের আকৃতি যে সম্পর্কিত, চিত্রে এরই নক্‌শা দেখানো হয়েছে।

(সৌজন্য, Dr. P. Weiss, Oncley et al. Biophysical Sciences -- A Study Program, Wiley, 1960)

সুতরাং, সুসংগঠিত কলায়, কোষের আকৃতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয় দুটির একটি হল কোষসমূহের পারস্পরিক সহাবস্থান এবং অপরটি কোষের উপর চাপানো টান (tension)। প্রায় গোলাকৃতির কোষসমূহ যখন এক জায়গায় জড়ো হয় তখন প্রতিবেশী কোষসমূহের মধ্যে পলকাটা আকৃতি নেবার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ হল, পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট চাপ। বিষয়টিকে সাবানের বুদ্বুদের উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। অনেকগুলি বুদ্বুদ স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট পাত্রে জমা হলে সেসবকে চ্যাপ্টা দেখায়। কোষ জমায়েত হলেও অনুরূপ ঘটে। প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণিত বিষয়টি স্পষ্ট ধরা পড়ে (চিত্র ৪.৫)। স্বল্প

banglainternet.com

সময়ের জন্যে এসব ভ্রূণকোষ গোলাকৃতিসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ কোষসমূহ ডিম্বের গোলাকৃতিটিকে তখনও অক্ষত রাখে। কিন্তু পরে নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে স্থান সঙ্কুলানের খাতিরে কোষসমূহকে চিত্রানুযায়ী আকৃতি ধারণ করতে হয়। উদ্ভিদকোষও অনুরূপ বিন্যাস দেখা যায়। মূল বা শাখার শীর্ষভাগ, গোলআলু বা বেরি গাছের কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

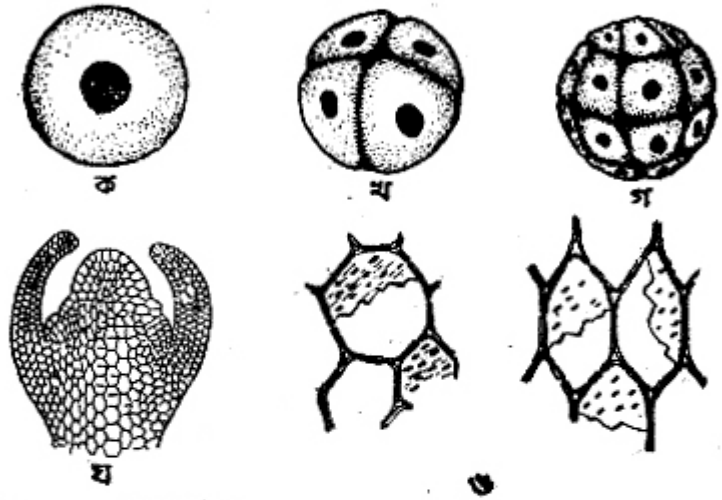

চিত্র ৪.৫ : একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে কোষসমূহকে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকতে হলে কোষের আকৃতিও তদনুরূপ হয়ে থাকে।

ক. শামুকের একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু।

খ. চার কোষবিশিষ্ট শামুক ভ্রূণ।

গ. ১৬ কোষবিশিষ্ট শামুক ভ্রূণ। পরিধি ক ও খ-এর সমান।

ঘ. উদ্ভিদের বৃদ্ধিমান শীর্ষদেশ।

ঙ. Elderberry গাছের অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদে (ডান) ও তির্যকচ্ছেদে (বাম) পিথের (pith) কোষ। এতে কোষপ্রাচীরে রন্ধ্র বা গর্ত দেখা যায়।

অবশ্য, কোষসমূহ সবসময় এভাবে জড়ো হয় না। কতিপয় কোষ চ্যাপ্টা হয়ে স্তরবদ্ধ হয়। যেমন ত্বক ও রক্তনালী-গাত্রের কোষ। এক্ষেত্রে কোষস্তরসমূহ পুরু হবার বদলে প্রসারিত হয়ে থাকে। প্রসারণ-বল-বিদ্যার সূত্রানুসারে এরকমটি হওয়াই স্বাভাবিক। পেশী ও হাড় লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট। শরীরের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির অনুকূলে এদের আকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। হাড় ও পেশীর কোষ সরু এসব কোষ হাড় ও পেশীর দীর্ঘ অক্ষ বরাবর সমান্তরাল অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে।

কোষের আকৃতি গঠনে যান্ত্রিক বলের (mechanical force) ভূমিকাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া ভুল হবে। কারণ, কোষের কাজ ও আকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি অবশ্যই থাকতে হবে। ৪.৬ নং চিত্রে চার ধরনের প্রাণিকোষ দেখা যাচ্ছে। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকাকে সরাসরি দেখলে গোলাকৃতির দেখায়, কিন্তু তির্যকচ্ছেদে দেখায় চ্যাপ্টা ও অবতল। লোহিত কণিকার কাজ হলো, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে কলাসমূহে চালান দেওয়া এবং আবার কলা থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে ফুসফুসে পৌঁছে দেওয়া। এর পাতলা গড়ন দ্রুত গ্যাস আদান-প্রদানের সহায়ক কিন্তু গোলাকৃতির গড়ন একে এমন কি সূক্ষ্ম কৈশিকনালীতেও গড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে শুধু গোলাকৃতির হলে কোষটি কোন কাজের হত না। কারণ, কোষের আকারের অনুপাতে এর কেন্দ্র ও বাইরের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান হত খুব শিথিল গতিতে।

চিত্র ৪.৬ : বিবিধ আকৃতির প্রাণিকোষ।

ক. একন (দীর্ঘ শাখা) এবং ডেণ্ড্রাইট (সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র শাখা) সহ স্নায়ুকোষ। একন শোয়ান কোষ দ্বারা আবৃত (চিত্র ২.৬ দেখুন)।

খ. রেখাযুক্ত পেশীকোষ।

গ. মসৃণ পেশীকোষ।

ঘ. মানবদেহের লোহিত কণিকা ও লোহিত কণিকার তির্যকচ্ছেদ।

ঙ. রঞ্জক পদার্থসহ রঞ্জককোষ বা মেলানোসাইট এবং মোদানোসাইটের সংকুচিত ও প্রসারিত রূপ।

৪.৬ নং চিত্রে তিনটি লম্বা কোষ দেখা যাচ্ছে। কোষ তিনটির দুটি পেশীর ও অপরটি স্নায়ুর। সক্রিয় পেশীতে পেশী-কোষ সংকোচনশীল থাকে অথচ শেষোক্ত কোষের ব্যাপারই আলাদা। মানুষের দেহে স্নায়ুকোষ তিনফুট দীর্ঘ হতে পারে।

banglainternet.com

এটি দেহের ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অংশ, অনেকটা টেলিফোন ব্যবস্থার অনুরূপ। এই কোষ মারফত দেহের সর্বত্র চেতনা সঞ্চারিত হয়। কল্পনা করুন, স্নায়ু বা পেশীকোষ গোলাকৃতির বা চ্যাপ্টা হলে এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত কি?

৪.৬ নং চিত্রের অপর দুটি কোষের নাম মেলানোসাইট। মেলানিন শব্দ থেকে এর নাম মেলানোসাইট। মেলানিন নামক কালো রঞ্জক পদার্থই প্রাণীর ত্বকের কালো বর্ণের জন্যে দায়ী। মেলানোসাইট সম্প্রসারিত বা সংকুচিত অবস্থায় থাকতে পারে। প্রয়োজনানুগ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিতও হতে পারে। গিরগিটির শরীরে এই কোষ সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকলে গিরগিটিকে সাদা বর্ণের দেখায়। কিন্তু কোষ শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত হলে প্রাণীটিকে কালো দেখায়। সুতরাং, মেলানাসাইট শুধু দেহের বর্ণের জন্যেই দায়ী নয়। এটি প্রাণীকে আত্মরক্ষাকারী বর্ণও যুগিয়ে থাকে। ফলে প্রাণী অবস্থাভেদে দেহের বর্ণ হালকা থেকে ঘন রঙে রূপান্তরিত করতে পারে। কাজেই, কোষ কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে এর আকৃতিও পরিবর্তন করায় সক্ষম।

প্রাপ্তবয়স্ক উদ্ভিদকোষের সেলুলোজ গঠিত প্রাচীর কোষের আকৃতিকে ওধরনের স্থিতিস্থাপক হতে দেয় না। প্রাপ্তবয়স্ক কোষের আকৃতি কমবেশী স্থায়ী হয়ে যায়। কোষের গঠনকালে উদ্ভিদকোষও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পাতার উপরিতলের বহিস্ত্বকের কোষসমূহ পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা, অথচ পাশাপাশিস্থিত কোষসমূহের চাপের দরুন গোলআলু বা বেরী কাঠের মজ্জার কোষসমূহ পলকাটা। আবার সে সব কোষ পানি ও অন্যান্য দ্রাব্য পদার্থ পরিবহণের জন্যে লম্বা আকৃতির হয়। যেহেতু মূল বা শাখা লম্বা হতে থাকে, সেহেতু এসব কোষও লম্বাটে হয়ে থাকে।

মোদ্দা কথা, পরিবেশ কোষের আকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে, আমাদের জানা যে, নিউক্লিয়াস আকৃতিসহ কোষের সব বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। পাইন গাছের একটি কোষ ওক গাছের একটি কোষ থেকে আলাদা। কিন্তু উভয় কোষই একই ধরনের কাজ করতে পারে এবং একই পরিবেশের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। অবশ্য, বংশগতিসূত্রে কিভাবে কোষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তা এক বিশাল জটিল সমস্যা। কোষ ধীরে ধীরে কিভাবে চূড়ান্ত আকৃতি লাভ করে, সে সম্পর্কে আসল তথ্য আমরা অপেক্ষাকৃতভাবে খুব কমই জানি।

কোষের আকার

উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ থেকে এলোপাথাড়ি কোষ সংগ্রহ করলে বিবিধ আকারের কোষের সাক্ষাৎ মিলবে। আলোক-অণুবীক্ষণযন্ত্রে ক্ষুদ্রতম কোষ যথা ব্যাকটেরিয়ার কোষকে ০.২-৫.০ μ (মাইক্রন) এবং এর চেয়েও ক্ষুদ্র কোষকে শুধু অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতার আওতায় দেখা যায়। অস্ট্রিচ পাখির ডিম্বকোষই হল সবচেয়ে বড় কোষ। এই ডিমের পরিধি ৬ ইঞ্চি এবং খোলস ছাড়ালে এর পরিধি দাঁড়ায় ৩ ইঞ্চি (৭৫ মি. মি.)। বড় ও ছোট কোষের মধ্যেকার রৈখিক আয়তনের অনুপাত ৭৫০০০ ঃ ১ এবং ঘনমানের অনুপাত ৭৫০০০^৩ ঃ ১। এই পার্থক্য এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট গোলক ও এক মাইল প্রশস্ত গোলকের মধ্যে যে রকম অনেকটা তদ্রূপ।

বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে, ক্ষুদ্রতম কোষ বা মুক্ত জীবননির্বাহী জীবেরা ব্যাকটেরিয়া নয়। এই জীব এতই ক্ষুদ্র যে একে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া কখনো "দেখা" সম্ভব ছিল না। লুই পাস্তর প্রথমে এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই জীব প্লিউরো-নিউমোনিয়া রোগের কারণ। রোগটি গো-বাছুরের সংক্রামক রোগ। জীবটি এতই ক্ষুদ্র ছিল যে পাস্তর একে পৃথক করতে, আবাদ বা কালচার করতে পারেননি, এমনকি অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচেও দেখতে পাননি। এই জীবেরা বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে। এ সবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম জীবটি পরিধিতে ০.১μ এবং এর নাম PPLO (Pleuropneumonia like organism) বা মাইকোপ্লাজম (mycoplasm) (চিত্র ৪.৭)। আকারে এরা ভাইরাস সদৃশ এবং সূক্ষ্ম রন্ধ্রবিশিষ্ট ছাকনীর ভিতর দিয়ে এরা গলে যেতে পারে। তবে ব্যাকটেরিয়ার মতো এরা অজৈব মাধ্যমেও জন্মাতে পারে। এদের দেহের অভ্যন্তরীণ গঠনও ব্যাকটেরিয়ার অনুরূপ। প্লাজমা-ঝিল্লী, রাইবোজোম, পুরো বিপাক যন্ত্র, অদ্যাবধি জ্ঞাত ৪০টি এনজাইম এবং নিউক্লিয়-ঝিল্লীবিহীন একটি অস্বচ্ছ নিউক্লিয়াস নিয়ে মাইকোপ্লাজমের দেহ গঠিত। একই আয়তনবিশিষ্ট অন্য কোন কোষ আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে কিনা তা এখনো তর্কসাপেক্ষ।

মানুষের দেহে ক্ষুদ্র গোলকাকৃতির লিউকোসাইট (leucocyte) বা শ্বেত কণিকা থেকে শুরু করে ৩-৪ μ পরিধিবিশিষ্ট স্নায়ুকোষ পর্যন্ত রয়েছে। স্নায়ুকোষের এক্সনের দৈর্ঘ্য তিন ফুটেরও বেশী হয়ে থাকে। ইঞ্চির হিসাবে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম কোষের দৈর্ঘ্য ৩/২৫০০০ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ইঞ্চি বা অনুপাত হিসাবে ১ঃ৩০০,০০০ দাঁড়ায়। এ ধরনের তুলনামূলক বিচারে অবশ্য ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, স্নায়ুকোষের

banglainternet.com

প্রধান অংশ ক্ষুদ্র শ্বেত কণিকা থেকে খুব একটা বড় নয়। অর্থাৎ স্নায়ুকোষের প্রধান অংশ আয়তনে তাহলে দাঁড়ায় ১০০ μ। ফলে এর ভিত্তিতে উভয় কোষের আয়তনের অনুপাত ১ঃ৩০–এ গড়ায়। কিন্তু এই তুলনামূলক বিচারেও খুব একটা মানে নেই,

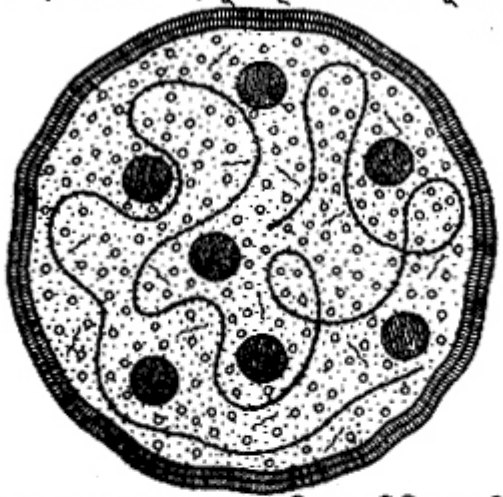

চিত্র ৪.৭ঃ PPLO–র অঙ্গসংস্থানের নক্‌শা ; এতে বহিঃপ্লাজমা ঝিল্লী, ক্রোম্যাটিন বস্তুর ভবল হেলিক্স, রাইবোজোম (বড় গোলক) ও অন্যান্য দ্রবীভূত বস্তুসমূহকে (ছোট গোলক) দেখা যাচ্ছে। এই কোষের পরিধি প্রায় ০.১μ (মাইক্রন)।

যদি না আকার নিয়ন্ত্রক অন্য বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব আরোপিত না হয়। যেমন, একটি মুরগীর ডিমের ব্যাস ৬০ × ৪৫ মি. মি.। এর পরিধি বড় হবার কারণ হল কুসুম। কুসুম এতে বিকাশশীল ভ্রূণের খাদ্যরূপে জমা থাকে। অন্যদিকে, মানুষের ডিমে খাদ্য জমা রাখার আবশ্যকতা নেই। ভ্রূণ মা'র দেহ থেকে পুষ্টি আহরণ করে থাকে। কাজেই ডিমের আকার পুষ্টির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। মানুষের ডিমের ব্যাস হলো ০.১ মি. মি.।

স্নায়ু, পেশী ও রক্তকোষের আকার এসবের নির্দিষ্ট কার্যধারার কারণে ভিন্ন ভিন্ন। একই কাজে নিয়োজিত কোষসমূহের আকার তিনটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; (১) নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত, (২) কোষের উপরিতল ও কোষের ঘনমানের অনুপাত, এবং (৩) কৌষীয় ক্রিয়াকলাপ বা বিপাক–ক্রিয়ার হার ইত্যাদি। যদিও সব হেতুগুলি পরস্পর সম্পর্কিত, তবু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এসবকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে চাই। কারণ, কোষের উপরিতলের সাথে অন্যসব কারণ জড়িত।

banglainternet.com

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে নিউক্লিয়াস কোষের নিয়ন্ত্রণ–কেন্দ্র। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের সহায়তায় দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও এর সতত অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিউক্লিয়াসের অনুপস্থিতিতে কর্মক্ষম থাকে বটে, কিন্তু শীঘ্রই এটি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় হযবরল কাজ করতে শুরু করে এবং পরে কার্যক্ষমতা হারায়। অবশ্য নিউক্লিয়াস, অনির্দিষ্ট পরিমাণের সাইটোপ্লাজমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ, কোষ বড় হতে থাকলে নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রফল (যার মধ্যে দিয়ে বস্তুর আদান–প্রদান ঘটে) ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাতে বাড়ে। গোলকের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$, অথচ কোষের আয়তন তখন বাড়ে ঘনফল হিসাবে (আয়তন = $\frac{4}{3}\pi r^3$)। উল্লেখযোগ্য, এ সময় নিউক্লিয়াসের উপরিতলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের আদান–প্রদান অবশ্যই ঘটে। সাইটোপ্লাজমের এই অসম বৃদ্ধি সম্ভবত কোষকে বিপাক ক্রিয়া থেকে নিরস্ত করে। নিউক্লিয়াসের আয়তনের বৃদ্ধি, এর আকৃতি বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব। অথবা নিউক্লিয়াসের আয়তন দ্বিগুণ করা এরই মূল উপাদান ক্রোমোজোম সংখ্যাকে দ্বিগুণিত করেই সম্ভব। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক কোষ তুলনামূলকভাবে একটি স্থায়ী নিউক্লিয়াস–প্রোটোপ্লাজম অনুপাত রক্ষা করে চলে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বৃহত্তম মানের নীচে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনুপাত বজায় রাখার জন্যে বৃদ্ধিরত কোষসমূহ বিভাজিত হয়।

কোষের উপরিতলের পরিমাণও কোষের আকার নির্ধারণে ভূমিকা নেয়। কোষের সমুদয় বস্তুপিণ্ড অবিরাম বিপাকক্রিয়ায় রত থাকে বটে, কিন্তু বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু সকলের আদান–প্রদান কেবল কোষের উপরিতলের ঝিল্লী মারফতই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অক্সিজেনের কথা ধরা যায়। বস্তুত অক্সিজেন সব কোষের জন্য অপরিহার্য। কোষের কেন্দ্রস্থলে যদি প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কোষের বাইরে চতুষ্পার্শ্বে অক্সিজেনের ঘনীভবন একটি ক্রান্তিমানের (critical value) বা তারও উপরে সংঘটিত হতে হয়। প্রতি একক পরিমাণ প্রোটোপ্লাজম কি পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহারে সক্ষম, কত সহজে অক্সিজেন কোষে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং কোষের আয়তন কত, তা থেকে উল্লিখিত ক্রান্তিমান নির্ণয় করা যায়। এ সবের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটি সমীকরণের আশ্রয় নেওয়া যায়। অক্সিজেনের ব্যবহারের হার এবং এর ব্যাপন (diffusion) সরল অনুপাতে এবং কোষের আকার বা ক্ষেত্রফল বর্গের হিসাবে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং কোষের ব্যাসার্ধ যদি

banglainternet.com

দ্বিগুণ হয়, তবে কোষের ক্ষেত্রফল হবে এর বর্গ পরিমাণ। ফলে, শতকরা ২০% অক্সিজেনবিশিষ্ট বাতাসকে ০.১ মি. মি. ব্যাসবিশিষ্ট কোষের কেন্দ্রে স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্যে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করার প্রয়োজন যদি পড়ে তাহলে সে স্থলে একই পরিমাণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করা দরকার হবে ০.১৩ মি. মি. ব্যাসবিশিষ্ট কোষে। সুতরাং একটি কোষের ব্যাস $\sqrt{৫}$ বা ২.৩ ভাগ বর্ধিত হলে এর উপরিতলকে ৫ গুণ বেশী অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়।

যেহেতু কোষের উপরিতলের ক্ষেত্রফল কোষের ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাতে এবং কোষের আয়তন ব্যাসার্ধের ঘনমানের অনুপাতে বর্ধিত হয়, সেহেতু কোষের বিপাকক্রিয়ার জন্যে আবশ্যকীয় উপাদান সরবরাহ উপরিতলের ক্ষমতার উপরে কোষের আয়তন নির্ভরশীল। কোষের আয়তন খুব বেশী হলে কোষের কেন্দ্র যথাযথ কার্যক্ষম হয় না। এ বাধা উত্তরণ করা সম্ভব হয় বিবিধ উপায়ে। কোষ গোলাকৃতির পরিবর্তে চ্যাপ্টা, ভাঁজবিশিষ্ট ও লম্বাকৃতির হতে পারে। এতে কোষের আয়তন না বাড়িয়েও উপরিতলের ক্ষেত্রফল বাড়ানো যায় (চিত্র ২.৫)। কোষের মধ্যে উপাদানসমূহের আদান-প্রদানও একইভাবে বাড়ানো যেতে পারে। বিপাক-ক্রিয়ার হারে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেও কোষকে বড় আয়তনবিশিষ্ট করা যায়, যে পর্যন্ত না এই সম্প্রসারণ নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাতে বড় রকমের ব্যাঘাত ঘটায়।

আমরা উপরিতলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম যদিও প্লাজমা-ঝিল্লী এক্ষেত্রে একটি সামান্য প্রতিবন্ধক ছিল। ব্যাপনের সাধারণ সূত্রানুসারে ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে উপাদানসমূহ প্রবেশ করে। গ্যাস, যেমন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য সঠিক। অন্য সব উপাদানের ক্ষেত্রে প্লাজমা-ঝিল্লী "পাম্পের" মতো কাজ করে। শেষোক্ত উপাদানসমূহের কোষে প্রবিষ্ট হওয়া সেসবের ঘনীভবনের হারের উপর নির্ভরশীল। যেমন, কোষের মধ্যে পটাশিয়াম ঘনীভূত হতে পারে যদি কোষের বাইরে এর ঘনীভবনের হার কম থাকে অথচ একইসাথে সোডিয়াম বহির্কোষীয় স্পেস-এ চলে যায় যেখানে সোডিয়ামের ঘনীভবনের মাত্রা বেশী। প্লাজমা-ঝিল্লী এই প্রক্রিয়া সম্পাদনে বেশ সক্রিয়। প্লাজমাস্থিত এনজাইম এই পরিবহণ প্রক্রিয়ার সহায়ক। প্লাজমা ATP থেকে কাজের শক্তি আহরণ করে।

উপরিতল আয়তন বিষয়ক তর্ক কোষের ক্ষেত্রে বার বার এসেছে এবং জীবদেহে এর সমাধানও পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্নায়ুকোষ এক গজ

লম্বা হতে পারে কিন্তু এর প্রধান লোব বা অংশবিশেষ বড় নয় এবং এর এক্সন ও ডেণ্ড্রাইট এত সূক্ষ্ম যে এসবের উপরিতলে উপাদানসমূহের যাতায়াতে কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। কারণ, যে সব কোষ আয়তনে বড় হতে পারে না, সে সবের ক্ষেত্রে কোষসমূহের সংখ্যাধিক্য ঘটলেই সমস্যা চুকে যায়। একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে দেহের একটি অঙ্গ (একটিমাত্র কোষের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) বিভিন্ন আকৃতিতে গঠিত হতে পারে। যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীটি দীর্ঘ ও প্যাঁচালো। নালীর অভ্যন্তরভাগের শোষণ-গাত্র অনেকগুলি ভাঁজবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ভাঁজসমূহ গঠিত হয় স্তম্ভাকৃতির কোষ দ্বারা। নালীর ভিতরের চেহারা অনেকটা তোয়ালের ঝালরের মত (চিত্র ২.৫)। ফলে নালীর অভ্যন্তরভাগের গাত্রের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নালীর শোষণক্ষেত্র বাড়ে। ফুসফুসের অভ্যন্তরভাগের গঠন-প্রকৃতিও এমনি যেখানে অনায়াসে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দ্রুত আদান-প্রদান ঘটতে পারে। ফুসফুসের প্রতিটি কোষ এক পাশে রক্তনালী ও অপর পাশে বায়ুর সংস্পর্শ থাকে।

উপরিতল-আয়তন সমস্যা প্রাণিকোষ যেভাবে চুকে যায়, উদ্ভিদকোষে সেভাবে চুকে যায় না। এখানে ভিন্ন পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান ঘটে। উদ্ভিদকোষের অনমনীয় কোষপ্রাচীর এর আকৃতিতে বড় রকমের পরিবর্তনে আগেভাগেই বাধার সৃষ্টি করে। ফলে কোষের আয়তনের বৃদ্ধি না হয়ে উপরিতলের বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য, উল্লিখিত সমস্যা নিরসনের জন্যে এমতাবস্থায় কোষের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটে। উদ্ভিদকোষের বড় কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওলই হল এর বৈশিষ্ট্য। ভ্যাকুওল সাইটোপ্লাজমকে ঠেলে কোষপ্রাচীর সংলগ্ন পাতলা স্তরে পরিণত করে। ফলে, সাইটোপ্লাজম পুষ্টিদ্রব্য ও গ্যাস দ্রুত আদান-প্রদানে সমর্থ হয়।

কোষের অভ্যন্তরভাগের ক্রিয়া-কলাপের হার কোষের আকারের জন্যে তৃতীয় কারণ। যদিও কোষের আকার এর বিপাক-ক্রিয়ার হারের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কিত নয় তবু বিপাক-ক্রিয়ার হারের প্রভাব এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। যেমন, ব্যাকটেরিয়া, হামিংবার্ড, শ্রু, মৌমাছি, মাছি ও মশার কোষসমূহের বিপাকক্রিয়ার হার, মানুষ, হাতি, কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, ঘাস ফড়িং প্রভৃতির কোষসমূহের কোষের বিপাকক্রিয়ার হারের তুলনায় বেশী। খুব কর্মঠ প্রাণীসমূহের ক্ষুদ্র কোষের উপরিতলে গ্যাসের আদান-প্রদান অবশ্যই দ্রুত হতে হয়। ফলে কোষসমূহকে আকারে ছোট হতে হয় এবং এসবকে আয়তনের তুলনায় অধিকতর উপরিতলের

banglainternet.com banglainternet.com

অধিকারী হতে হয়। নইলে বিপাক-ক্রিয়ার হার অনেক কমে যায়। হাতি ও হামিংবার্ডে বিপাক-ক্রিয়ার হার যদি সমানুপাতে হয় তাহলে হাতি পুড়ে রোস্টে পরিণত হবে। কারণ হাতির দেহে অত্যধিক দ্রুত বিপাক-ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট তাপ বিকিরিত হবার সুযোগ পাবে না। একই ব্যাপার ঘটবে মানুষের ডিম্ব যদি একই হারে ব্যাকটেরিয়ার মতো বিপাকক্রিয়া চালায়।

কোষের গঠন কৌশলের সমস্যাকে সামনে রেখেও কোষের আকারের বিষয় বিবেচনা করতে হয়। প্রোটোপ্লাজম একটি সান্দ্র পদার্থ। প্রোটোপ্লাজমকে যথাকর্তব্য করতে ও এর উপাদানসমূহকে একত্রে রাখার প্রয়োজনে কোন ধরনের সহায়ক শক্তির সহায়তা আবশ্যক। ১০০ এঙ্গস্ট্রম পুরু ঝিল্লীর ভেতর প্রোটোপ্লাজমের এককসমূহ আবদ্ধ থাকে। এই পুরু ঝিল্লী কোষের পরিসীমাকে নমনীয় রাখে বটে কিন্তু দৃঢ়ও রাখে। যেহেতু ক্ষুদ্রায়তনের কোষসমূহ এই ঝিল্লীকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম, কিন্তু অতি বড় আয়তনের কোষসমূহ আবার এর আভ্যন্তরিক চাপে বেলুনের মতো ফেটে যাবে, সেহেতু, সহায়ক শক্তি এবং উপরিতল-আয়তনের যথাযথ অনুপাত রক্ষার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

কোষের সর্বাপেক্ষা অনুকূল আকার তাহলে কোন্‌টি? স্বাভাবিকভাবে এর সহজ উত্তর নেই। কোষের কার্যধারার সাথে এর আকার সম্পর্কিত। আবার কার্যধারা বিপাকক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও বিপাকক্রিয়ার হারের সাথে সম্পর্কিত। ৪.৮ নং চিত্রে নির্দিষ্ট আকারের বিভিন্ন কোষকে দেখানো হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাস এবং হিমোগ্লোবিন অণুকে তুলনামূলক বিচারের জন্যে চিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু প্রতিটি কোষের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেহেতু আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে প্রতিটি কোষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ। আমাদের বিবেচনা থেকে ডিম্বকে যদি বাদ দেই, — (কুসুমসহ ডিম্বগুলি বাস্তবিকই একটি পর্যায়ভুক্ত হবে) — আমরা দেখি যে কতিপয় কোষের ব্যাস ১০০ μ ছাড়িয়ে যায় (এসেট্যাবুল্যারিয়া একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম), অথচ কোষের ক্ষুদ্রতম ব্যাস হল ০.১ μ। ফলে, এ ক্ষেত্রে অনুপাত দাঁড়ায় ১০০০ ঃ ১। (আমরা এই হিসাব থেকে ভাইরাসকেও বাদ দিয়েছি। কারণ, এদেরকে কোষ বলে মেনে নেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ভাইরাস যে জীবের উপর আশ্রয় নেয়, স্বীয় বিপাকক্রিয়ার জন্যে সেই আশ্রয়দাতার শরীর থেকে শক্তি শুষে নেয়।) আমাদের অনুমান যদি এ সময় অনিশ্চিতির মুখোমুখি হয়, তাহলে আমরা অন্তত বলতে পারব যে কোষের সর্বাধিক বড় আকার সম্ভবত দুটি কারণে সীমিত

থাকে। কারণ দুটির একটি হল গঠনগত বিষয় ও অপরটি কোষে উপাদান ও শক্তির সুষ্ঠু প্রবাহ রক্ষার আবশ্যকতা। অবশ্য ন্যূনতম আকারের কোষেরও এমন সীমা থাকতে হবে যাতে এর মধ্যে জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম উপাদানগুলির স্থান সংকুলান হয়। জীবনধারণের উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে DNA, RNA এবং

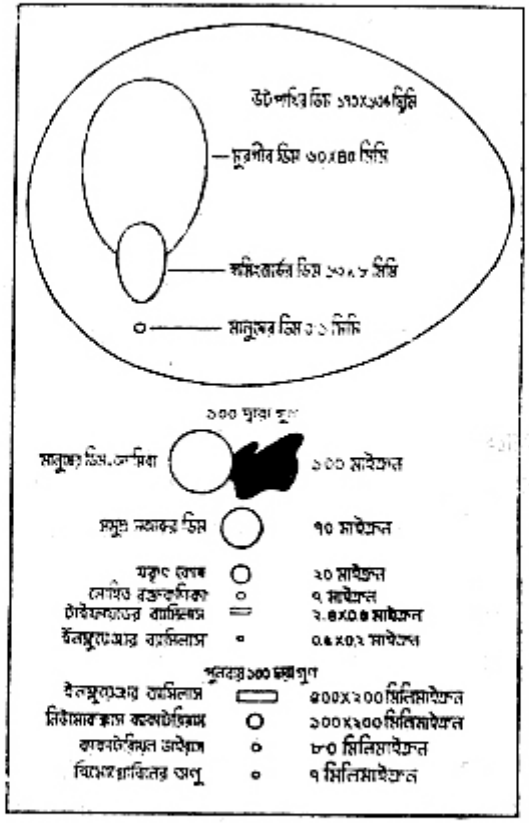

চিত্র ৪.৮ ঃ বিভিন্ন ধরনের কোষকে স্কেলের পরিমাপে দেখানো হয়েছে। তুলনামূলক বিচারের সুবিধার্থে এতে ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাস থেকে শুরু করে হিমোগ্লোবিন অণুর সমাবেশ পর্যন্ত ঘটানো হয়েছে। অস্ট্রিচ ও অন্যান্য প্রাণীর ডিম্বকে প্রকৃত আকারের তুলনায় অর্ধেক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

প্রোটিন। এসব উপাদান এনজাইম নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়ার জন্যে আবশ্যক। স্পষ্টত কোষের ব্যাস ২০০ এঙ্গস্ট্রমের উপরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় প্লাজমা-ঝিল্লীর মধ্যে কোন শূন্যস্থান থাকবে না। অন্য ধারণা অনুযায়ী কোষের ব্যাস কমপক্ষে ৫০০

banglainternet.com

এলগস্ট্রম অর্থাৎ PPLO এর ব্যাসের অর্ধেক হওয়া উচিত। এই আকারের কোষের সন্ধান অবশ্য আজো মিলেনি।

তুলনামূলক কোষবিদ্যা

কোষের গঠন, আকার ও আকৃতি বিবেচনার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য ইতিপূর্বে তুলনামূলক পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি। তবে এই তুলনা ছিল পরোক্ষ, এবং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তও আমাদের নিজেদেরই নিতে হয়েছে। এখন আমরা বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে মোকাবিলা করতে চাই। মোকাবিলা করা যায় দুটি উপায়ে ঃ (১) কোনো নির্দিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণীর নির্বাচিত কোষসমূহের তুলনা করে, যেখানে দেখানো যাবে এক বা একাধিক গঠনবৈশিষ্ট্য বিকাশের ক্ষেত্রে এই কোষসমূহের বিশেষ কার্যধারা কিভাবে সম্পর্কিত। এবং (২) মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোষের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক অভ্যন্তরীণ গঠনবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্যান্য প্রাণীর কোষের তুলনা করে।

তুলনামূলক আলোচনা শুরু করার আগে, কোষসমূহ যে শক্তি রূপান্তরের হাতিয়ার এবং শক্তিলাভের উপায় ও শক্তির ব্যবহার-কৌশলের সাথে কোষের গঠনগত পার্থক্য যে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত — এই মূল বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। শক্তি সম্পর্কিত রাসায়নিক ব্যাপক বিশ্লেষণ এই সিরিজের* অন্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। এখানে সাধারণ সংজ্ঞার আলোকে শক্তি-বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করা হবে।

ইতিপূর্বে আমরা কোষকে একটি কারখানার সাথে তুলনা করেছি। আমরা এও জানি, এই কোষ-কারখানার আকৃতি ও আকার হরেক রকমের হয়ে থাকে। তদুপরি এই কারখানা সাধারণ বা বিশেষ কর্ম সম্পাদনেও সক্ষম। কোষের অভ্যন্তরভাগের গঠন-প্রকৃতি এর কর্মধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য, অধিকাংশ কোষের বেলায় শক্তি-সমস্যা মূলত একই।

৪.৯ নং চিত্রে সাধারণ কারখানায় শক্তি-প্রবাহের একটি নক্শা দেখানো হয়েছে। নক্শায় জ্বালানী ও এর থেকে সৃষ্ট শক্তি বর্ণিত আছে। তেল ও কয়লাকে সাধারণত জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এতে শক্তি রাসায়নিক বন্ধনীতে আবদ্ধ

banglainternet.com

* W. D. McElory, *Cell Physiology and Biochemistry.*

থাকে। দহনের সময় অক্সিজেনের আবশ্যক হয়। জ্বালানী পুড়ে তাপশক্তি সৃষ্টি হয়। তাপশক্তি বাষ্পের সৃষ্টি করে। বাষ্প জেনারেটরকে ঘোরায়। ফলে তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় বর্জনীয় পদার্থরূপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ তার মারফত ইলেকট্রন হিসাবে প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎশক্তি প্রধান তিনটি কাজ করে ; যান্ত্রিক কাজ বা উত্তোলন, পরিবহণ বা উপাদানসমূহকে স্থানান্তরে প্রেরণ এবং সমাবেশ বা উৎপাদন।

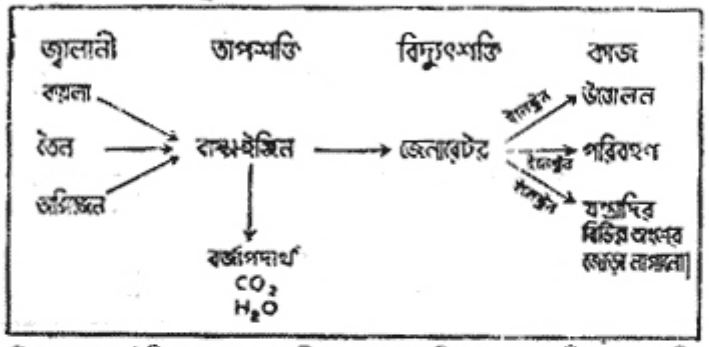

চিত্র ৪.৯ ঃ ফ্যাক্টরী বা কারখানায় শক্তি-প্রবাহের একটি নক্শা। জ্বালানীর আবদ্ধ শক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে।

ইলেকট্রন-বিদ্যুৎশক্তি যা ইলেকট্রনরূপে তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ৪.১০ নং চিত্র তুলনীয়।

কোষ মূলত নক্শায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল থাকে, যদিও এ ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। কোষ স্বকাজে তাপ ব্যবহারে সক্ষম নয়, যেহেতু এরা নীচু এবং আপেক্ষিকভাবে ধ্রুব তাপমাত্রায় কাজ করে। কোষের শক্তির মূল উৎস হল সূর্যরশ্মি। ক্লোরোপ্লাস্ট আলোক-শক্তিকে ধারণ করে এবং একে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অন্য সব শক্তি অণুর রাসায়নিক বন্ধনীতে অবস্থান করে।

৪.১০ নং চিত্রে কোষের শক্তি-চক্রের মূল পর্যায়গুলি প্রদর্শিত হয়েছে। এতে জ্বালানীরূপে আছে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন। এসব জ্বালানী অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়ে মিটোকণ্ড্রিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে পরিণত হয়। ফ্যাক্টরীর মতো এখানেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি ইত্যাদি বর্জনীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। তবে কোষে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি তাপরূপে বিকিরিত না হয়ে পুনরায় রাসায়নিক শক্তিরূপেই গঠিত হয়। আহিত শক্তিরূপে (charged form of energy) ATP অণু

banglainternet.com

কোষের অন্য অংশে শক্তির যোগান দিতে পারে এবং এর দ্বারা কোষ কাজ করতে পারে। আবার এইভাবে সম্পাদিত কাজকেও ফ্যাক্টরীর কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন, পেশীর সংকোচনকে "যান্ত্রিক কাজের" সাথে, উপাদানসমূহের স্থানান্তরকরণের (এমনকি ঝিল্লী অতিক্রম করিয়ে এবং ঘনীভবন মাত্রার বিপরীতে) সাথে "পরিবহণের" এবং অন্যান্য অণু ও কোষীয় গঠনের জৈব-সংশ্লেষের সাথে "সমাবেশের", তুলনা করা যায়। শক্তি অবশ্য এ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নমানের শক্তি ADP (adenosine diphosphate) ও অজৈব

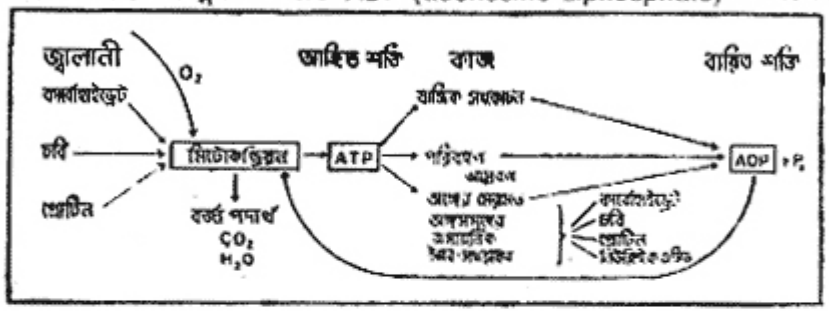

চিত্র ৪.১০ ঃ কোষের অভ্যন্তরে শক্তি প্রবাহের নক্‌শা। দাহ্য জ্বালানী চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ATP এবং ADP (+P_i) যথাক্রমে আহিত শক্তি ও ব্যয়িত শক্তি।

ফসফেট (P_i)-এ পরিণত হয়। ADP ও P_i হলো ব্যয়িত শক্তি (spent form of energy)। ব্যয়িত শক্তি পুন-আহিত (recharged) হবার জন্যে মিটোকণ্ড্রিয়ায় যায় এবং সেখানে এই শক্তি ATP-রূপে পুনর্জন্মলাভ করে। জীবন্ত কোষে এই চক্রকে অবশ্যই অবিরাম আবর্তিত হতে হবে এবং ধারণা করা হয় যে সক্রিয় কোষে ATP-র একটি অণু প্রতি ৫০ সেকেণ্ড চক্রে পুনরাবর্তিত হয়।

আমরা যে সমস্ত কোষের বিষয় বিবেচনা করতে চাই সে সবকে ৪.১০ নং চিত্রে অক্ষরের সাহায্যে চিত্রিত করা হয়েছে। এসব কোষ নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে যে সক্ষম তাও চিত্রে বিধৃত হয়েছে।

সংকোচনশীল কোষ

যান্ত্রিক কাজ বা সংকোচন দুভাবে হতে পারে : এক, হঠাৎ এবং তীব্রভাবে আর দুই, ধীর এবং অবিরামভাবে। একটি বেস বল ছোঁড়া হয় হঠাৎ কিন্তু ফুসফুসের

সম্প্রসারণ-সংকোচন হয় ধীরে। হঠাৎ, খুব তাড়াতাড়ি চোখের পাতা নড়ে, অথচ পরিপাকের সময় পাকস্থলী ও অন্ত্রের কোষের সংকোচন ঘটে খুব ধীরে। আলোচ্য দুধরনের সংকোচন-ক্রিয়া, দুধরনের কোষ দ্বারা সংঘটিত হয়।

ডোরা পেশীর (striated or striped muscle) কোষসমূহ হঠাৎ সংকোচনে সক্ষম। পেশীর অনুরূপ এসব কোষ লম্বাটে এবং এর উভয় প্রান্ত ক্রমশ সুচালো। কোষে নিউক্লিয়াসের সংখ্যাও একাধিক (চিত্র ৪.৬)। প্রতিটি কোষ দৈর্ঘ্যে ১—৪০ মিমি, প্রস্থে ১০-৪০ μ। কোষের বাইরের কিনারায় অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষের অধিক পরিমাণ সাইটোপ্লাজমের নিয়ন্ত্রণের জন্যে অধিক সংখ্যক নিউক্লিয়াসের প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রতিটি কোষ সরু ও দৃঢ় একটি ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। ঝিল্লীটির নাম সারকোলেম্যা (sarcolemma)। সাইটোপ্লাজম অভ্যন্তরভাগে মূলত অনুদৈর্ঘ্য সূত্র দ্বারা গঠিত। এর নাম পেশীসূত্র বা মাইওফিব্রিল (myofibril)। সূত্রসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে এদের পর পর সাদা-কালো অংশরূপে দেখায় (চিত্র ৪.১১)। পৃথক পৃথক ফালিকে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় এবং দুটি "Z" ফালির মধ্যেকার এক ব্লক পেশীসূত্রকে **সারকোমেয়ার** (sarcomere) বলা হয়।

সংকোচনের সময় সারকোমেয়ার খাটো ও প্রশস্ত হয়। ফলে, কোষও খাটো হয়ে পড়ে। অনেকগুলি কোষ সম্মিলিতভাবে স্নায়ুতরঙ্গ দ্বারা সক্রিয় হয়ে সমুদয় পেশীর সংকোচন ঘটায়। এভাবে পেশী কাজ করে। আলোচিত পেশীসূত্রসমূহই এই সংকোচনের কারণ। অনুদৈর্ঘ্য তির্যকচ্ছেদে পেশীসূত্রসমূহকে পর পর পুরু ও সরু দেখা যায়। উভয় ধরনের সূত্রই প্রোটিন গঠিত। পুরু ও সরু সূত্রকে যথাক্রমে **মাইওসিন** (myosin) এবং **একটিন** (actin) বলা হয়। সূত্রসমূহ সামনে-পেছনে কোষের দীর্ঘ অক্ষ বরাবর অবিরাম দোল খায় বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দোলায়মান গতিকে সূত্রেসৃষ্ট আড়াআড়ি রাসায়নিক সেতু (chemical cross link) প্রতিরোধ করতে পারে। মাইওসিন ও একটিনের মধ্যে এই রাসায়নিক সেতু সৃষ্ট হলে, পুরু সূত্র সরু সূত্রকে সংকুচিত করে। ফলে সূত্র ও কোষের সংকোচন ঘটে। ATP-র পরিমাণের উপর রাসায়নিক সেতুর সংখ্যা নির্ভর করে। যখন ATP-র পরিমাণ বেশী থাকে এবং ATP অণুতে আহিত শক্তি নিহিত থাকে তখন রাসায়নিক সেতুর সংখ্যা দাঁড়ায় কম। আবার যখন ATP ভেঙে ADP ও P_i-এ পরিণত হয়

banglainternet.com

এবং শক্তি ছাড়া পায় তখন রাসায়নিক সেতুর সংখ্যা বেশী হয়ে যায়। এসবের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

(১) ব্যয়িত শক্তি (energy spent)
(২) সেতুর গঠন (cross-links spent)
(৩) একটিনের সংকোচন (contraction of actin)

ATP ADP + P_1

(১) আহিত শক্তি (energy charged)
(২) সেতুর ভাঙন (cross-links broaken)
(৩) একটিনের সম্প্রসারণ (relaxation of actin)

এ সমস্ত কাজ কিভাবে সম্পাদিত হয় তা আজো পরিষ্কার জানা যায়নি। সিলিয়া (cilia) ও ফ্লাজেলার (flagella) তাড়না ; মাইক্রোভিলি ও এমিবার চলাফেরা প্রভৃতি কোষের বিভিন্ন ধরনের গতি তুলনামূলক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয় সংকোচনী প্রোটিন দ্বারা। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে ATP অণুর

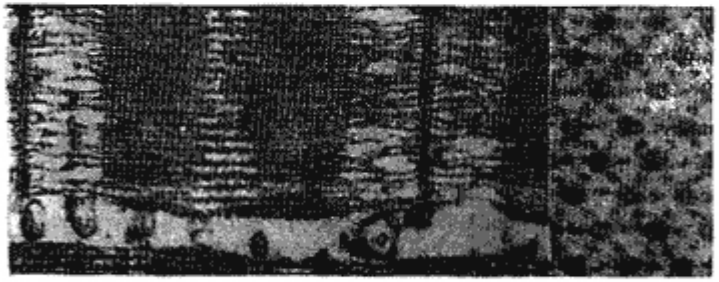

চিত্র ৪.১১ ঃ ডোরা পেশীর কোষাংশের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ।
বামে ; একটি সারকোমেয়ার এবং পাশাপাশি দুটি সারকোমেয়ারের মধ্যেস্থিত মিটোকণ্ড্রিয়া। দুটি "Z" ফালির মধ্যেকার অংশই সারকোমেয়ার (বাম ও ডানে সরু, কালো ফালি) ডানে ঃ সারকোমেয়ারের একটি অংশের প্রস্থচ্ছেদ। এতে পেশীসূত্রসমূহের শেষপ্রান্ত ও ও নির্দিষ্ট বিন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে। বড় ও কালো দাগগুলি হলো মাইওসিন। একটিনের ছয়টি ফালকা সূত্রদ্বারা মাইওসিন পরিবৃত থাকে।

পরিমাণ বেশী থাকতে হয়। তদুপরি ATP অণুকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সহজে যেন পাওয়া যায়। সারকোমেয়ারের (চিত্র ৪.১১) পাশে অসংখ্য বড় মিটোকণ্ড্রিয়া থাকে। মিটোকণ্ড্রিয়া শক্তির সর্বক্ষণিক উৎস এবং মিটোকণ্ড্রিয়াই কোষকে কর্মোপযোগী করে তুলে।

banglainternet.com

এক ধরনের মসৃণ পেশীকে শিরা, ধমনী, জরায়ু ও পৌষ্টিক নালীর গাত্রে দেখা যায়। মসৃণ পেশী উপর্যুক্ত ডোরা পেশী থেকে ভিন্ন। মসৃণ পেশী হঠাৎ সংকুচিত হয় না। একে অনেকটা সংকুচিত হতে বাধ্য করা হয়, আর সংকোচন চলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামার তালে তালে। মসৃণ পেশীর কোষ ডোরা পেশীর কোষের তুলনায় আকারে ছোট। এর কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং এতে ডোরা পেশীর অনুরূপ দৃঢ় সারকোলেম্যা নেই। অন্য কোষসমূহ ডোরা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় অথচ মসৃণ পেশীর কোষে ডোরা নেই, থাকলেও স্বল্পসংখ্যক। মাইওফিব্রিল বা পেশীসূত্র আছে বটে কিন্তু এসব সূত্র সরু ও বেশ দীর্ঘ। সূত্র কোষের দীর্ঘ অক্ষ বরাবর প্রলম্বিত থাকে। এসব পেশীর সংকোচন ডোরা পেশীর ন্যায় সংঘটিত হয় বলে ধারণা করা হয়, তবে সংকোচন যেহেতু আস্তে ও ধীরগতিতে সম্পন্ন হয় সেহেতু এতে শক্তি খরচ হয় কম। এ কারণে মসৃণ পেশীর কোষে মিটোকণ্ড্রিয়ার সংখ্যা নগণ্য এবং যা আছে তাও আকারে ছোট।

এখন আমরা পেশী কোষকে কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিবেচনা করি তাহলে এর গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতর অর্থবহ উত্তর পেতে পারি। মসৃণ পেশী-কোষ থেকে ডোরা পেশী-কোষে মিটোকণ্ড্রিয়ার সংখ্যা অনেক বেশী। কোষের শক্তিব্যয়ের প্রয়োজনের উপর কি পরিমাণ মিটোকণ্ড্রিয়া কোষ থাকবে তা নির্ভর করে। শুধু তাই-ই নয় মিটোকণ্ড্রিয়ার আকারও এর উপর নির্ভরশীল। প্রাপ্তবয়স্ক পেশী-কোষে, কোষবস্তুর জৈব সংশ্লেষের জন্য, ATP ভিন্ন অন্য বিকল্প উপাদানের প্রয়োজন নেই। সুতরাং অন্তপ্লাজমীয়-জালি, রাইবোজোম, গলজি এপারেটাস প্রভৃতি কোষের সার্বিক প্রয়োজনের ও ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে গৌণ ভূমিকা পালন করে। বলাবাহুল্য, শেষোক্ত কোষ উপাদানসমূহ কোষের জন্য কোন মতেই অপরিহার্য নয়। অপরদিকে, আমরা প্রথমবারের মতো এমন একটি উপাদানের সাথে পরিচিত হলাম যেটির সংকোচন ক্ষমতা এর কাজের ধরনের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। সেই উপাদানের কথা আমাদের জানা আছে। সেটি হল মাইওফিব্রিল বা পেশীসূত্র। যেহেতু এসব পেশী-কোষের প্রধান কাজই হল যান্ত্রিক কাজ বা সংকোচন, সেহেতু এতে গঠনগত ও কার্যগত উপাদানরূপে পেশীসূত্রের সমাবেশ ঘটে বেশী।

পরিবাহী কোষ

একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীতে প্রধান দুটি কৌষীয়-পরিবহণ পদ্ধতি আছে ঃ (১) পৌষ্টিক নালীগাত্রের কোষ বা অন্ত্র থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্তে নিয়ে যায়, এবং (২) বৃক্কের

banglainternet.com

কোষ যা রক্তপ্রবাহ থেকে তরল ও বর্জনীয় পদার্থ শুষে নিয়ে মূত্ররূপে নিস্কাশন করে। দুটো তন্ত্রের (পৌষ্টিক তন্ত্র ও রেচন তন্ত্র) কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে তুলনা করা যায়। অন্তত এসবরে মোটামুটি বৈশিষ্ট্যসমূহের বিষয়ে তুলনা চলে। আমরা এখানে কেবল বৃক্কের কোষ সম্পর্কে বিবেচনা করব যেহেতু অন্ত্রের শোষণকারী স্তম্ভাকার কোষসমূহকে পূর্বে ২.৫ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

পরিবহণ নিষ্ক্রিয় প্রয়াস নয়। এই প্রক্রিয়ায়ও শক্তির প্রয়োজন হয়। আমরা এ ব্যাপারে অসংখ্য মিটোকণ্ড্রিয়ার অবদান আশা করতে পারি। মিটোকণ্ড্রিয়া সক্রিয় ও

চিত্র ৪.১২ ঃ বৃক্ক নালিকার এপিথেলিয়াল কোষের অভ্যন্তরভাগের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। চিত্রে নিবিড়ভাবে জড়িত প্লাজমা-ঝিল্লী এবং অসংখ্য ঘন সন্নিবিষ্ট মিটোকণ্ড্রিয়া (M)-কে দেখা যাচ্ছে। বেসমেন্ট-ঝিল্লীও (BM) এর সাথে প্রদর্শিত হয়েছে। এই কোষের বিপরীতে অর্থাৎ বৃক্ক নালিকার গহ্বরের দিকের অংশে অনেক মাইক্রোভিলিও থাকে। (সৌজন্য, Dr. D. Fowcott)

অবিরাম পরিবহণে নিয়োজিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিবাহী কোষে প্রচুর সংখ্যক বড় আকারের মিটোকণ্ড্রিয়া থাকে। ভেতর-বাইরে কোষের উপাদানসমূহের আদান-প্রদান যেহেতু কোষের উপরিতলের আয়তনের উপর আংশিক নির্ভরশীল, সেহেতু প্লাজমা-ঝিল্লীর বিবিধ পরিবর্তন আমরা আশা করতে পারি। কোষের এক পাশে মাইক্রোভিলি (microvilli) ও অপর পাশে ঝিল্লীর গভীর খাঁজ থাকাতে কোষের

উপরিতলের আয়তন বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৪.১২)। গণনায় দেখা যায় বৃক্কনালীর একটি অংশের প্রতি কোষে ৬৫০০ মাইক্রোভিলি থাকে। এতে উপরিতলের আয়তন প্রায় ৪০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

মাইক্রোভিলি বৃক্ক নালিকার লুমেন বা গহ্বরের দিকে মুখ করে থাকে। শোষণই এদের কাজ (মাইক্রোভিলি সম্বলিত কিছু কোষ কতিপয় বস্তুও নিঃসরণ করে। সুতরাং শোষণই এর একমাত্র কাজ নয়)। একই সাথে এরা পুনঃশোষণের কাজও করে। পানি ও খাদ্যবস্তু মূত্রের সাথে নলের মধ্যে দিয়ে নিস্কাশিত হবার সময় পুনঃশোষণের কাজটুকু সম্পাদিত হয়। খাদ্যবস্তুর মধ্যে দ্রবীভূত শর্করা ও লবণের কথা উল্লেখ করা যায়। কোষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় শর্করা ও পানি কোষের বিপরীত প্রান্ত দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। অর্থাৎ কৈশিক রক্তনালী-পূর্ণ, ভাঁজবিশিষ্ট ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে শর্করা ও পানি অতিক্রান্ত হয়। তখন এই ঝিল্লী শর্করা ও পানি ধরে রাখে এবং বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। তদুপরি বৃক্ক নালিকার গাত্রস্থিত কোষসমূহ নালিকা-গহ্বরে কতিপয় উপাদান নিঃসৃত করে। কাজেই, বৃক্ককোষে দুভাবে অণুর চলাচল হয়। এ সব কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে কোষের আকার নির্ধারিত হয়। যেহেতু নালিকায় শোষণ ও নিঃসরণের হারে পরিবর্তন দেখা দেয় সেহেতু কোষ থেকে কোষে মাইক্রোভিলির সংখ্যা এবং ঝিল্লীর ভাঁজের সংখ্যায়ও হেরফের হয়। ঝিল্লীর মাধ্যমে উপাদানসমূহ পরিবাহিত হবার জন্যে শক্তির দরকার। ফলে, বৃক্কের এক কোষ থেকে অন্য কোষে মিটোকণ্ড্রিয়ার সংখ্যা ও আকার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এতে গলজি এপারেটাস, অন্তপ্লাজমীয়-জালি ও রাইবোজোম রয়েছে। তবে পেশী-কোষের মধ্যে যেমন তেমনি এখানেও এদের ভূমিকা গৌণ এবং এসব কোষের ব্যাপক অংশকে অধিকার করে রাখে না।

উৎপাদক-কোষ

ব্যাপক সংখ্যক বিশেষ গুণসমন্বিত কোষ কতিপয় উপাদানের জৈব-সংশ্লেষ ঘটায়। অগ্ন্যাশয়-কোষ পরিপাক রস সৃষ্টি করে এবং তা নিঃসৃত করে। ত্বকের বহির্দেশের কোষ, প্লাজমা-কোষ, লোহিত রক্ত কণিকা যথাক্রমে কেরাটিন, এন্টিবডি ও হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। এ সবগুলিই প্রোটিন জাতীয়। প্রোটিন-সংশ্লেষ সম্বন্ধে

banglainternet.com

আমরা যতদূর জানি তাতে এই প্রক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমের RNA-এর উপস্থিতি অবশ্যই অপরিহার্য। শুধু তাই-ই নয় RNA-এর পরিমাণও যথেষ্ট থাকতে হয়। ৪.১৩ নং চিত্র ঃ প্লাজমা-কোষের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ এবং এতে অমসৃণ অন্তপ্লাজমীয় জালির আধিক্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রের কোষের সাথে ২.৮ নং চিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। শেষোক্ত চিত্রের কোষসমূহ নিঃসারক কোষ।

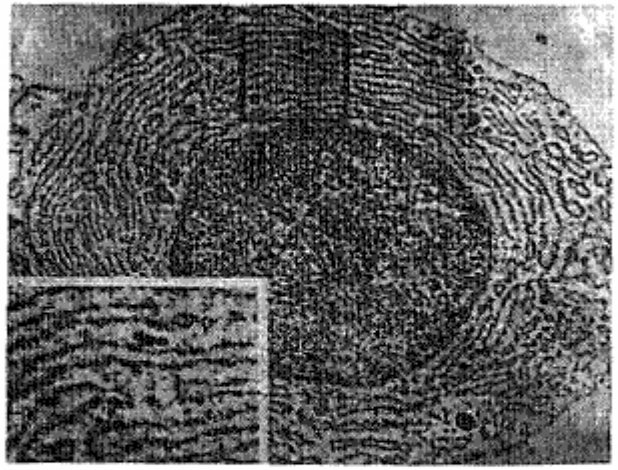

চিত্র ৪.১৩ ঃ প্লাজমা-কোষের ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। এই কোষ এন্টিবডি তৈরি করে। কোষ এন্টিবডিকে রক্ত প্রবাহে প্রেরণ করে। চিত্রের ভিতরে সমাবিষ্ট অপর চিত্রটি অন্তপ্লাজমীয়-জালির। একে × ৩১,৬৮০ গুণ বিবর্ধন করা হয়েছে।

(সৌজন্য, Ham and Leeson, Histology, 4rth ed, 1961 ; Lippin Cott Co.)

আবার এর সাথে ৪.১৪ নং চিত্রের তুলনা করা যাক। ৪.১৪ নং চিত্রে প্রাকলোহিত **রক্ত কণিকা** (Pro-erythroblast) প্রদর্শিত হয়েছে। এই লোহিত রক্ত কণিকাটি অপ্রাপ্তবয়স্ক। রক্তকণিকা প্রোটিন-সংশ্লেষের দ্বারা হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। কিন্তু এর সাইটোপ্লাজম বিস্ময়করভাবে অন্তপ্লাজমীয়-জালিকা মুক্ত, যদিও এতে রাইবোজোম কণিকার পরিমাণ প্রচুর। রাইবোজোম কণিকায় RNA থাকে। রক্ত

banglainternet.com

কণিকায় খুব স্বল্প সংখ্যক গলজি-ঝিল্লী থাকে। তবে প্লাজমা-কোষ ও অগ্ন্যাশয়-কোষে গলজির পরিমাণ স্বাভাবিক।

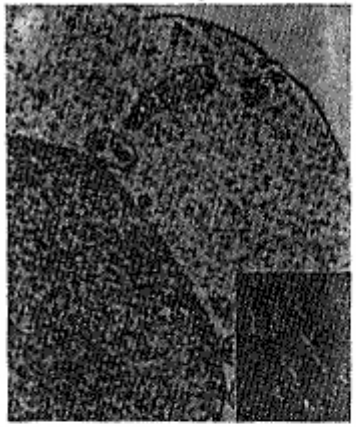

চিত্র ৪.১৪ ঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রাক-লোহিত রক্ত কণিকা ও পলিরাইবোজোমের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ ; দুটি কোষ যথাক্রমে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন করে। রক্তকণিকার বিবর্ধন মাত্রা × ১৭২৮০ এবং রাইবোজোমের বিবর্ধন মাত্রা × ৪৩২০০। রাইবোজোমের চিত্রটি ছবির নীচে ডানে দেখা যাচ্ছে।

(সৌজন্য Dr. A. Ham and Leeson, Histology 4rth ed, 1961, Lippin Cott Co, Philadelphia; J. R. Warner, A Rich, and C. E. Hall.)

এখানে আলোচিত বৈসাদৃশ্যমূলক পার্থক্যসমূহ সম্ভবত সংশ্লেষিত উপাদানসমূহের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনের আর পরিবর্তিত বা পরিবাহিত হবার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য, প্লাজমা-কোষ ও অগ্ন্যাশয়-কোষ বাইরে চালান দেবার জন্যেই প্রোটিন তৈরি করে। এ সব উপাদান আপাতত রূপান্তরিত ও পুনঃযোজিত হয়। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে দেখা যায় যে, পুনঃযোজনের কাজটি অন্তপ্লাজমীয়-জালির ঝিল্লী ও গলজিই সম্পন্ন করে। সুতরাং, আমার আবার প্রমাণ পাচ্ছি যে কোষ-সম্পাদিত কাজ ও কোষের অভ্যন্তরীণ গঠন-সৌকর্যের মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে। এই সঙ্গতির কারণে, কোষের কাজ ও গঠনকে পরস্পরের বিকল্প বলে আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি।

চিত্র নং ২.৯ এবং ৪.১৫ আরো বৈসাদৃশ্য তুলে ধরে। চিত্র ২.৯-তে অপোসামের শুক্রাশয়ের একটি কোষকে দেখানো হয়েছে। কোষটির প্রধান কাজ হলো স্টেরয়ড হরমোন উৎপাদন করা। এ সব কোষে বদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় RNA-

banglainternet.com

এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। যেহেতু এসব কোষ প্রোটিন-সংশ্লেষ করে না সেহেতু এসবে RNA-এর উপস্থিতির আশা করা যায় না। কোষের মসৃণ অন্তপ্লাজমীয়-জালিতে অবশ্য এনজাইম থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই এনজাইম স্টেরয়ড হরমোন সংশ্লেষে সহায়ক হয়। এই কোষে অন্তপ্লাজমীয়-জালির বেশ বিকাশ ঘটে। অপরদিকে ৪.১৫ নং চিত্রের কোষটি বিশেষ গুণ সমন্বিত নয়। সাধারণ এই

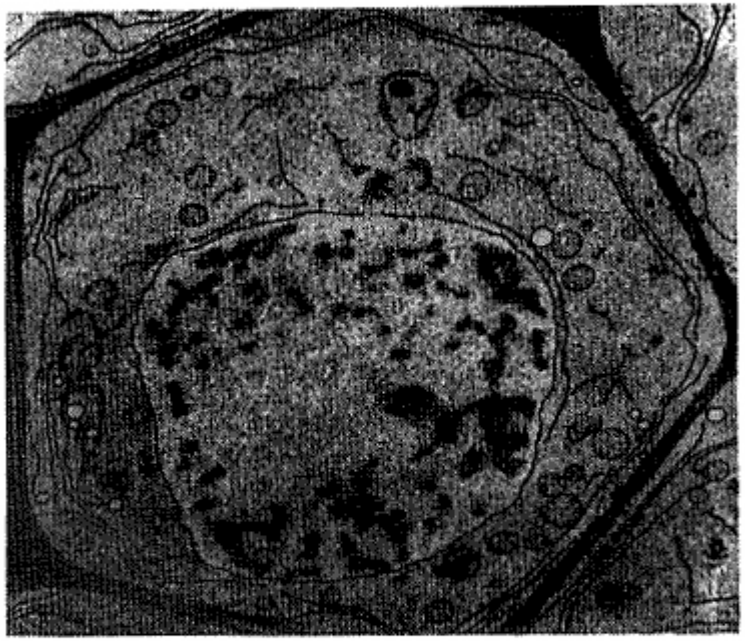

চিত্র ৪.১৫ : ভুট্টার মূলশীর্ষের দ্রুত বিভাজনরত কোষের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ। গলজি-ঝিল্লীর কতিপয় স্তূপকে নিউক্লিয়াসের উপরে দেখা যাচ্ছে। এ সবের নিকটে রয়েছে একটি প্লাস্টিড। নগণ্য সংখ্যক মিটোকন্ড্রিয়া থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অন্তপ্লাজমীয়-জালি দীর্ঘ সরু ঝিল্লী দ্বারা গঠিত। ক্রোমোজোমের কোন স্পষ্ট আকার পরিদৃষ্ট হয় না। রাইবোজোমের সংখ্যা যথেষ্ট তবে সাইটোপ্লাজমে এদের দেখা যাচ্ছে না। আদি প্রাচীর ও মধ্য পট্টলও (lamella) দেখা যাচ্ছে। কোনার কালো রন্ধ্রসমূহই মধ্য-পট্টলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে।

সৌজন্য, (Dr. G. Whaley)

কোষটিকে দ্রুত বিভাজনরত কলা থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের কোষ সব অঙ্গেই থাকে, তবে এটি উদ্ভিদকোষ বিধায় এতে সেন্ট্রোজোম নেই। কিন্তু এর

একটি উপাদানের বিনিময়ে অপর উপাদানটি গুরুত্বমণ্ডিত নয়। যাহোক, যেহেতু এই টাইপের কোষসমূহ দ্রুত বিভাজিত ও বর্ধিত হয়, সেহেতু এতে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের উপাদান অধিকতর উৎপাদিত হয়। তদুপরি এতে প্রচুরসংখ্যক মুক্ত RNA থাকে যা এসব কোষের বিশেষত্ব বলে গণ্য।

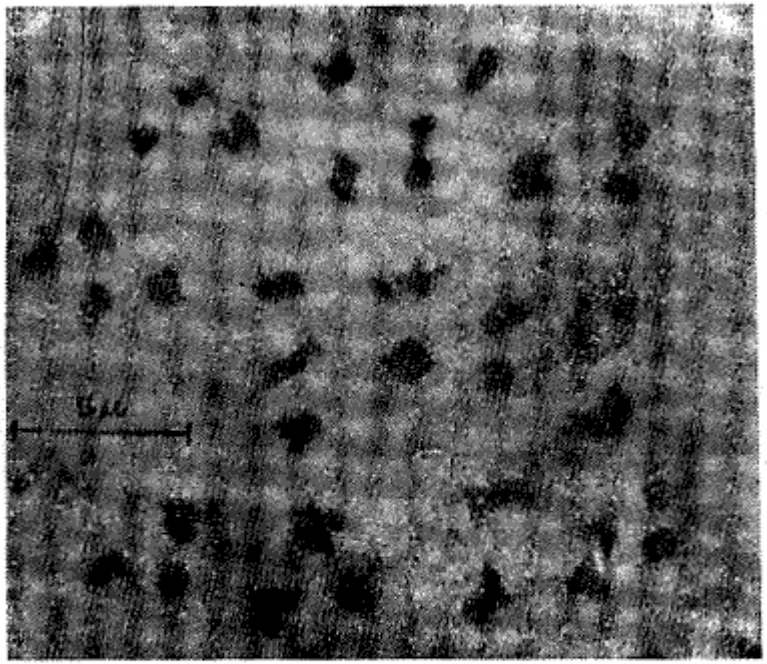

চিত্র ৪.১৬ : *Bacillus cereus* কে Feulgen পদ্ধতির সাহায্যে রঞ্জিত করা হয়েছে যাতে এর "নিউক্লিয় অঞ্চল" দেখা যায়।

(সৌজন্য, Dr. C. F. Robinow)

আদিকোষ

প্রকৃত-কোষই (true cells or eucells) এ যাবৎ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে স্থান পেয়ে আসছে। এ সব কোষের বংশগতির উপাদানসমূহ নিউক্লিয়াসের মধ্যে গ্রুপবদ্ধ হয়। উপাদানসমূহকে ঘিরে থাকে একটি ঝিল্লী বা বলা যায় নিউক্লিয়-ঝিল্লী। প্রকৃত-কোষকে এই নিউক্লিয়াসের কারণে স্পষ্ট চেনা যায়।

banglainternet.com

অন্যদিকে, কতিপয় কোষে ওধরনের নিউক্লিয়াস থাকে না, যদিও "নিউক্লিয়" উপাদান থাকে। কোষের বাইরে একটি প্লাজমা-ঝিল্লী থাকে। শেষোক্ত ধরনের কোষকে আদিকোষ বলা হয়। এর নামানুসারে একে আদিকালীন কোষ বলা যায় কিনা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যে এদেরকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়। এই কোষকে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবালে দেখা যায়।

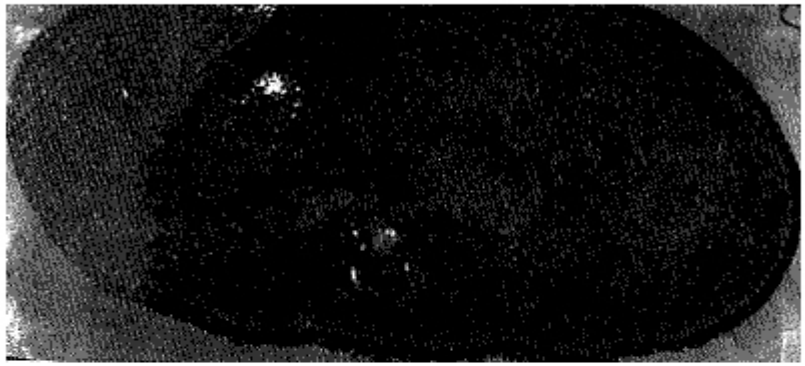

চিত্র ৪.১৭ : *Bacillus subtilis*-এর অঙ্কুরিত স্পোরের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ। এতে কোষ-প্রাচীর, কালো প্লাজমা-ঝিল্লী, হালকা নিউক্লিয়-অঞ্চল এবং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট সাইটোপ্লাজম দেখা যাচ্ছে। (× 57200)
(সৌজন্য, Dr. C. F. Robinow).

৪.১৬ নং চিত্রে আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত একটি ব্যাকটেরিয়া প্রজাতিকে দেখা যাচ্ছে। রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হওয়ায় এতে "নিউক্লিয়-অঞ্চল"-কে দেখা যাচ্ছে তবে এর অভ্যন্তরীণ গঠন-প্রকৃতিকে বিন্দুমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। উচ্চ বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে কোষের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় (চিত্র ৪.১৭)। নিউক্লিয়-অঞ্চল ঝিল্লীবদ্ধ নয় এবং এতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম। ফলে এই অঞ্চলকে আপেক্ষিকভাবে হালকা দেখায়। সূক্ষ্ম সূত্রাকার যে বস্তুসমূহকে দেখা যাচ্ছে সে সব হল বংশগতির উপাদান বা DNA। সাইটোপ্লাজমে কতিপয় ঝিল্লীর মতো পদার্থ (চিত্র ৪.১৮) দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এসবের সাথে উচ্চতর কোষের অন্তপ্লাজমীয়-জালির তুলনা করা যায়। এই ঝিল্লীতে প্রচুর পরিমাণ RNA-যুক্ত মুক্ত কণিকা দেখা যায়।

banglainternet.com

নীল-সবুজ শৈবালের কোষসমূহ অধিকতর সংঘটিত। নিউক্লিয়াসের ক্রোম্যাটিন ঝিল্লীবদ্ধ নয় বটে, তবে, সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য ঝিল্লী দেখা যায়। এসব ঝিল্লী সালোক-সংশ্লেষী ল্যামেলি বা ঝিল্লীরূপে প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও ঝিল্লীসমূহ গ্রুপবদ্ধ হয়ে স্পষ্ট ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয় না।

চিত্র ৪.১৮ : *Bacillus mycoides*-এর কোষের একটি অংশের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ। এতে সাইটোপ্লাজম ও ঝিল্লীর বস্তুসকল দেখা যাচ্ছে। এসব উপাদান সম্ভবত ঝিল্লীর ভাঁজ থেকে উদ্ভূত হয়। (X 186, 660)
(সৌজন্য, Dr. C. F. Rabinow).

সুতরাং আমরা ক্রমাগত জটিল অঙ্গ-সমন্বিত কোষসমূহের সাক্ষাৎ পাই। ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গ-সংগঠন এসবের মধ্যে সবচেয়ে কম জটিল। এর তুলনায় নীল-

banglainternet.com

সবুজ শৈবালের কোষ এক ধাপ এগিয়ে। এরপর আসে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জটিল প্রকৃত কোষের কথা। কোষের এই অনুক্রম কোষের বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের পর্যায় কিনা বিচার-সাপেক্ষ। তবে বর্ণিত অনুক্রমটি যুক্তিসিদ্ধ।

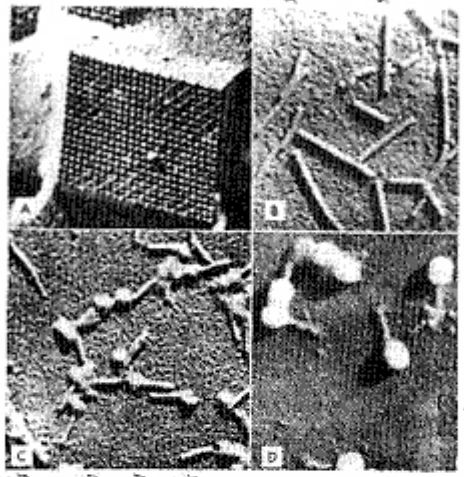

চিত্র ৪.১৯ ঃ ভাইরাসের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ ; ক Tabacco necrosis virus গোলাকৃতি ও এর পরিধি ২৫০ Å। এমোনিয়াম সালফেট তিতালে স্ফটিকাকৃতি দেখায়। খ. Tobacco mosaic virus-মুদ্রার প্লেটের মতো একগাদা প্লেট নিয়ে ভাইরাসের রডগুলি গঠিত। রডের বাইরে থাকে প্রোটিন-আবরণী আর এর ভিতরে থাকে RNA. গ. P_2 bacteriophage of bacterial virus-এর অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়কে আক্রমণ করে। এদের ষড়ভুজ মাথা ও একটি পুচ্ছ থাকে। ঘ. T_6 bacteriophage-এটিও অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে।
(সৌজন্য, Dr. L. W. Labaw)

ভাইরাস

তুলনামূলক কোষবিদ্যার আলোচনায় ভাইরাসকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ভাইরাস জীবন্ত জীব বটে তবে এরা কোষ নয়। এ পর্যন্ত তিন শতাধিক ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এসবের অনেকগুলি মানুষের পীতজ্বর (Yellow fever), র‍্যাবিজ (Rabies), পলিও (Poliomyelitis), গুটিবসন্ত, কর্ণপ্রদাহ (Mumps), হাম এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক রোগের কারণ বলে জানা গেছে। ৪.১৯ নং চিত্রে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত কতিপয় ভাইরাসের ছবি দেখা যাচ্ছে।

banglainternet.com

আমাদের পরিচিত কোষের বিপাকক্রিয়া ও গঠন-প্রকৃতি ভাইরাসের বিপাকক্রিয়া ও গঠন-প্রকৃতি থেকে আলাদা। যেমন, ভাইরাস মুক্ত জীবননির্বাহ করতে পারে। এরা পোষক-কোষের ভিতরে জন্ম নেয় ও বৃদ্ধিলাভ করে। যে কোন উপায়ে, এরা পোষক-কোষের বিপাকযন্ত্রকে পরিবর্তিত করে। ফলে স্বাভাবিক ক্রিয়া বাদ দিয়ে কোষ ভাইরাস উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। ভাইরাসে জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ; এরা জন্ম নেয় এবং বহুভাজিত হয়ে স্ব-প্রতিলিপি উৎপাদন করে। তদুপরি এতে বংশগতির প্রায় সব গুণ আরোপিত হয় যা জীবদেহে বর্তমান। জীবের অনুরূপ এদেরও প্রোটিন এবং নিউক্লিয়েইক এসিডের প্রধান অণুসমূহ থাকে। কোষ ও ভাইরাস সম্পর্কে নিবিড় তুলনামূলক আলোচনা যদি ওঠে এবং তা যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে ভাইরাসকে সে ধরনের কোষ বলা যায় যাতে সাইটোপ্লাজম নেই। তবে এতে নিউক্লিয় বংশগতির উপাদান তুলনামূলকভাবে একটু বেশীই থাকে।

banglainternet.com

পঞ্চম অধ্যায়

বিভাজনরত কোষ

পূর্বসূরি প্রখ্যাত ইংরেজ বংশগতিবিদ উইলিয়াম বেট্‌সন একবার লিখেছিলেন, "আমার মতে, জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় কীর্তি হবে সেই অস্থায়িত্বের আবিষ্কার, যা কোষের অবিরত বিভাজনের জন্যে দায়ী। বিভাজনরত একটি কোষের দিকে যখন তাকাই তখন দ্বৈত-নক্ষত্রের গঠন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষক একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতো আমি অনুভব করি যে, সৃষ্টির এক আদি ক্রিয়া যেন আমার সামনে সংঘটিত হচ্ছে।"

প্রত্যেক জীববিজ্ঞানী যিনি বিভাজনরত একটি জ্যান্ত কোষকে প্রত্যক্ষ করেন অথবা অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে রঞ্জিত কোষে বিভাজন প্রক্রিয়া চাক্ষুষ করেন তিনি বেট্‌সনের মতো চমৎকৃত বোধ করবেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কল্পনাকে সুদূর-প্রসারী না করেও আমরা ক্রোমোজোমের গতিবিধি ও এর নিপুণভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে অপত্য কোষে গমন এবং সাইটোপ্লাজমের খণ্ডায়নে অপূর্ব ধীরগতিসম্পন্ন ছন্দ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। অপর একটি কোষ-বিভাজনের ক্ষেত্রেও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া একই ছন্দ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভাজনরত কোষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় দুটি পাঠ করলে কোষ-বিভাজনের ছন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রত্যেকে আমরা একটি কোষ থেকে বিকাশ লাভ করেছি। এই কোষটিকে মা-বাবা থেকে পেয়েছিলাম। মা-বাবারও বিকাশ ঘটেছে একটি কোষ থেকে। এভাবে আমরা পেছনের দিকে এগুলে কোষীয় জীবনের উষালগ্নে পৌঁছে যাব। আমাদের জীবন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ একটি সরু অথচ অবিচ্ছিন্ন মালায় গাঁথা থাকে। এই মালার উপকরণ হল পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত স্বতন্ত্র কোষসমূহ। যদিও এসব কোষের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকে তবু এরা পূর্ণাঙ্গ এই অর্থে যে এসব কোষ জৈবনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, প্রজনন ঘটায় এবং নূতন কোষ সৃষ্টি করতে পারে। বলাবাহুল্য, নূতন কোষ সৃষ্টি করতে পারে মানে এরা নূতন জীবের জন্ম দিতে পারে।

জীবের কোষ-প্রকৃতির পরিচয় পাবার পর থেকেই কিভাবে নূতন কোষের উদ্ভব ঘটে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও বিতর্ক হয়েছে। কোষতত্ত্ব অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিয়েছিল যে, কোষ, জৈব-সংগঠন ও জৈব-কার্যের মৌল একক। তবু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে পূর্বেস্থিত কোষ-বিভাজনের মাধ্যমে নূতন কোষের উদ্ভব ঘটে — এ সত্যকে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। উল্লিখিত মতবাদের জন্যে আমরা জার্মান বিজ্ঞানী রুডলফ্ ফিরশোভের কাছে ঋণী। ১৮৫৮ সালে তিনি বলেন ঃ

> যেখানে একটি কোষের অস্তিত্ব থাকে সেস্থলে একটি প্রাক-কোষের অস্তিত্ব থাকবেই। যেমন একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ যথাক্রমে মাত্র একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। যদিও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের সপক্ষে প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ হাজির করা হয়নি তবু এ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, সমুদয় জীবজগতে শাশ্বত আইনের শাসন ও অবিরাম বিকাশ অর্থাৎ অবিরাম প্রজনন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, জীব বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদের পুরো অঙ্গসমষ্টি বা এর অংশবিশেষকে বোঝানো হয়েছে।

জীবনের শুরু সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেও আমরা আজ জীবনের আদি পর্যায়কে নির্মাণ করতে পারি না। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে আজকে আমরা যে কোষকে দেখছি, জীবনের শুরুতে কোষের গঠন প্রকৃতি সম্ভবত এরকম ছিল না। বর্তমানের কোষ দীর্ঘ ক্রমবিকাশেরই ফল। নূতন জীবন-সৃষ্টি সম্ভব নয়। নূতন জীবন প্রাক-জীবন থেকেই উৎপাদিত হয়। এই তত্ত্বের নাম জীবজনি (Biogenesis)। তত্ত্বটির আবিষ্কর্তা হলেন লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)। যদিও ইতালীয় বিজ্ঞানী রেডি (১৬২৬-১৬৯৮) দু'শ বছর আগে অনুরূপ আবিষ্কার সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। পাস্তুরের গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক কোষ-প্রজনন বিষয়ক ছিল না, তবু পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে স্বতঃজনন (Spontaneous generation of life) সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়ে দিলেন। তিনি মাংসের ঝোল-ভর্তি দুটি ফ্লাস্ক নিলেন এবং ফ্লাস্ক দুটিকে সেদ্ধ করলেন যাতে এর মধ্যে কোন জীবাণু বেঁচে থাকতে না পারে। এরপর পাস্তুর একটি ফ্লাস্কের মুখ খোলা রাখলেন এবং অপরটির মুখে চিপি এঁটে দিলেন ও একে বায়ুরোধী (air-tight) করে রেখে দিলেন। কিছুদিন পর মুখ খোলা ফ্লাস্কে ব্যাকটেরিয়া ঈস্ট ও বিভিন্ন ছাতার সন্ধান

banglainternet.com banglainternet.com

পাওয়া গেল। অবশ্য, এসব বাতাসেই জন্ম নেয়। এগুলোকে বর্তমানে আমরা জীবাণু নামেই অভিহিত করি। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে এসব জীবাণু বিভিন্ন রকমের কোষ ছাড়া আর কিছু নয়। বায়ুরোধী ফ্লাস্কে অবশ্য কোন প্রাণের চিহ্ন দেখা গেল না। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত এতে বায়ু প্রবেশ করতে দেওয়া হল না ততক্ষণ কিছুরই সন্ধান মিলল না। ফিলটারের মাধ্যমে ফ্লাস্কের সংস্পর্শ এড়িয়ে জীবাণুমুক্ত পরিস্রুত বাতাস ঢোকালেও বায়ুরোধী ফ্লাস্কে কোন জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। পরীক্ষাসমূহ যদিও ছিল সাধারণ, তবু, এসবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। কারণ এসব গবেষণার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা — পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে জীবন-সৃষ্টি সম্ভব এ ধারণাকে চিরকালের জন্যে বাতিল ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। পাস্তর ও ফিরশোভ এ মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, কোষের অবয়বে জীবন, প্রাক-জীবন থেকেই শুধু উদ্ভূত হতে পারে, অবশ্য সে প্রাক-জীবনও থাকে কোষেরই অবয়বে।

মানবদেহে কোষের সংখ্যা প্রায় $১০^{১৪}$। দেহ প্রাপ্তবয়স্ক হতে থাকলে এসব কোষ শুধু গঠিত হয়না বা শুধু পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতই হয় না, অনেক ক্ষেত্রে এদের জীবনচক্র অতিক্রান্ত হবার কালে অন্য কোষ এদের স্থান দখল করে এবং অবধারিতভাবে এদের মৃত্যু ঘটে। বস্তুত, যে কোন বৃদ্ধিরত সুস্থ জীবাঙ্গে বা যে জীবাঙ্গের মেরামত দরকার, তাতে কোষ-বিভাজনের ফলে নূতন কোষ উৎপাদিত হয়। নির্দিষ্ট পরিবেশ ও বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাঙ্গের চাহিদামাফিক কোষ-বিভাজনের হার ও সময়সীমা নির্ভর করে। এসব কোষ একই হারে বিভাজিত হয় না। আবার কোন কোন কোষ নষ্ট হলে এর স্থান পূরণ হয় না। এসব কোষ শেষাবধি অবশ্যই মরে যায়।

প্রকৃতিতে একটি অতি লক্ষণীয় ঘটনা হল যে, সব জীবদেহে কোষ-বিভাজনের পদ্ধতি মোটামুটি এক। সুতরাং এক বা দু'ধরনের কোষে অনুষ্ঠিত কোষ-বিভাজন পদ্ধতির যদি বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সমুদয় জীবদেহে কোষ-বিভাজন পদ্ধতির একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে। কোষ-বিভাজনের এই সার্বজনীন নাটকের অধিকাংশই সংগঠিত হয় নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তাই বলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বিভাজনকালে সাইটোপ্লাজমেও পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। কোষের বিবিধ অংশের ভূমিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনার আগে কোষে অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা যাক।

মূল শীর্ষের বিভাজনরত কোষ

বড় সীম (*Vicia faba*) এবং পেঁয়াজের (*Allium cepa*) মূল শীর্ষের কলার কোষে যে সক্রিয় কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া দেখা যায়, একে এক্ষেত্রে চমৎকার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়। এসব কোষের ক্রোমোজোম আকারে বড় ও সংখ্যায় কম (সীমে ১২ ও পিঁয়াজে ১৬টি)। তদুপরি বিভাজনরত কোষের স্থায়ি স্লাইড সহজে নির্মাণ করা যায়।

বাড়ন্ত মূলশীর্ষের দীর্ঘচ্ছেদ বা বিচূর্ণীত মণ্ড থেকে এর সুদৃশ্য পূর্ণচিত্র পাওয়া যেতে পারে। দু'ধরনের কোষে স্বতন্ত্র রঞ্জক ব্যবহার করা হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় (৫.১ নং চিত্রে সীম ও পেঁয়াজের কোষের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়)। পেঁয়াজের কোষের স্বল্প রঞ্জিত নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলিকে (সংখ্যায় এক থেকে চার) স্পষ্ট দেখা যায় (৫.৩ নং চিত্রের ডান পাশে)। কিন্তু সীমে নিউক্লিওলির সন্ধান মিলে না। সন্ধান না মেলার অর্থ এই নয় যে নিউক্লিওলি সীমের কোষে অনুপস্থিত। আসলে এসব রঞ্জিত না হওয়ার কারণে দেখা যায় না। (বহুবচনে নিউক্লিওলি আর একবচনে নিউক্লিওলাস — অনুঃ)।

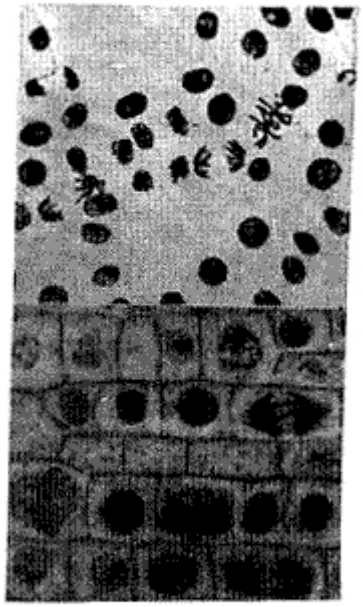

চিত্র ৫.১ ঃ খেৎলানো বা সেকশান করা মূলশীর্ষে কোষের সুন্দর চিত্রদৃশ্য। বাম ; পেঁয়াজের মূল থেকে সেকশনের বিভাজনরত কোষ। এতে লৌহযুক্ত হিমোটোক্সিলিন রঞ্জক ব্যবহারের ফলে ক্রোমোজোম, বেম-প্রাচীর, সাইটোপ্লাজম এবং বিভাজনের বিবিধ পর্যায় যথা দশামধ্যক থেকে চতুর্থ দশা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

(সৌজন্য ঃ জেনারেল বাইওলজিক্যাল সাপ্লাই হাউজ, inc. চিকাগো)

ডান ঃ বড় সীমের খেঁৎলানো কোষ। খেঁৎলে নেওয়ার ফলে কোষসমূহকে অবিন্যস্ত দেখা যাচ্ছে। তবে এতে ফিউলজেন রঞ্জক ব্যবহৃত হওয়ায় শুধু ক্রোমোজোম ভিন্ন কোষের আর কোন অংশকে রঞ্জিত দেখা যাচ্ছে না। (X, Ca 420)। (সৌজন্য ঃ Dr. T. Merz)।

banglainternet.com
banglainternet.com

এখন আমরা নিউক্লিও বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় বা দশা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। মাইটোটিক (চিত্র ৫.২ ও ৫.৩) উপায়ে কোষ-বিভাজনের কথা প্রথমে ধরা যাক। (এই প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস (mitosis) বা পরোক্ষ নিউক্লিয়-বিভাজন (indirect nuclear divsion বা ক্যারিওকাইনেসিস (karyokinesis) বলা যায় অনুঃ)। বিভাজনচক্রের প্রথম পর্যায়ে দশামধ্যক বা পর্যায়মধ্যক (interphase)-কে

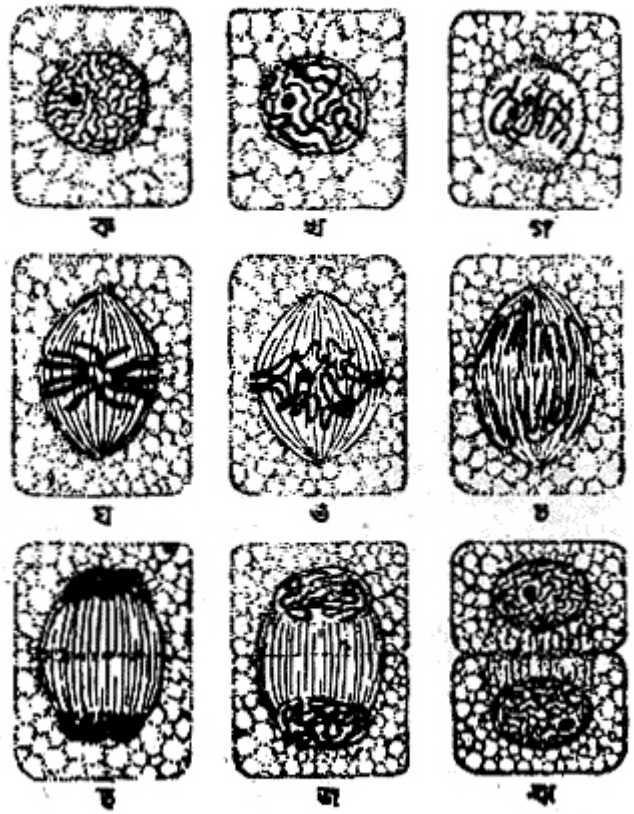

চিত্র ৫.২ ঃ নকশার সাহায্যে কোষ-বিভাজনের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। কোষ-বিভাজনের জন্যে প্রস্তুত হলে এর নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এসব স্বীয় দৈর্ঘ্য বরাবর দ্বিধাবিভক্ত হয়। দ্বিতীয় দশায় এতে বেমের আবির্ভাব ঘটে এবং তৃতীয় দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোম্যাটিডে পরিণত হয়। এরপর কোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি নূতন কোষে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে যথাক্রমে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস (Karyoknesis & Cytokinesis) বলা হয়।

banglainternet.com

বিভাজনের শুরুর প্রক্রিয়ারূপে বিচার করা যায়। এই পর্যায়ে এর নিউক্লিয়াস অবিভাজনরত কোষের নিউক্লিয়াসের তুলনায় আকারে বড় দেখায়। একটি কোষ কেন বিভাজনে উদ্যত হয় তার কারণ আমরা জানি না। আমরা শুধু এ-টুকু জানি নিউক্লিয়াসস্থিত নিউক্লিইক এসিড, প্রোটিন ও বড় মৌল কোষ-বিভাজনের প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে দশামধ্যক (interphase) পর্যায়ে সংশ্লেষিত হয়। এই দশায় নিউক্লিওলি

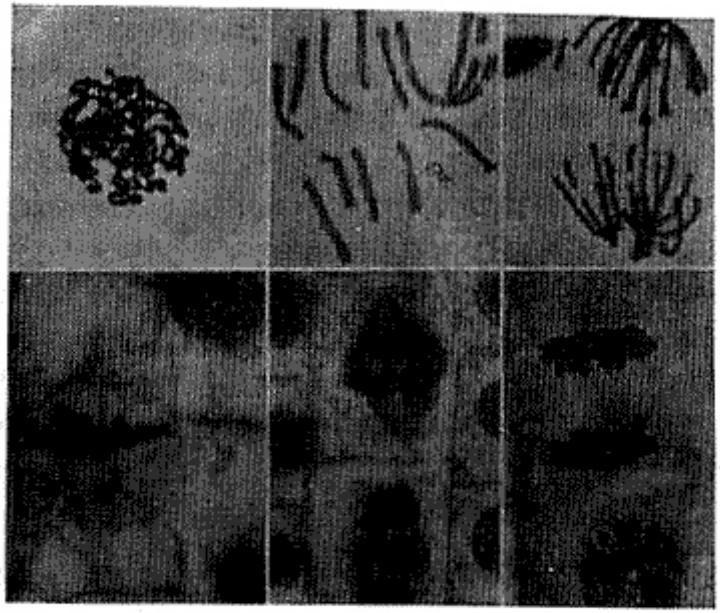

চিত্র ৫.৩ ঃ কোষ-বিভাজনের পর্যায়সমূহ।

উপরের সারি ; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশায় সীমের মূলশীর্ষ-কোষের অবস্থা। এতে ফিউলজেন রঞ্জক ব্যবহার করায় ক্রোমোজোমকেই শুধু দেখা যাচ্ছে। ক্রোমোজোমে ডিএনএ থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশায় দুটো সর্বাধিক লম্বা ক্রোমোজোমের একটি অংশে যে ফাঁকা অঞ্চল দেখা যাচ্ছে সে অঞ্চলে নিউক্লিওলাস ছিল এবং তা ক্রোমোজোমের উল্লিখিত অংশের সাথে যুক্ত ছিল।

(সৌজন্য, Dr. T. Merz)

নীচের সারি ঃ বামে, দ্বিতীয় দশা। কেন্দ্রে, প্রারম্ভিক তৃতীয় দশা ও শেষ চতুর্থ দশা। শেষোক্ত দশায় বেমে আড়াআড়িভাবে কোষ-প্লেট থাকে। ডানে, শেষ তৃতীয় দশা ও প্রারম্ভিক প্রথম দশা। এ সব কোষকে হিমোটোক্সিলিন দ্বারা রঞ্জিত করায় এতে প্রাচীর, সাইটোপ্লাজম, বেম ও ক্রোমোজোম ইত্যাদি দেখা যায়। (X 780)

banglainternet.com

(সৌজন্য ঃ General Bilogical Supply House, Inc. Chicago)

এবং ক্রোম্যাটিনের সূক্ষ্ম জাল ব্যতীত অন্য কিছু সামান্যই দেখা যায়। এর অর্থ হল ক্রোমোজোমে নিউক্লিয়েইক এসিড অধিক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত থাকে, ফলে রঞ্জক পুরোপুরি রঙ ধরাতে পারে না। অথবা ক্রোমোজোমে মাত্রাতিরিক্ত পানি লেগে থাকে। এ ক্ষেত্রেও রঞ্জক রঞ্জনে সফল হয় না। ক্রোমোজোম পরিমাণমতো রঞ্জক পদার্থ বিশোষণে সক্ষম না হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবে এর বর্ণ উজ্জ্বল হয় না। এ সব কারণ মিলে এই দশায় ক্রোমোজোমসমূহকে পৃথকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না।

এরপর কোষের প্রথম দশা (prophase) শুরু হয়। এই দশায় ক্রোমোজোমকে স্পষ্টভাবে লম্বা, সরু, সুতোর মত দেখায়, প্রতিটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়। দুটি খণ্ড যেন পরস্পরের প্রতিলিপি। প্রতি খণ্ডকে বলা হয় ক্রোম্যাটিড। সম্ভবত পানি কমে যাবার ফলে ক্রোমোজোমসমূহ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে ক্রোমোজোমের রঙ ধারণক্ষম অংশসমূহকে ঘন সন্নিবিষ্ট দেখায়। এ সময় অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্রোমোজোমের খাটো ও মোটা হওয়া। যে প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম খাটো ও মোটা হয় সেই প্রক্রিয়ায় সরু ক্রোমোজোম প্যাঁচালো রূপ ধারণ করে। সরু একটি তারকে যতটুকু সম্ভব প্যাঁচিয়ে স্প্রিং-এ পরিণত করা সম্ভব হয় তদ্রূপ এক্ষেত্রেও ক্রোমোজোমে সে ধরনের প্যাঁচ পড়ে। সমগ্র প্রথম দশা জুড়ে ক্রোম্যাটিড যতই খাটো হতে থাকে ততই এর প্যাঁচের সংখ্যা কমতে থাকে। ক্রোম্যাটিডের পরিধি বৃদ্ধিই এর কারণ।

প্রথম দশায় নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমসমূহ দ্বারা গঠিত নিউক্লিওলিকে আকারে বেশ বড় দেখায়। কিন্তু এই দশার শেষে নিউক্লিওলি আকারে ছোট হতে থাকে এবং শেষাবধি বিলুপ্ত হয়ে যায় (চিত্র ৫.৩)। এই দশার শেষে নিউক্লিয়-ঝিল্লী অন্তর্হিত হয়ে যায়। শুধু তাই-ই নয় সঙ্গে ক্রোমোজোমের সংকুচিত হওয়াও রহিত হয় এবং পরবর্তী দ্বিতীয় দশার সূচনা হয়।

নিউক্লিয়-ঝিল্লীর অন্তর্ধানের সাথে সাথে বেমের (spindle) আবির্ভাব ঘটে। রসায়নের দৃষ্টিতে বেম প্রোটিন-অণুর দীর্ঘ শিকল ছাড়া আর কিছু নয়। শিকলসমূহ দুটি "মেরুকে" কেন্দ্র করে দীর্ঘভাবে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র ৫.৪)। বেমের "তন্তু" শুধু প্রোটিন-গঠিত সূত্র নয়, এ-সব আসলে সূক্ষ্ম নালীও বটে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, সাইটোপ্লাজমের প্রায় ১৫% প্রোটিন এই বেম-তন্তু গঠনে অংশ নেয়। বেম গঠিত হবার পর সাইটোপ্লাজমের ভিতর দিয়ে ক্রোমোজোম বেমের দুই মেরুর

মধ্যবর্তী "নিরক্ষীয়-অঞ্চলে" (equator) এসে জড়ো হয়। সেখানে ক্রোমোজোম বেম-তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমেয়ার দ্বারা যুক্ত থাকে। নিরক্ষীয়-অঞ্চল বেমের ভারসাম্য রক্ষা করে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমেয়ার সব সময় নিরক্ষীয়-অঞ্চলেই থাকে। অবশ্য ক্রোম্যাটিডসমূহ যে কোনভাবে থাকতে পারে। এদের জন্যে কোন নিয়ম নেই। কলচিসিন (colchicine) দ্রবণের একটি ফোঁটা কোষে দিলে বেমের গঠন বন্ধ হয়ে যায়। বেম গঠিত না হলে ক্রোমোজোমসমূহ স্বচ্ছন্দে মুক্ত অবস্থায় থাকে। তখন ক্রোমোজোমের গঠন-প্রকৃতি সহজে গবেষণা করা যায় (চিত্র নং ৫-৩, উপরের সারির মাঝেরটি)।

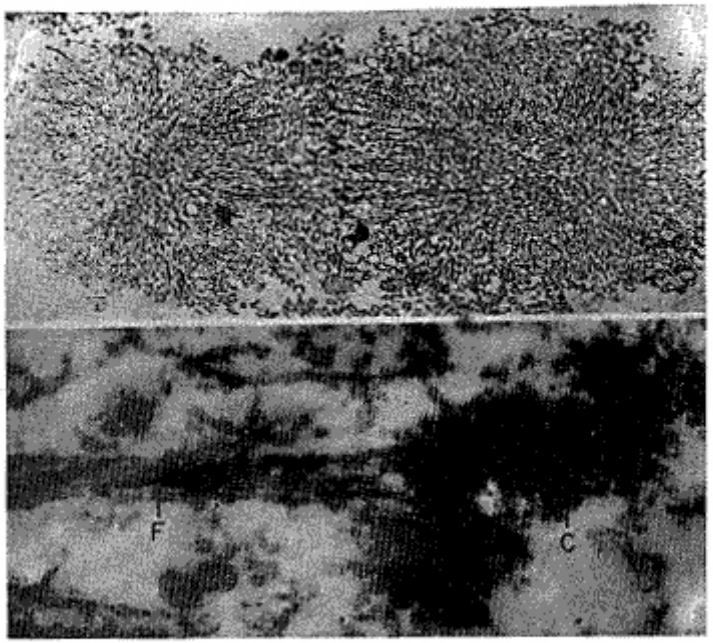

চিত্র ৫.৪ ঃ সী আরচিন বা সমুদ্র সজারুর (Sea urchin) ডিমে বেম-গঠনের দৃশ্য ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফে দেখা যাচ্ছে। উপরে ; স্বল্প-বিবর্ধনে (X. 2,236) স্বতন্ত্র একটি বেম। দ্বিতীয় দশায়, এতে ক্রোমোজোমসমূহকে কালো কালো দাগের মতো দেখায়। বেম-এর কেন্দ্রে ফাঁকা জায়গাতেই ওসব ক্রোমোজোম অবস্থান নেয়।
নীচে ; ক্রোমোজোম (C) সংলগ্ন বেম-সূত্র (F), (x. 56,250)
(সৌজন্য, Dr. R. E. Kane)

banglainternet.com

ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমেয়ারের সাহায্যে নড়াচড়া করে। সেন্ট্রোমেয়ারের সাহায্য ব্যতীত ক্রোমোজোম বেমে প্রয়োজনীয় অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। তদুপরি পরে ক্রোম্যাটিডও এর সহায়তা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয় দশায় ক্রোমোজোমের চাপা সংকীর্ণ অঞ্চলে সেন্ট্রোমেয়ারকে দেখা যায়। এই সংকীর্ণ

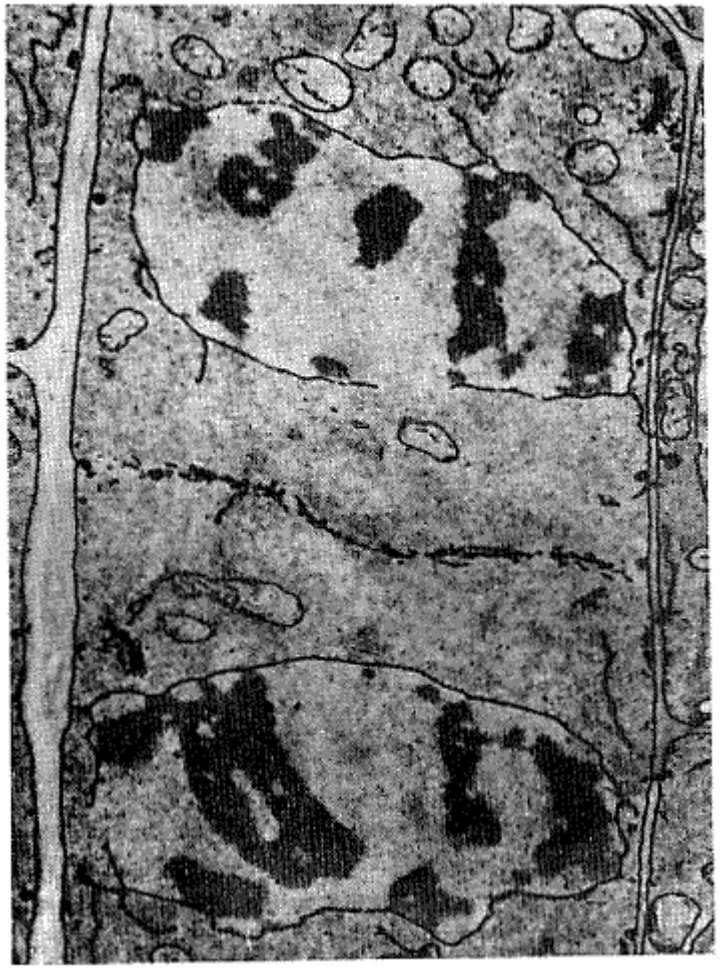

চিত্র ৫.৫ (ভূট্টার কোষের চতুর্থ দশার শেষের ইলেকট্রন-মাইক্রোগ্রাফ। এই দশায় কোষের কেন্দ্রস্থল দিয়ে কোষ-প্লেট গঠিত হতে দেখা যাচ্ছে।
(সৌজন্য, Dr. G. Whaley)

banglainternet.com

অঞ্চল ক্রোমোজোমের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই অঞ্চল দিয়েই সেন্ট্রোমেয়ার ক্রোমোজোমকে ভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দুই বাহুতে বিভক্ত করে। খুব স্বল্প সংখ্যক ক্রোমোজোমে এর প্রান্তভাগে উল্লেখিত সংকীর্ণ অঞ্চল অবস্থিত থাকে।

দ্বিতীয় দশার পর তৃতীয় দশার (anaphase) সূত্রপাত হয়। তৃতীয় দশায় সেন্ট্রোমেয়ার দ্বিধাবিভক্ত হয়। ফলে প্রতিটি ক্রোম্যাটিড একটি সেন্ট্রোমেয়ার পায়। এরপর ক্রোম্যোটিডদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীর গতিতে বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। মেরুদ্বয়ে ক্রোমোজোমের সমাবেশ ঘটে এবং এসব ঘন সন্নিবিষ্ট হলে তৃতীয় দশার শেষ পর্যায় এসে দাঁড়ায়।

তৃতীয় দশার পর চতুর্থ দশার (telophase) শুরু। এই দশা প্রথম দশার ঠিক উল্টো। এই দশায় পুনরায় নিউক্লিয়-ঝিল্লী গঠিত হয়। ক্রোমোজোমের প্যাঁচ খসে যায় এবং পূর্বের মতো সরু সুতার আকার ধারণ করে। নিউক্লিওলি ও ক্রোমোসেন্টারের পুনরাগমন ঘটে। মোটের উপর নিউক্লিয়াস বিভাজন শুরুর প্রাক্কালের দশামধ্যকে (interphase) ফিরে যায়। নিরক্ষীয়-অঞ্চলে একটি নূতন কোষপ্রাচীরের সৃষ্টি হয়। বেমের মধ্যেই প্রথমে কোষ-প্লেট গঠিত হয়। এই কোষ-প্লেট (cell plate) গঠনের উপকরণ সম্ভবত গলজি এপারেটাস (চিত্র ৫.৫) সরবরাহ। পরে এই প্লেট বেমের বাইরে প্রসারিত হয়ে উভয় পাশের কোষপ্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এটিই উল্লিখিত নূতন কোষপ্রাচীর যা কোষকে প্রায় সমান দুভাগে বিভক্ত করে। এরপর বেমের বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে কোষ-বিভাজন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসসহ দুটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয়।

প্রাণিকোষের বিভাজন

Whitefish (*Coregonus*)-এর ভ্রূণে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রক্রিয়া দেখে প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যেকার প্রভেদ নির্ণয় করা যায়। ক্রোমোজোমের আচরণ উভয়ক্ষেত্রে যদিও সমান কিন্তু Whitefish-এর কোষে পেঁয়াজ বা সীমের কোষের তুলনায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেশী এবং এসব আকারেও ছোট। বেম গঠনের প্রক্রিয়ায় এই পার্থক্যটি সহজেই নজরে পড়ে। চিত্র ৫.৬-তে Whitefish এর কোষের প্রথম দশায় নিউক্লিয়-ঝিল্লীর পাশে রশ্মিবিকীর্ণকারী বস্তুর মতো একটি অঙ্গ দেখা যায়। এই বস্তুর নাম সেন্ট্রোজোম (centrosome) সেন্ট্রোজোমের কেন্দ্রবস্তু সেন্ট্রিওল

banglainternet.com

(centriole) থেকে তারার রশ্মির (astral rays) মতো উপাদান প্রসারিত থাকে। অবশ্য চিত্রে সেন্ট্রিওলকে দেখা যায় না। প্রথম দশায় বা এরও আগে সেন্টিওল দ্বিধাবিভক্ত হয়। এর অর্ধাংশ ঝিল্লীর সাথে স্থানান্তরে গমন করে। গমনশীল অংশ অপর অর্ধাংশের ঠিক বিপরীত প্রান্তে অবস্থান নেয়। নিউক্লিয়াসের ঝিল্লী বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর সেন্ট্রিওল কোষীয় প্রোটিনকে বেমের গঠনের ক্ষেত্রে সংগঠিত করে। সংগঠনের কাজটি ওরা এমনভাবে করে যাতে বেমের মেরুদ্বয় ও বেম পরস্পর বিপরীতে অবস্থিত সেন্ট্রিওলের মধ্যেই থাকে। সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন করে তা আজো জানা যায় নি। তারকা রশ্মিবৎ উপাদানসমূহ সাইটোপ্লাজমেও প্রসারিত থাকে। কিন্তু এসবের বেমে অন্তর্ভুক্তি ছাড়া অন্য কোন

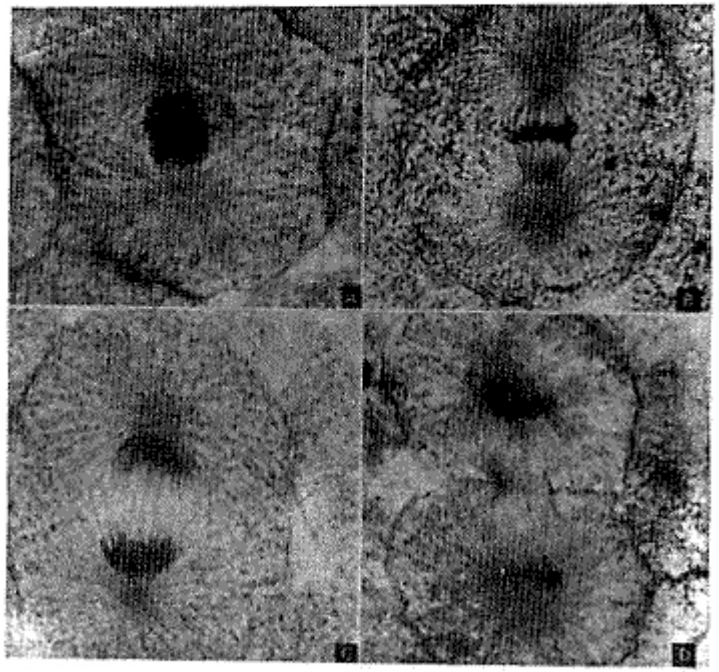

চিত্র নং ৫.৬ : Whitefish–এর কোষ বিভাজন পর্যায় ; ক, প্রথম দশা — বেমের গঠনকার্যের প্রারম্ভ ; খ-দ্বিতীয় দশা, গ-তৃতীয় দশা, ঘ-চতুর্থ দশা — এই দশায় কোষের মাঝখানে ফাটল সৃষ্টি হয়ে দুটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

(Copyright, General Biological Supply House, Inc. Chicago)

banglainternet.com

ক্রিয়া আছে কিনা তাও জানা যায়নি। কোষ বিভাজনকালে সেন্ট্রিওলের বিবিধ পর্যায়সমূহকে ৫.৭ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। উদাহরণটি প্রোটোজোয়া থেকে নেওয়া। প্রোটোজোয়ার সেন্ট্রিওল আকারে বেশ বড়।

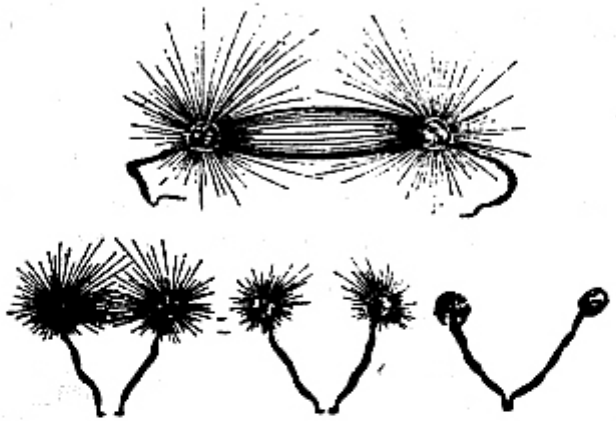

চিত্র নং ৫.৭ : Barbulanympha নামক প্রোটোজোয়ায় দীর্ঘ সেন্ট্রিওল কর্তৃক বেম গঠনের দৃশ্য। লক্ষণীয় যে এতে পরবর্তী বিভাজনের জন্যে নূতন সেন্ট্রিওয়েলের আবির্ভাব ঘটেছে। দুটি দশার বিকাশকালের পরিসরে এসব দীর্ঘায়িত হয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যে পরিণত হয়। গোলাকার যে বস্তুটি দেখা যাচ্ছে সেটি হল সেন্ট্রোজোম।

(সৌজন্য, : L. R. Cleveland)

Whitefish–এর মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি নূতন অপত্যকোষে পরিণত হবার পদ্ধতিতেও এর সাথে উদ্ভিদকোষের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে 'নিরক্ষীয়–অঞ্চল' বরাবর কোষের দুই প্রান্তে কিনারায় খাঁজের সৃষ্টি হয়। এই খাঁজ ক্রমশ গভীর হয়ে কোষকে দ্বিখণ্ডিত করে। কিন্তু উদ্ভিদকোষ এভাবে দ্বিভাজিত হয় না। উল্লেখযোগ্য যে, উদ্ভিদকোষে শক্ত কোষপ্রাচীর থাকে। কোষের দ্বিভাজন প্রক্রিয়াটি এক্ষেত্রে কোষ–কেন্দ্রে কোষ–প্লেট (cell plate) গঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

কোষ–বিভাজনে ধারাবিহিক ঘটনাপ্রবাহ

কোষ–বিভাজনকালে পরপর দশা অতিক্রান্ত হবার বিষয়ে যে সাধারণ বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাতে বিভাজন প্রক্রিয়ার অনেকগুলি ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থিত করা

banglainternet.com

সম্ভব হয় না। আপাতদৃষ্টিতে, এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে কোষ বিভাজন-চক্র সম্পূর্ণ হবার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও সঙ্গতিসম্পন্ন। বিভাজনকালে নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম এ সবের বিবিধ অংশ স্বকীয় ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে। কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হলে অস্বাভাবিক কোষের জন্ম হয়।

৫.৮ নং চিত্রে বিভাজনপূর্ব ও বিভাজনকালের ঘটনাসমূহের খতিয়ান দেখানো হয়েছে। প্রথম দশা শুরুর পূর্বাবস্থা অণুবীক্ষণযন্ত্রে সরাসরি ধরা না পড়লেও এই দশামধ্যক বা প্রাকদশা প্রাথমিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রাক-দশাকোষকে পরবর্তী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশায় অনুষ্ঠিতব্য নাটকীয় ঘটনা প্রবাহের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বাস্তবিকপক্ষে, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত কোষ-বিভাজন শুরু হবার আগে, এর বিভাজিত হবার যাবতীয় প্রস্তুতিপর্ব সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিভাজিত হবে কি হবে না তা পরবর্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে। যেমন

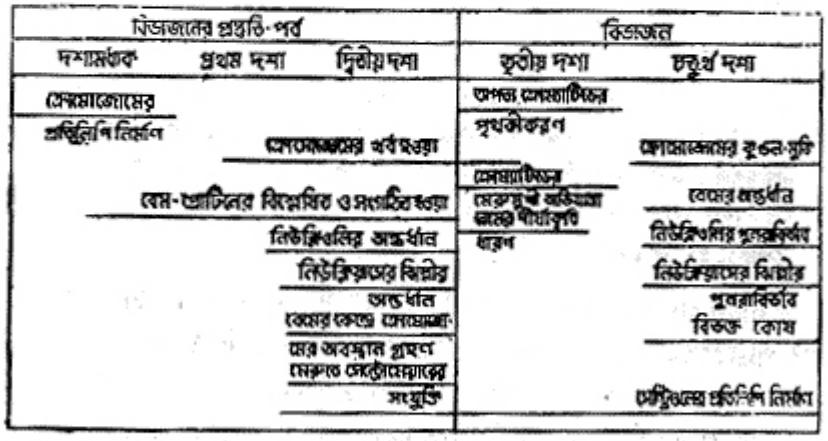

চিত্র নং ৫.৮ ঃ কোষ-বিভাজনের প্রস্তুতি-পর্ব ও কোষ-বিভাজনকালে ঘটনা প্রবাহের খতিয়ান (D. Nazia অনুসরণে)

দেখা যায় স্নায়ু ও পেশী কোষসমূহ এককালে বিভাজনরত থাকলেও একটি পর্যায়ে এসে এদের বিভাজন প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এসব কোষ আর কোন দিন বিভাজিত হয় না। অথচ প্রাণীর রক্ত সৃষ্টিকারী কলাসমূহ বা উদ্ভিদের মূলশীর্ষ সারা জীবন অবিরাম কোষ বিভাজনে রত থাকে।

banglainternet.com

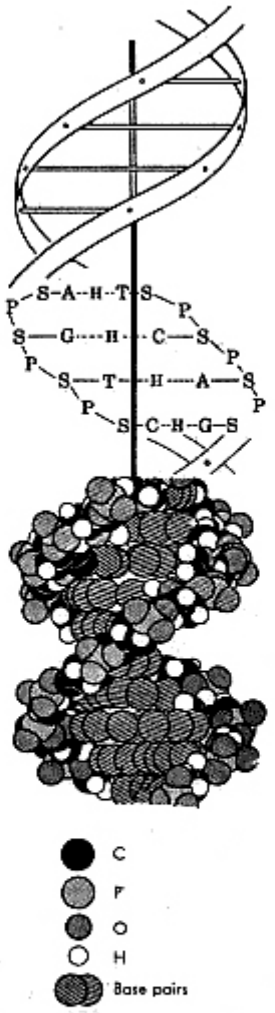

চিত্র নং ৫.৯ ঃ ডিএনএ-এর হেলিক্স বা কুণ্ডলী। এতে অণুর তিন ধরনের বিন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে।

উপরে ঃ দ্বি-কুণ্ডলনের সাধারণ চিত্র। এতে কুণ্ডলীর বহির্সীমানায় পর্যায়ক্রমে ফসফেট-শর্করার সমাবেশ দেখা যায় এবং "তাক"-এ ক্ষারক জোড়া দেখা যায়।

মাঝে ঃ দ্বি-কুণ্ডলনের কিছুটা বিশদ বিবরণ ঃ ফসফেট (P), শর্করা (S), এডেনিন (A), থাইমিন (T), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও হাইড্রোজেন (H),

নীচে ঃ ফাঁকা স্থান যে-সব অণুদ্বারা পূর্ণ সেসবের বিশদ বিবরণ ; কার্বন (C), অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H), ফসফরাস (P), ও ক্ষারক জোড়া (base pairs)

কোষের বিভাজনের প্রস্তুতিপর্বের প্রথম পদক্ষেপ হল সেন্ট্রিওলের বিভাজন। বিভাজন-প্রক্রিয়ার শুরুর আগেভাগেই সেন্ট্রিওলের বিভাজন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি নির্মাণ এবং বেম গঠনকারী প্রোটিনসমূহের সংশ্লেষণ। বিগত দশকের গবেষণার আলোকে এসব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

ক্রোমোজোমস্থিত জিন (gene) ও ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি, ডিএনএ (DNA) অণুর আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। ৫.৯ নং চিত্রে এই অণুর স্বীকৃত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এর রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এটি একটি উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থটি কতিপয় ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি। এই অণুসমূহ পরস্পর একটি নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকে। এসব অণুর মধ্যে রয়েছে শর্করা (sugar), ডিসোক্সিরাইবোজ (desoxyribose), ফসফোরিক এসিড (phosphoric acid) এবং চারটি ক্ষারক (base)। ক্ষারকসমূহের দুটি পাইরিমাইডিন (pyrimidine) এবং দুটি পিউরিন (purine) পাইরিমাইডিন দুটির নাম থাইমিন (thymine) ও সাইটোসিন (cytosine) এবং পিউরিন দুটি হল এডেনিন (adenine) ও গুয়ানিন (guanine)। প্রতিটি ক্ষারকের রাসায়নিক কাঠামো এবং তৎসহ এর হাইড্রোজেন অণুর সাথে সংযোজন পদ্ধতি (mode of linkage) ৫.১০ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। শর্করা ও ফসফেট পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে ডিএনএ-এর বহির্সীমানা গঠন করে এবং ক্ষারক জোড়া দুপাশের

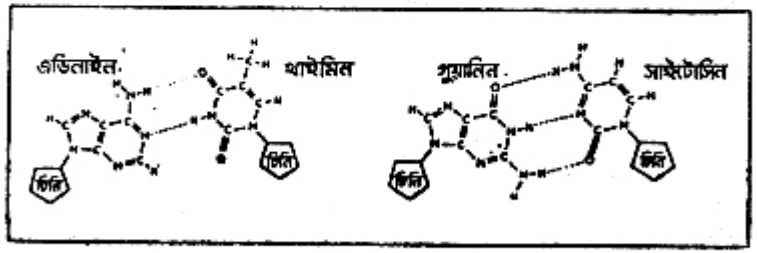

চিত্র নং ৫.১০ : ডিএনএ অণুর চারটি ক্ষারকের রাসায়নিক গঠন। এসব ক্ষারক জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত থাকে। থাইমিন ও সাইটোসিন এবং এডিনিন ও গুয়ানিন জোড়াকে যথাক্রমে পাইরিমাইডিন ও পিউরিন বলা হয়।

পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্ররূপে বিরাজ করে। অবশ্য, ক্ষারক জোড়াও এলোপাথাড়িভাবে থাকে না। এডেনিন ও থাইমিন সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একইভাবে জোড়ায় জোড়ায় থাকে গুয়ানিন ও সাইটোসিন। এক্সরে-এর দ্বারা

বিশ্লেষণ করে ডিএনএ-এর অণুর বিন্যাস জানা গেছে। ডিএনএ একটি দ্বি-কণ্ডুলন বা দুটি হেলিক্স (double helix) গঠিত আকৃতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ একে দেখতে ঘোরানো সিঁড়ির (spiral staircase) মতো। সিঁড়ির দুপাশে পর্যায়ক্রমে ("bannister") শর্করা ফসফেট আর "তাক"-এ (steps) ক্ষারক জোড়া অবস্থান করে। ডিএনএ-এর এই মডেলকে 'ওয়াটসন-ক্রিক ডিএনএ মডেল' বলা হয়। বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক এই মডেল আবিষ্কার করেন।

অনেক জীবদেহের ডিএনএ অণুর দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটি ব্যাকটেরিয়েল ভাইরাসের ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য ৪০ মাইক্রন এবং এর আণবিক ওজন প্রায় ৪০,০০০,০০০। ডিএনএ-এর প্রতিটি প্যাঁচের মোড় পরস্পর থেকে ৩৪ এঙ্গস্ট্রম (Å) দূরে অবস্থান করে। সুতরাং, একটি ডিএনএ অণুতে এ ধরনের হাজার হাজার মোড় থাকতে পারে। এটি বেশ মজার ব্যাপার যে ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি গঠনের সময় ডিএনএ মৌলের প্যাঁচ খসে যেতে পারে। ডিএনএ-এর এই বৈশিষ্ট্য ডিএনএ-এর একটি ছোট খণ্ডে ৫.১১ নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিলিপি গঠন প্রক্রিয়ায় দুটি পরস্পরের অনুরূপ ক্রোমোজোম বা অণু গঠিত হয়। এভাবে দশামধ্যক বা প্রাক-দশা কোষে ডিএনএ-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। ফলে মাতৃকোষ দ্বিভাজিত হয়ে যে নূতন দুটি অপত্য কোষের জন্ম দেয়, সেই দুটি কোষ মাতৃকোষের সমপরিমাণ ডিএনএ লাভ করে। এই উপায়ে ডিএনএ-তে আরোপিত বংশচারিত্র্য কোষ থেকে কোষে, বংশ থেকে বংশ-পরম্পরায় পরিবাহিত হয়।

ক্রোমোজোমে ডিএনএ ছাড়াও আরএনএ (RNA), হিস্টোন (histone) ও একটি অধিকতর জটিল প্রোটিন থাকে। হিস্টোন ডিএনএ-এর সাথে দৃঢ়বদ্ধ থাকে ডিএনএ সংশ্লেষিত হবার সময় হিস্টোনও সংশ্লেষিত হয়। কিন্তু এই চার ধরনের অণু রাসায়নিক উপায়ে সংযোজিত হয়ে কিভাবে আণুবীক্ষণিক ক্রোমোজোমের জন্ম দেয় সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত কম।

৫.৮ নং চিত্র আরো নির্দেশ করে যে বেমের প্রোটিন-সূত্রের অংশবিশেষ দশামধ্যকেই সংশ্লেষিত হয়। স্বতন্ত্র বেমের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রায় ৫% আরএনএ-এর সাথে মিশ্রিত এক ধরনের প্রোটিন পাওয়া গেছে। প্রথম দশার শুরুতে কোষে বেম-প্রোটিন থাকে। তবে এ-সব অসংগঠিত অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ প্রোটিনই নিউক্লিয়াস থেকে উদ্ভূত হয় না, বরং বলা যায় এসব সাইটোপ্লাজমজাত। যদিও

banglainternet.com

কোষের এই দুটি অংশ বেম গঠনের জন্য উপাদান যুগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় দশার ঠিক আগে বেম-প্রোটিনসমূহ পরস্পর বিপরীতস্থিত সেন্ট্রিওলের (সেন্ট্রিওল না থাকলে দুই "মেরুর" মধ্যে) মধ্যে লম্বভাবে অবস্থান নেয়। এসব প্রোটিনের কিছু অংশ স্পষ্টভাবে সুতোর আকার ধারণ করে। সূত্রসমূহ সেন্ট্রিওল-ক্রোমোজোম-এর ক্রোমোমেয়ারের সাথে সংযোগসাধন করে। কতিপয় প্রোটিনসূত্র মেরু থেকে মেরুতে প্রসারিত হতে পারে অথবা শুধু তারকা-রশ্মির মতো সাইটোপ্লাজমে বিস্তার লাভ করতে পারে।

বেম প্রোটিন-সূত্র একযোগে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমেয়ারকে দ্বিতীয় দশা প্লেটে বা নিরক্ষীয়-অঞ্চলে নিয়ে আসে। বলাবাহুল্য, এই অঞ্চল বেমের ভারসাম্য রক্ষা করে। তৃতীয় দশার শুরুতে সেন্ট্রিওল ও সেন্ট্রোমেয়ারের মধ্যবর্তী সূত্র খাটো হয়ে যায়। ফলে, ক্রোম্যাটিড বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ মেরুর নিকটবর্তী হতে থাকে। ক্রোম্যাটিডসমূহের মধ্যে স্থিত বেম-সূত্র প্রলম্বিত হয়ে এ-সবের বিচ্ছিন্নকরণে অধিকতর সহায়ক হয়। তৃতীয় দশায় এই দু'ধরনের ক্রিয়া-কৌশলের বিষয় অবশ্য সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। ক্রোম্যাটিড বিচ্ছিন্ন হয়ে মেরুতে জমা হবার পর সেখানে সেসবকে ঘিরে নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। পরে সাইটোপ্লাজম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি নূতন অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

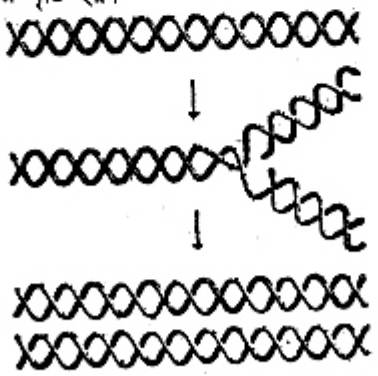

চিত্র নং ৫.১১ : দশামধ্যক বা প্রাক দশায় ডিএনএ অণুর প্রতিলিপি গঠন। পুরনো হেলিক্স বা কুণ্ডলীর (মাঝের) প্যাঁচ খসে দুটি নূতন কুণ্ডলীর জন্ম হচ্ছে।

৫.৮ নং চিত্র দৃষ্টে কোষ-বিভাজনকালে আরো অনেক ঘটনা-প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথম দশায় ক্রোমোজোমের প্যাঁচিয়ে খাটো হওয়া এবং চতুর্থ দশায় এর প্যাঁচ খসে পড়া, নিউক্লিওলি ও নিউক্লিয়-ঝিল্লীর অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাব,

banglainternet.com

সাইটোপ্লাজম বিভাজনের জন্যে কোষ-প্লেট গঠন বা খাঁজের সৃষ্টি এবং বেমের বিলুপ্তি প্রভৃতি ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে অন্যতম। ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি গঠন ও বেম-প্রোটিন গঠনের মতো প্রক্রিয়াসমূহকে রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ডই বলা যায়। আমরা যদিও কোষ-গঠন-চক্রে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ঘটনা-প্রবাহকে অনুসরণ করতে পারি তবু প্রতিলিপি বা বেম গঠনের মতো মৌলিক জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারি খুবই কম। আমরা শুধুমাত্র ডিএনএ* অণুর প্রতিলিপি গঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কেই অদ্যাবধি জানতে পেরেছি।

কোষ-বিভাজনের স্থিতিকাল

কোষ-বিভাজন চক্র সম্পূর্ণ হতে কতক্ষণ সময় লাগে? অথবা বিভাজনের প্রতি দশায় সময় লাগে কি পরিমাণ? বিভাজনরত একটি জীবিত কোষে (কলা কালচারে উৎপাদিত কোষ এ ধরনের গবেষণার জন্যে উত্তম) দশা-পার্থক্য-নির্ণায়ক অণুবীক্ষণযন্ত্রে বিষয়টিকে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। জীববিশেষের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের উপর এর কোষ-বিভাজনের হার নির্ভরশীল। এই হার অনেক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুষ্টি ও তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে কমিয়ে উল্লিখিত বিভাজনের হারকে নিয়ন্ত্রণের বিষয় প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের ফিব্রোসাইটের (fibrocyte) কথা ধরা যায়। এটি এক ধরনের সংযোজী-কোষ। এই কোষটি বেছে নেওয়ার কারণ হলো একে কলা-কালচারে (tissue culture) খুব দ্রুত উৎপাদন করা যায়। এর সম্পূর্ণ কোষ-বিভাজন-চক্র শেষ হতে ১৮ ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ এক প্রাক-দশা বা দশামধ্যক থেকে অপর দশামধ্যক পর্যায়ে পৌছুতে এ ধরনের একটি কোষকে উল্লিখিত সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু প্রথম দশা থেকে চতুর্থ দশা পর্যন্ত সময় লাগে মাত্র ৪৫ মিঃ। সুতরাং বিভাজনের জন্য কোষের প্রস্তুতি-পর্ব চলে প্রায় সতের ঘন্টা ধরে। এরপর সমুদয় প্রক্রিয়া আপেক্ষিকভাবে ঝটিকা গতিতে সম্পন্ন হয়। অন্যান্য কোষ, এমন কি প্রকৃতপক্ষে ফিব্রোসাইটের অন্য টাইপের কোষ-বিভাজনের সময় আরো বেশী লাগে। কাজেই, কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে হলে, এটি পরিষ্কার যে প্রথম দশা শুরুর আগে, দশামধ্যকে অর্থাৎ প্রস্তুতি-পর্বে কি ঘটেছে তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি অদ্যাবধি এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

---

* আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : D.M. Bonner and S. E. Mills, *Heredity* 2nd ed, (Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1964.

banglainternet.com

৫.১২ নং চিত্রে ঘাস ফড়িংয়ের ভ্রূণের নিউরোব্লাস্ট (neuroblast) বা স্নায়ুকোষের বিভাজন-চক্র দেখানো হয়েছে। ভ্রূণের উপরিতলের কোষসমূহ বিভাজিত হয়ে যে কলার গঠন করে তা পরবর্তীকালে প্রাপ্ত-বয়স্ক ঘাসফড়িংয়ের স্নায়ুতন্ত্রের অংশে পরিণত হয়। দেখা যায় যে ৩৮ সেঃ তাপমাত্রায় উল্লিখিত প্রক্রিয়া আনুমানিক সাড়ে তিন ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। এই সময়ের বড় অংশ অর্থাৎ এর অর্ধেক সময় শুধু প্রথম দশাতেই ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশা বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়। তবে শেষ দশায় তুলনামূলকভাবে সময় একটু বেশী লাগে। কারণ চতুর্থ বা শেষ দশায় নিউক্লিয়াসের পূর্ণ গঠন হয়। নির্দিষ্ট এই ধরনের কোষে অবশ্য উপর্যুক্ত মানুষের কোষের তুলনায় দশামধ্যকে সময় কম লাগে। বলাবাহুল্য, যদি তাপমাত্রা ২৬ সেঃ-এ নামিয়ে আনা হয় তাহলে ফড়িংয়ের কোষ-বিভাজন সাড়ে তিন ঘণ্টার স্থলে প্রায় আট ঘণ্টায় শেষ হয়।

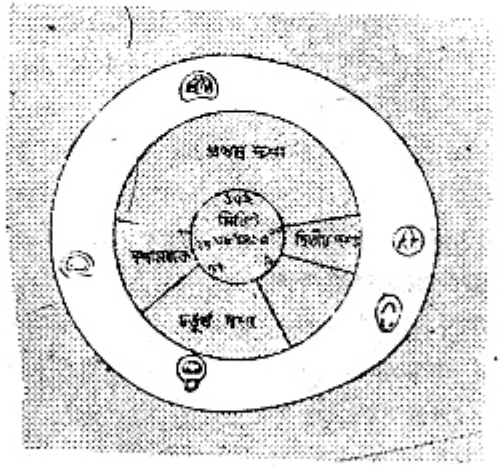

চিত্র ৫. ১২ ঃ ঘাস ফড়িংয়ের কতিপয় ভ্রূণকোষের বিভাজনে সময়ের স্কেল। ৩৮ সেঃ তাপমাত্রায় এসব কোষের বিভাজন ক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে ২০৮ মিঃ। এর চেয়ে নিম্ন তাপে কোষসমূহে যথাক্রমে সময় আরো বেশী লাগে।

কোষ বিভাজনে সময়ের হারে তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া ট্র্যাডেসক্যানসিয়া (*Tradescantia*) নামক উদ্ভিদের পুংকেশরের চুল-কোষ (hair cell of stamen) গবেষণায় চমৎকারভাবে ধরা পড়ে। চুলসমূহ সূত্রাকার। এই চুল শিকলের মতো স্বতন্ত্র অনেকগুলি কোষ নিয়ে গঠিত। শিকলের শীর্ষের কোষটিই শুধু বিভাজিত হয়। ১০° সেঃ তাপমাত্রায় বিভাজন ক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগে ১৩৫ মিঃ কিন্তু ৪৫° সেঃ

তাপমাত্রায় লাগে মাত্র ৩০ মিঃ। এ থেকে স্বভাবত আশা করা যায় যে বিবিধ জীবদেহে কোষ-বিভাজনের সময়-সীমায় তারতম্য ঘটে। ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া প্রতি ১৫-২০ মিনিটে বিভাজিত হয়। অথচ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মূলের শীর্ষকোষের বিভাজনে সময় লাগে বাইশ ঘণ্টা। কোন কোন মূলের শীর্ষ-কোষ ০° সেঃ তাপমাত্রায়ও বিভাজনরত থাকে। তবে এ ধরনের কোষের বিভাজন-ক্রিয়া উল্লিখিত তাপমাত্রায় সম্পন্ন হতে কত সময়ের দরকার সে বিষয়ে আমাদের জানা আছে খুবই কম। উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীতে কোষসমূহের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা কম। প্রাণীর কোষের বিভাজন-প্রক্রিয়া ২৪° সেঃ-এর নীচে ও ৪৬° সেঃ-এর উপরে বন্ধ হয়ে যায়।

কোষ-বিভাজনের তাৎপর্য

কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া অবশ্যই বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অংশ। কোষ-বিভাজন নাটকের মুখ্য দৃশ্য হল ক্রোমোজোমের নৃত্য, বেম গঠন এবং অপত্য কোষ সৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোষ, এর বাইরে থেকে পাওয়া উপাদানের আত্তীকরণ ঘটায় এবং এসব উপাদনকে ভেঙে সংশ্লেষিত করে কোষীয় উপাদানে পরিণত করে। তদুপরি শক্তিও ব্যয় করে। এসময়ে কোষের প্রবৃদ্ধিও ঘটে, অর্থাৎ কোষ আকারে বড় হয়। নিষিক্ত ডিম্বকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। নূতন এই কোষ দুটি ডিম্বকোষ বা মাতৃকোষের আকারের তুলনায় অর্ধেক আকারবিশিষ্ট হয়ে থাকে। আবার নূতন প্রতিটি কোষ দুটি কোষে পরিণত হয় অর্থাৎ শেষাবধি মাতৃকোষ থেকে মোট চারটি কোষের জন্ম হয়। চারটি কোষের প্রতিটি মাতৃকোষের আকারের তুলনায় এক চতুর্থাংশ আকারবিশিষ্ট হয়। উল্লিখিত ঘটনাটি ডিম্বকোষ ছাড়া অন্য কোন কোষে সংঘটিত হয় না (কোষ বিভাজিত হয় বটে কিন্তু অপত্য কোষ মাতৃকোষের অর্ধেক আকারবিশিষ্ট হয় না — অনু)। কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়াও সাধারণত অত সোজা পথে হয় না। দেহের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় কোষসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাজনই একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। পরবর্তী বিভাজন ক্রিয়া শুরু হবার আগে কোষকে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হয়।

banglainternet.com

দেহের বৃদ্ধিতে বিভাজন প্রক্রিয়ার অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রক্রিয়া অবিরাম সমরূপ কোষ সৃষ্টির গ্যারান্টি দেয়। বিবিধ গুণাগুণ সম্বন্বিত ও

ক্ষমতাসম্পন্ন অবিন্যস্ত কোষসমূহ পুনর্জননে রত হলেই শুধু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমপ্রকৃতির কোষ-বিভাজনের ফলেই দেহের সুসংগঠিত বৃদ্ধি সম্ভব। এ ধরনের কোষঘটিত বৃদ্ধিকে প্রজাতি স্বীয় প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অন্যথায় প্রজাতি অস্তিত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ক্রোমোজোম একটি জটিল জাল যা নিউক্লিয়েইক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা নির্মিত। নিউক্লিয়াস কোষের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু নিউক্লিয়াসের প্রায় সম্পূর্ণটাই ক্রোমোজোমে পূর্ণ। সুতরাং, ক্রোমোজোমই কোষের বিপাক-ক্রিয়া এবং এর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেরও নিয়ন্ত্রক। ফলে, দুটি কোষকে পরস্পরের অনুরূপ আচরণ যদি প্রদর্শন করতে হয় তাহলে কোষ দুটিতে সমপরিমাণ নিউক্লিয়েইক এসিড ও প্রোটিন থাকতে হবে। ক্রোমোজোমের দীর্ঘ প্রতিলিপি সৃষ্টির মাধ্যমে সমরূপী দুটি ক্রোম্যাটিড গঠন এবং বিভাজন প্রক্রিয়ার তৃতীয় দশায় ক্রোম্যাটিডের বিচ্ছিন্ন হয়ে মেরুতে গমন ইত্যাদি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সম্পন্ন হতে হয়। যে প্রকারের কোষ-বিভাজনের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে এই সূক্ষ্ম কৌশলই অবলম্বিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট একটি প্রজাতির জন্ম থেকে অদ্যাবধি কোন বিভাজনের উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় এক চুল এদিক সেদিক হবার জো নেই। এ ব্যাপারটি আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। অবশ্য এতে বিপত্তি দেখা দেয় এবং প্রজাতির বিবিধায়নও ঘটে। প্রজাতিকূলের ক্রমবিকাশের কারণে এ রকমটি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপেক্ষিক অর্থে এ সব ঘটনার সংখ্যা নিতান্ত কম।

এবার অন্য একটি প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়। কোষ বিভাজিত হয় কেন? অথবা উল্টোভাবে প্রশ্ন তোলা যায় যে কেন পুনর্জনন রত কোষে বিভাজন বন্ধ হয়? একটি কোষ, যেমন এমিবার কথাই ধরা যাক। এমিবা একটি নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হলে তখন এর বিভাজন ঘটে। যদি একে উপোস রাখা হয় তখন এর দেহ সংকুচিত হয়ে যায় এবং এর বিভাজনও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এর থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়ে যে, কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া, কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণে সুষ্ঠু স্থির অনুপাত রক্ষার একটি প্রয়াস মাত্র। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে; যদি নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ন্ত্রকও হয় তবু সমুদয় সাইটোপ্লাজমের উপর এর কর্তৃত্ব নেই। তবে সাইটোপ্লাজমের কতিপয় অংশের উপর নিউক্লিয়াসের সফল নিয়ন্ত্রণ থাকে। যদি সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়িয়ে যায় তখন নিউক্লিয়াসের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকে।

যেমন এমিবার সাইটোপ্লাজমের বাড়ন্ত অংশকে প্রতিদিন কেটে রেখে নিউক্লিয়াসও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত স্থির রাখা হলে এমিবার বিভাজন বন্ধ থাকে। তবু, যেভাবে বিষয়টিকে উপস্থিত করা হল, তাতে সমস্যার সমাধান পাওয়া সহজ নয়। যদি সক্রিয় বিভাজনরত এমিবার নিউক্লিয়াসকে নিষ্ক্রিয় এমিবার দেহে ঢোকানো হয় (নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ক্ষতি না করে অণু-নলের সহায়তায় ঢোকানো সম্ভব) তাতেও নিষ্ক্রিয় এমিবার দেহে কোষ-বিভাজন হয় না যতক্ষণ না এর সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস যৌথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ না করে। কোষের পরিপক্ক অবস্থা বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই তা অনেকটা অনিশ্চিত, কিন্তু সুসংগঠিত যে কোন পন্থায় কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার পূর্বে কোষের উপরিবর্ণিত দু'অংশকে অবশ্যই প্রস্তুতি-পর্ব সেরে নিতে হয়।

ভিন্ন দৃষ্টিতে, কোষ-বিভাজন একটি বাঁচার প্রক্রিয়া। কোষ-বিভাজিত না হলে শেষাবধি এটি মরে যায়। বহুকোষী জীব কোন না কোন উপায়ে এর অঙ্গসমূহকে বিভাজিত করে নূতন জীবের জন্ম দিতে পারলে অবশ্যই মরে যাবে। যাহোক, কোষ-বিভাজনের সাথে দেহের বৃদ্ধির সম্পর্ক জড়িত। বৃদ্ধির পরে আবার কোষের বিভাজন ঘটে। ফলে, কোষে নূতন উপাদানের সমাবেশ ঘটে। কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া এভাবে কোষের বার্ধক্য রোধ করে এবং একে অমরত্ব দান করে। অন্যদিকে, বহুকোষী জীবের দেহে কোষ-বিভাজনের ফলে নূতন কোষের সমাবেশ ঘটে। সে সঙ্গে এসব কোষের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব বর্তে যেতে পারে। এভাবে দেখলে, কোষ-বিভাজনকে কোষ পৃথকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ বলে গণ করা যেতে পারে। পৃথকীকরণের বিষয়টি কিন্তু "বাঁচার প্রক্রিয়ার'র সাথে বৈপরীত্য ঘোষণা করে। কারণ, পৃথকীকরণের এই পদক্ষেপ মৃত্যুরই সংকেত ঘোষণা করে। যেহেতু, পৃথকীকৃত কোষসমূহ বিভাজিত হবার ক্ষমতা হারায়। তাহলে, কোষ বিভাজনের গুরুত্ব শুধুমাত্র এর প্রক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভরশীল নয়। কি প্রকারের কোষ বিভাজিত হয় এবং জীবদেহে এর ফল কি এর উপরও বিভাজনের গরুত্ব নির্ভর করে।

banglainternet.com banglainternet.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিয়োসিস ও যৌন প্রজনন

যে কোন প্রজাতি — মানুষ বা এমিবা, ওক গাছ বা ব্যাকটেরিয়ার অবিরাম অস্তিত্ব স্ব স্ব জীবের ছেদহীন উত্তরাধিকারের উপর নির্ভরশীল। কোন জীব অমর নয়। কাজেই যে কোন গোষ্ঠীর জীবসমূহকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই প্রজনন-কার্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। এমিবার মতো এককোষী জীবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া এই কাজটি সম্পন্ন করে। এটাও একটি প্রজননের ধরন যার মাধ্যমে অবিরাম নূতন জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেহেতু মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত অপত্যকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মূল কোষ বা মাতৃকোষের সমসংখ্যক থাকে, সেহেতু মাইটোসিস ক্রিয়ার সৃষ্ট সব অপত্য এমিবার ক্রোমোজোমের সংখ্যা আদি এমিবার ক্রোমোজোমের সংখ্যার সমান থাকবে।

অবশ্য এমিবা অনেক এককোষী এবং কতিপয় বহুকোষী জীবের মত অযৌন পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটায়। এমিবা জননকোষ, যথা ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদন করে না। কিন্তু অন্যান্য এককোষী এবং অধিকাংশ বহুকোষী জীব যৌন উপায়ে প্রজনন ঘটায়। এদের জীবনচক্রের কোন এক পর্যায় এরা জননকোষ (যে কোন ধরনের যৌন কাজে নিরত কোষকে জননকোষ নামে অভিহিত করা হয়) উৎপাদন করে। দুটো জননকোষ (পুং ও স্ত্রী-অনু) একত্রে মিলিত হয়ে একটি নূতন কোষের জন্ম হয়। কোষটির নাম জাইগোট (zygote) বা নিষিক্ত ডিম্বাণু। জননকোষের এই মিলনকে নিষেক (fertilization) বা গর্ভাধান (syngamy) বলা হয়।

এটি বেশ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, যখন দুটি জননকোষ নিষেকের মাধ্যমে মিলিত হয় তখন উভয় কোষস্থিত নিউক্লিয়াস দুটির একীভূত হয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে মুখ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। দুটি নিউক্লিয়াসের একীভবনের ফলে কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত হয় সেটি বিবেচনা করা যাক। উদাহরণস্বরূপ, মানবদেহের কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ৪৬টি (চিত্র ৬.১)। এ মুহূর্তে আমরা যদি ধরে নেই যে মানবদেহে শুধুমাত্র মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে, তাহলে এর প্রতিটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণুতে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকবে। কারণ, উক্ত মানবদেহের প্রতিটি মূল কোষ নিষিক্ত ডিম্বাণুর বিভাজনের মাধ্যমে উপযুক্ত সংখ্যক ক্রোমোজোম অর্জন করে থাকে। এখন, আলোচ্য ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিষেক ঘটলে নিষিক্ত ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯২। এই নিষিক্ত

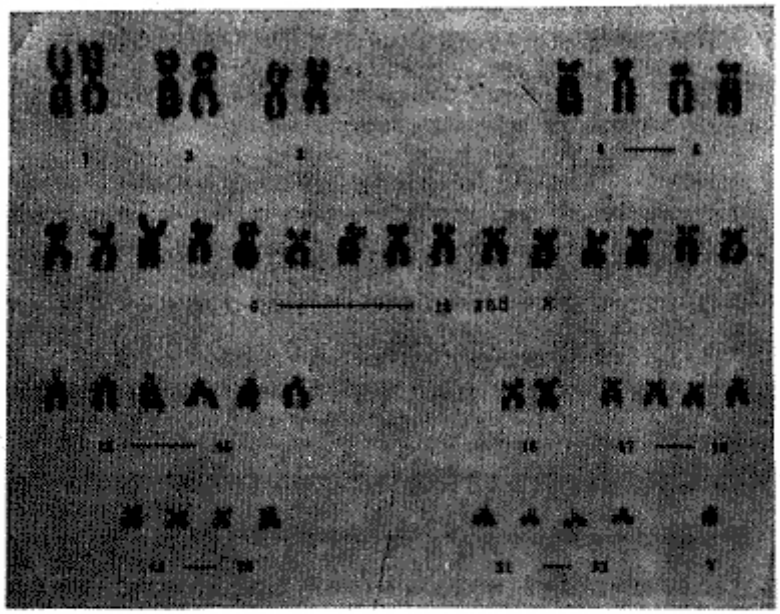

চিত্র ৬.১ ঃ স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমসমূহকে জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত দেখা যাচ্ছে। জোড়া ক্রোমোজোম দুটি পরস্পরের অনুরূপ। আকার অনুযায়ী এগুলের নাম্বার দেওয়া হয়েছে। পুরুষে লিংগ নির্ধারণী xy ক্রোমোজোম থাকে। চিত্রের নীচে ডানে y-ক্রোমোজোমকে দেখা যাচ্ছে। x-ক্রোমোজোম কোন্‌টি বলা মুশকিল। তবে শেষোক্ত ক্রোমোজোমটি দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে। মেয়েমানুষে xx-ক্রোমোজোম থাকে, y-ক্রোমোজোম থাকে না। y-এর স্থলে X-ক্রোমোজোম থাকে।

সৌজন্য ঃ Dr. Barbara Migeon

ডিম্বাণু-সৃষ্ট মানবদেহের ডিম্বাণু ও শুক্রাণুতে একইভাবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হবে ৯২। ৯২-টি ক্রোমোজোমবিশিষ্ট ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিষেকের মাধ্যমে যে মানবদেহের সৃষ্টি হবে এর প্রতি কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ১৮৪-তে দাঁড়াবে। এভাবে দশম বংশধরের প্রতি কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হবে ২৩,৩৩২টি।

banglainternet.com

অবশ্যই, এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে তা শেষাবধি হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করবে। চিত্রে (৬.১) শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে, যৌন-প্রজননে সৃষ্ট জীবসমূহে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে প্রাপ্ত ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধি অনির্দিষ্টভাবে চলতে পারে না। প্রতিটি জীবের জীবনচক্রের যে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার ক্ষতিপূরক প্রক্রিয়ার কারণে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায়। যেহেতু আমরা জানি যে একই প্রজাতির অন্তর্গত প্রতিটি জীবের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে স্থির থাকে। যেমন, স্বাভাবিক মানবদেহে ক্রোমোজোমের সংখ্য ৪৬, ভুট্টায় ২০, ছুঁছোয় ৪০ এবং ইঁদুরে ৪০। সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে গোলকৃমিতে। গোলকৃমিতে যেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র দুই সে ক্ষেত্রে কোন কোন প্রাণী ও উদ্ভিদে এই সংখ্যা কয়েকশ ছাড়িয়ে যায়। প্রত্যেক প্রজাতিতে বংশপরম্পরায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্থির থাকে। সুতরাং জননকোষে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা অন্যান্য দেহকোষের তুলনায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হওয়া চাই। (উল্লেখ্য, নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষসমূহ বিভাজিত হয়েই দেহে কোষসমূহের সৃষ্টি হয়)। যে বিশেষ ধরনের কোষ-বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটে, একে বলা হয় মিয়োসিস (meiosis) কোষ-বিভাজন। এই পদ্ধতির কোষ-বিভাজনের মূল কথা হল — **এতে নিউক্লিয়াস দুবার বিভাজিত হয় কিন্তু ক্রোমোজোম বিভাজিত হয় মাত্র একবার।**

মিয়োসিস সম্পর্কে বিশদ আলোচনার আগে এবং মাইটোসিস প্রক্রিয়ার সাথে এর স্বাতন্ত্র্য ও এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করার পূর্বে আমাদেরকে কতিপয় অভিধার সাথে পরিচিত হতে হয়। এতে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন পর্যায়কে সহজে বোঝার সহায়ক হবে। জননকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমকে **হ্রাসপ্রাপ্ত, জনন-কৌষীয়, অর্ধগুণী** বা **n-সংখ্যক** ক্রোমোজোম বলা হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু এবং মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোষের ক্রোমোজোমকে **অহ্রাসপ্রাপ্ত, নিষিক্ত ডিম্বাণুস্থিত, দ্বিগুণী** বা **২-n সংখ্যক** ক্রোমোজোম বলা হয়। যেমন নিষেকের আগে মানুষের একটি ডিম্বাণুতে ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে। অথচ নিষিক্ত ডিম্বাণুতে থাকে ৪৬টি ক্রোমোজোম। উপরন্তু, ৪৬টি ক্রোমোজোমের সব কটি স্বতন্ত্রভাবে পরস্পর থেকে আলাদা নয়। ৪৬টি ক্রোমোজোম ২৩ জোড়ায় অবস্থান করে। প্রতি জোড়ার দুটি ক্রোমোজোম আকৃতি, আকার ও বংশগতির চারিত্র্য বিচারে পরস্পরের সদৃশ। অর্থাৎ প্রতি জোড়ার ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের **অনুরূপ** কিন্তু অন্য জোড়ার চেয়ে

banglainternet.com

আলাদা। নিষিক্ত ডিম্বাণুর প্রতি জোড়া অনুরূপ ক্রোমোজোমের একটি আসে শুক্রাণু থেকে এবং জোড়ার অপর ক্রোমোজোমটি আসে ডিম্বাণু থেকে।

অনুরূপ জোড়-ক্রোমোজোমের মধ্যে আকৃতি ও আকারের পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র একটি জোড়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। ব্যতিক্রমী এই জোড়াটি লিঙ্গ নির্ধারণ করে। ৬.১ নং চিত্রে পুরুষ মানুষের এই একজোড়া ক্রোমোজোমকে দেখানো হয়েছে। 'x' ও 'y' ক্রোমোজোম যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী-লিঙ্গ নির্ধারণ করে। মেয়েমানুষের লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোজোম জোড়া হল 'xx'। এই জোড়ার দুটি ক্রোমোজোমই পরস্পরের অনুরূপ। পুরুষ মানুষের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম জোড়া হল 'xy'। শেষোক্ত জোড়ার ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের অনুরূপ নয়।

মিয়োসিস পদ্ধতির কোষ-বিভাজন বরং বেশ জটিল। যদিও লক্ষণীয় যে, মাইটোসিসের নিউক্লিয়াসের মতো এর নিউক্লিয়াসও একই ধরনের আচরণ প্রদর্শন করে। যে কোন একটি জীবের মিয়োসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করলেই যথেষ্ট। কারণ, একটি ছত্রাক, একটি পতঙ্গ, একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ বা মানুষ জাতীয় প্রাণী সবার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একই ধরনের। পুং-স্ত্রী উভয় লিঙ্গেও প্রক্রিয়াটি একই, তবে ভিন্ন লিঙ্গে ভিন্ন টাইপের কোষের সৃষ্টি হয় (যেমন পুং-এর ক্ষেত্রে শুক্রাণু আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে — ডিম্বাণু-অনু)।

মিয়োসিসের বিবিধ দশা

মাইটোসিসের মতো মিয়োসিসকেও (চিত্র ৬.২, ও চিত্র ৬.৩) কয়েকটি দশায় বিভক্ত করা যায়। অবশ্য, মিয়োসিসের প্রথম দশা শেষ হতে সময় মাইটোসিসের প্রথম দশার তুলনায় অনেক বেশী লাগে। এই দশাকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়। মিয়োসিসের প্রথম দশা মাইটোসিসের প্রথম দশার চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক গভীর তাৎপর্যবহ।

লেপটোটিন স্তর মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ার সূচনা করে। মিয়োসিস প্রক্রিয়াধীন কোষ এবং এর নিউক্লিয়াস চতুষ্পার্শ্বস্থ কলাসমূহের কোষ ও কোষের নিউক্লিয়াসের চেয়ে বড়। মাইটোসিস প্রক্রিয়ার কোষের দ্বিগুণী ক্রোমোজোমের তুলনায় মিয়োসিস প্রক্রিয়ার কোষের দ্বিগুণী ক্রোমোজোম সরু ও দীর্ঘ। ফলে, এসবকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা কষ্টকর। লেপটোটিনের ক্রোমোজোম অবশ্য মাইটোসিসের প্রথম দশার

banglainternet.com

মিয়োসিসের বিবিধ দশা

চিত্র ৬.২ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োসিস-এ কোষ বিভাজনের নক্‌শা। বোঝার সুবিধার জন্য এখানে একজোড়া ক্রোমোজোম নেওয়া হয়েছে। জোড়ার ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের অনুরূপ।

(M. N. Rhoades, *Journal of Heredity 41, 1950, 59-7*)

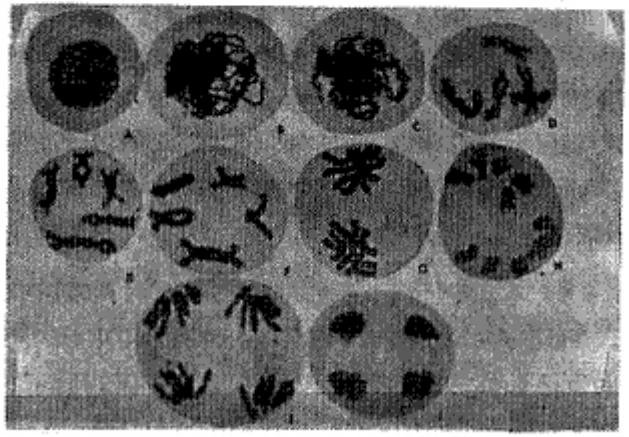

চিত্র ৬.৩ ঃ *Trillium*-এ মিয়োসিসের বিভিন্ন দশা ; (ক) জাইগোটিন ; (খ) প্যাকাইটিন ; (গ) প্রারম্ভিক ডিপ্লোটিন ; (ঘ) অন্তিম ডিপ্লোটিন ; (ঙ) ডায়্যাকাইনেসিস (চ) দ্বিতীয়া দশার, প্রথম পর্যায় (১) (ছ) অন্তিম এনাফেজের প্রথম পর্যায় (১) (জ) দ্বিতীয় দশার দ্বিতীয় পর্যায় (২) (এই গাছে প্রথম দশার দ্বিতীয় পর্যায় থাকে না) (ঝ) এনাফেজের দ্বিতীয় পর্যায় (২) (ঞ) চার-নিউক্লিয়াস পর্যায়। এতে চারটি মাইক্রোস্পোর থাকে। (সৌজন্য ঃ Dr. A. H. Sparrow)

ক্রোমোজোমের সাথে দুটি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে। যেমন প্রথমত এর ক্রোমোজোমসমূহকে দীর্ঘ জোড়-সূত্রের মতো দেখার বদলে একটি দীর্ঘ সুতোর মতো

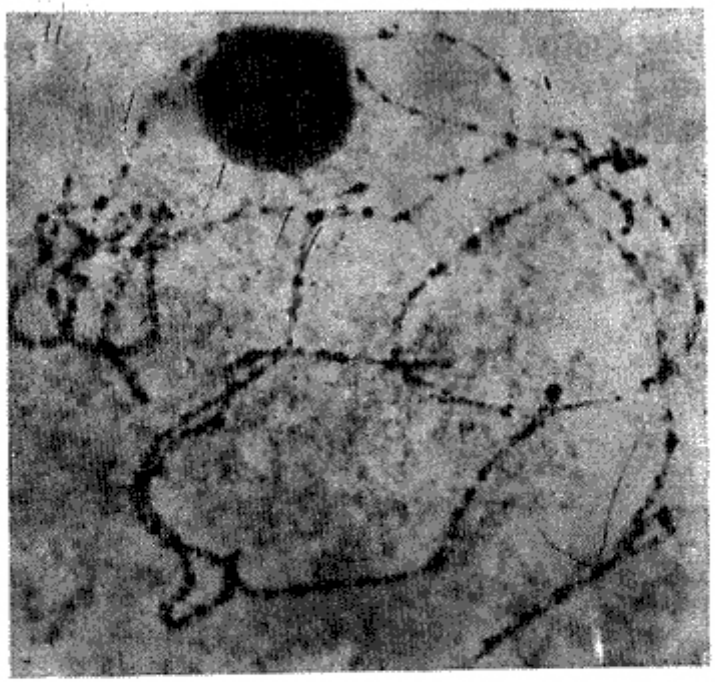

চিত্র ৬.৪ ঃ *Luzula* গাছের মিয়োসিসের প্রথম দশার প্যাকাইটিন স্তর। এতে জোড়বদ্ধ অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয়ে অসংখ্য ক্রোমোমেয়ার এবং ক্রোমোজোম সংলগ্ন নিউক্লিয়াসকে দেখা যাচ্ছে।

(সৌজন্য ঃ Dr. S. Brown)

দেখায়, দ্বিতীয়ত, এর ক্রোমোজোমসমূহের আকৃতি অধিকতর নির্দিষ্ট এবং সারি সারি ঘন দানাদার ক্রোমোমেয়ার-এর সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে কিছুদূর পর পর অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে। যে কোন জীবে ক্রোমোমেয়ারসমূহ সংখ্যা, আকার ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। ফলে, এ-সবের সহায়তায় নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমকে শনাক্ত করা যায়। স্থলপদ্মের ২৪ জোড়া ক্রোমোজোমে ২০০০ ক্রোমোমেয়ার আছে বলে অনুমিত হয়। কিন্তু *Luzula* নামক গাছে এসবের সংখ্যা অনেক কম (চিত্র ৬.৪)।

ক্রোমোজোমের নড়াচড়া শুরু হলে জাইগোটিন স্তরের সূচনা হয়। ক্রোমোজোমসমূহের মধ্যে আকর্ষণের ফলে এই নড়াচড়া শুরু হয়। এই আকর্ষণী শক্তি

banglainternet.com

দুটি অনুরূপ ক্রোমোজোমকে পরস্পরের কাছে টানে। অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয়ের জোড়বদ্ধ (pairing) হওয়াকে সিন্যাপসিস বা ক্রোমোজোম-যোজক স্থাপন বলা হয়। এই যোজন প্রথমে এক বা বহু জায়গায় ঘটে এবং এভাবে ক্রমশ অধিকমাত্রায় যোজিত হয়ে সোয়েটারের চেইনের মতো ক্রোমোজোমদ্বয় সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে পরস্পর লেগে থাকে। যোজন কর্মটি এলোমেলোভাবে সংগঠিত হয় না। একটি ক্রোমোজোমের ক্রোমোমেয়ারসমূহ অপর ক্রোমোজোমের সদৃশ ক্রোমোমেয়ারের সাথে যোজিত হয় (চিত্র ৬.৫)। যোজন কার্য শেষ হলে নিউক্লিয়াসটিকে n-সংখ্যক বা অর্ধগুণী ক্রোমোজোমবিশিষ্ট বলে মনে হয়। অবশ্য এই n-সংখ্যক ক্রোমোজোম দুটি অনুরূপ

চিত্র ৬.৫ : *Lilium regate* গাছের মিয়োসিসের জাইগোটিন স্তর। চিত্রের নীচে, ডানপাশের কোনায় অনুরূপ জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোমের যোজিত ও অযোজিত অঞ্চল দেখা যাচ্ছে।
(সৌজন্য : Dr. J. Macleish)

ক্রোমোজোমের সমাবেশের ফলে যে গঠিত হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ধরনের জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোমকে বাইভ্যালেন্ট (bivalent) বা দ্বিযোজী বলা হয়ে থাকে।

যদি জাইগোটিন স্তরকে সক্রিয় যোজন-কাল বলে ধরা হয় তবে পরবর্তী প্যাকাইটিন (pachytene) স্তরকে ক্রোমোজোমের সুস্থিত-কাল (stable period) বলা যায়। এই স্তরে দ্বিযোজীর ক্রোমোজোমদ্বয়কে সহজে দেখা যায় (চিত্র ৬.৪) এবং যেহেতু ক্রোমোজোম এ-সময় পুরু ও খাটো হয়ে ওঠে সেহেতু একটাকে অপরটা

থেকে আলদাভাবে খুব তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। অণুবীক্ষণযন্ত্রের উচ্চ বিবর্ধনে ক্রোমোমেয়ারসমূহ এবং নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম সংলগ্ন নিউক্লিয়াসকেও দেখা যেতে পারে (চিত্র ৬.৪ ও চিত্র ৬.৬-ক)।

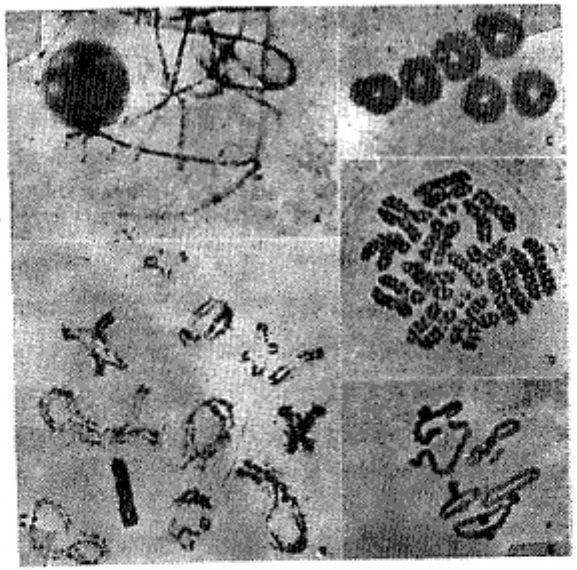

চিত্র ৬.৬ : বিভিন্ন জীবে মিয়োসিসের কতিপয় দশা,

(ক) ভুট্টায় প্যাকাইটিন স্তরে ক্রোমোজোম-৬ এবং এর সংলগ্ন নিউক্লিয়াস, জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোম এবং এর শনাক্ত করা যায় এমন অঞ্চলসমূহকে সংখ্যার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। (B. McClintlock, Zeitschr. Zelif, u. Mikr, Anat, 21 : 294-328, 1934)

(খ) পুং ঘাস ফড়িংয়ের (*Schistocerca gregaria*) ডিপ্লোটিন স্তর। এতে ঘন রঙে রঞ্জিত রডের ন্যায় জোড়হীন X-ক্রোমোজোম দেখা যায়। অন্যদিকে অনুরূপ জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোমে কিয়জমাও দেখা যাচ্ছে।
J. J. Tijo and A. Levan, Ana. East. Exp. Aula Dei. 3, 2 : 225-228, 1954).

(গ) *Tradescantia*-র দ্বিতীয় দশা-১-এ ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগে কিয়জমার অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(ঘ) Tradescantia তৃতীয় দশা -১-এ ক্রোমোজোমসমূহকে প্যাচালো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

(ঙ) Tradescantia-র দ্বিতীয় দশা-১-এ কিয়জমাকে হটারস্টিশিয়াল অবস্থানে দেখানো হয়েছে। c-চিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

banglainternet.com

যোজকের আকর্ষণী শক্তি রহিত হলে অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। এখানেই প্যাকাইটিন স্তরের শেষ বলা যায়। এরপর ডিপ্লোটিন স্তরের শুরু। এই স্তরে প্রতি ক্রোমোজোমে দুটি ক্রোম্যাটিড (চিত্র ৬.৬ খ) দেখা যায়। সুতরাং দ্বিযোজীতে চারটি ক্রোম্যাটিড থাকে। এই স্তরের আগে সেন্ট্রামেয়ারের অঞ্চল ব্যতীত প্রতিটি ক্রোমোজোম অনুদৈর্ঘ্যভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য, দ্বিধাবিভক্ত হবার ঘটনাটিকে ক্রোমোজোমদ্বয়ের মধ্যেকার আকর্ষণী শক্তি লোপ পাবার আগে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয়ের বিচ্ছিন্নকরণ তখনও শেষ হয় না। ক্রোমোজোমদ্বয়ের দৈর্ঘ্য জুড়ে এক বা বহু অংশে এরা পরস্পর যুক্ত থাকে। অংশসমূহের সংযুক্তিকে কিয়জমা গঠন (chiasma formation) বলা হয়। (এক বচনে কিয়জমা ও বহুবচনে কিয়জম্যাটা)। অনুরূপ ক্রোমোজোম জোড়ার প্রতিটির ক্রোম্যাটিডদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যেকার অংশ বিনিময়ের ফলে কিয়জমার সৃষ্টি হয়। এই অধ্যায়ের শেষে কিয়জমার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। কারণ, বংশগতির চারিত্র্য নির্ধারণে এর বিশেষ ভূমিকা থাকে।

যখন মাত্র একটি কিয়জমা গঠিত হয়, তখন ডিপ্লোটিন স্তরের দ্বিযোজীটিকে ক্রশ (×) চিহ্নের মতো দেখায় (চিত্র ৬.৬ খ)। দুটি কিয়জমা এবং তিনটি বা অধিক কিয়জমার ক্ষেত্রে দ্বিযোজীকে যথাক্রমে বলয়াকার এবং ফাঁসের মতো দেখায়। বিবিধ কোষে কিয়জম্যাটার সংখ্যা ও আনুমানিক অবস্থান স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমনকি অনুরূপ দ্বিযোজীতেও এই পার্থক্য দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ ক্রোমোজোমে খাটো ক্রোমোজোমের চেয়ে বেশী কিয়জমা গঠিত হয়। কিন্তু একেবারে খাটো ক্রোমোজোমেও অন্তত একটি কিয়জমা অবশ্যই গঠিত হয়ে থাকে।

ডিপ্লোটিন স্তরের পর শুরু হয় ডায়্যাকাইনেসিস (diakinesis) স্তর। কিন্তু এ দুটো স্তরের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদরেখা টানা যায় না। এই স্তরে নির্দিষ্ট দ্বিযোজী সংলগ্ন নিউক্লিওলাসটি দ্বিযোজী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায় তদুপরি এ স্তরে দ্বিযোজীসমূহ বেশ সংকুচিত হয়ে (চিত্র ৬.৩ চ) পড়ে। যতই দ্বিযোজী সংকুচিত হতে থাকে ততই কিয়জমার বাঁধন আলগা হতে শুরু করে। ফলে কিয়জমা মুল অবস্থান থেকে সরে ক্রমশ ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রথম দশার লেপ্‌টোটিন স্তর থেকে পরবর্তী স্তরসমূহে ক্রোমোজোম যে খাটো হতে থাকে তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সৃষ্ট প্যাঁচই ক্রোমোজোমকে খাটো হতে সাহায্য করে। ক্রোমোজোমের পরিধি বাড়তে থাকলে প্যাঁচের সংখ্যাও ক্রমশ কমতে শুরু করে। মাইটোসিসে যে প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম খাটো হয়ে থাকে মিয়োসিসেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম খাটো হয়ে থাকে। মিয়োসিসে প্যাঁচসমূহকে অবশ্য খুব সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিশেষ করে কোষে রঞ্জক ব্যবহারের পূর্বে এমোনিয়া বাষ্প বা তরল সাইয়ানাইড দ্রবণ ব্যবহার করলে এসব অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৬.৬ ঘ চিত্রে *Tradescantia*-র প্যাঁচসমূহকে দেখানো হয়েছে।

নিউক্লিয়াস-ঝিল্লীর ভাঙন ও বেমের উদ্ভব প্রথম দশার সমাপ্তি ঘোষণা করে ও দ্বিতীয় দশা ১-এর পত্তন ঘটায় (চিত্র ৬.৬ গ এবং ঙ)। দ্বিযোজীসমূহ তখন বেমে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু মাইটোসিসের মতো এখানে সব সেন্ট্রোমেয়ার নিরপেক্ষ অঞ্চলে বিন্যস্ত থাকে না। বরং প্রতিটি দ্বিযোজী এমনভাবে অবস্থান নেয় যাতে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমেয়ার নিরপেক্ষ অঞ্চলে যে কোন পাশে, এর সমদূরবর্তী অংশে থাকতে পারে। এ ধরনের অবস্থানকে ভারসাম্য রক্ষামূলক অবস্থান বলা যায়।

ক্রোমোজোমের মেরুমুখী ধাবিত হবার সাথে মিয়োসিসের তৃতীয় দশা এক-এর সূত্রপাত হয়। (চিত্র ৬.৩ ছ)। প্রতিটি দ্বিযোজীর সেন্ট্রোমেয়ার দুটি অবিভাজিত থাকে এবং ক্রোমোজোমের মেরুমুখী ধাবিত হবার কারণে এর অবশিষ্ট কিয়জমা শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রোমোজোমসমূহ বেমের মেরুতে গিয়ে স্থিত হলে দেখা যায় যে বেমের উভয় মেরু বা অর্ধগুণী বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, এক্ষেত্রে মাইটোসিসের তুলনায় পার্থক্য আছে। মাইটোসিসের মেরুতে যে সকল ক্রোমোজোম জমা হয় সে সবের প্রতিটি দীর্ঘ একটি রজ্জুর মতো। কিন্তু মিয়োসিসের প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি ক্রোম্যাটিড থাকে। ক্রোমোজোমের ক্রোম্যাটিডদ্বয় শুধু সেন্ট্রোমেয়ার দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। এরপর উভয় মেরুতে নিউক্লিয়াস গঠিত হয়, ক্রোমোজোমের প্যাঁচ খুলে যায় এবং জননকোষটি একটি ঝিল্লীর প্রাচীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়। শেষোক্ত ব্যাপারটি চতুর্থ দশার এক-এর স্তরে ঘটে থাকে।

প্রজাতিভেদে প্রাক-দশা ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাক-দশা একেবারেই থাকে না। প্রাক-দশার পর অর্ধগুণী বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী কোষ

banglainternet.com banglainternet.com

দুটি দ্বিতীয় দশা–২–এ প্রবেশ করে (চিত্র ৬.৩)। প্রাক–দশার অনুপস্থিতে ক্রোমোজোম চতুর্থ দশা–১ থেকে সরাসরি আকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়াই প্রথম দশা–২–এ উত্তীর্ণ হয়। যদি প্রাক–দশা থাকে তাহলে নিউক্লিয়াসের ঝিল্লী গঠিত হয়, ক্রোমোজোমের প্যাঁচ খুলে এবং প্রথম দশার ২য় স্তর দীর্ঘস্থায়ী হয়। যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় দশার–২–এ স্তরে উত্তীর্ণ ক্রোমোজোমসমূহ পূর্ববর্ণিত তৃতীয় দশার ক্রোমোজোমের মতোই থেকে যায় অর্থাৎ এর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। আরো স্পষ্ট বলতে গেলে, দ্বিতীয় দশার–২–এর স্তরের আগে প্রাক দশায় ক্রোমোজোম দ্বিধাবিভক্ত হয় না এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমেয়ার অবিভক্ত থাকে। তৃতীয় দশার–২–এ দুটি কোষ দুটি বেম গঠিত হয় এবং ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমেয়ার বিভক্ত হয় ও ক্রোমাটিড দুটি পরস্পর বিপরীত মেরুমুখী ধাবিত হয়। চতুর্থ দশা–২–এ উভয় কোষে দুটি করে নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। ফলে, দুই কোষের চারটি নিউক্লিয়াস n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী হয়ে থাকে। এরপর সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে এক একটি নিউক্লিয়াসধারী চারটি অপত্য কোষের জন্ম দেয়।

মিয়োসিস প্রক্রিয়ার ঘটনা-প্রবাহের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, ডিপ্লোটিন স্তর থেকে দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের শেষ পর্যন্ত ক্রোমোজোমের অনুদৈর্ঘ্য গঠন অপরিবর্তিত থাকে। প্যাকাইটিন স্তর বা এরও আগে প্রতিটি ক্রোমোজোম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এরপর ক্রোমোজোম দু'বার বিভাজিত হয়। প্রথমে অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, বিচ্ছিন্ন হবার আগে ক্রোমোজোমদ্বয় যোজক শক্তির প্রভাবে দ্বিযোজীতে পরিণত হয়। ক্রোমোজোম বিচ্ছিন্ন হবার ফলে নূতন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়বারে প্রতি ক্রোমোজোমের ক্রোম্যাটিড দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে, দুটির স্থলে একটিমাত্র বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে ক্রোমোজোমসমূহের সংখ্যা হ্রাস পায় না কেন। এর কোন যুক্তিনির্ভর জবাব দেওয়া যায় না। কিন্তু একটি মাত্র মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়া যে সব প্রজাতির ক্ষেত্রে ঘটে সে সবে ক্রোমোজোমের পরিণতি কি বিবেচনা করা যেতে পারে। পুরুষ মৌমাছি স্বাভাবিকভাবে n–সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর জীবনচক্রে ক্রোমোজোম হ্রাসের প্রশ্ন ওঠে না। মৌমাছির শুক্রাণু সৃষ্টির সময় মাত্র একবার মিয়োসিস বিভাজন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আবার এই বিভাজন প্রক্রিয়া প্রথম মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ার মত না হয়ে দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ার মতোই হয়ে থাকে। যে সব জীবদেহ 2 n–সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী সেসবের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন-ক্রিয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে বংশগতির চারিত্র্য নির্ধারণে উল্লিখিত বিভাজন প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মত।

banglainternet.com

মিয়োসিসের অবদান

প্রাণিজগতে মিয়োসিস প্রক্রিয়া জননকোষ সৃষ্টি করে। জননকোষ দুধরনের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ক্রোমোজোমের অর্ধাংশ অর্থাৎ n–সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে। অবশ্য, উদ্ভিদজগতে জীবনচক্রের যে কোন পর্যায়ে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটতে পারে। বিভাজনের ফলে জননকোষ বা অযৌন স্পোর সৃষ্টি হতে পারে। এই সিরিজের* অন্য ভল্যুম উদ্ভিদ–জীবনচক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই ভল্যুমে মেরুদণ্ডী প্রাণীতে মিয়োসিস প্রক্রিয়ার অবদান অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বিষয়ক আলোচনাই স্থান পাবে।

চিত্র ৬.৭–এ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাশয়ের একটি সেকশন দেখানো হয়েছে। এতে য়ুসাইট (Oocyte) বা অপরিপক্ব ডিম্বানুর বিকাশের বিবিধ স্তর দেখা যাচ্ছে। এসবকে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম (germinal epithelium) থেকেও উদ্ভূত হতে দেখা যাচ্ছে। তদুপরি পরিপক্ব ডিম্বাণু নিষেকের আগে কিভাবে ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা–ও দেখানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, জার্মিনাল এপিথেলিয়াম বহিস্ত্বকের কোষ দ্বারা গঠিত হয়। জীবনের শুরুতে ডিম্বাণুসমূহ সৃষ্ট হয় এবং এরপর এসব সংখ্যায় বাড়ে না। মানুষ সহ পক্ষীকুল ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্ত্রী জাতির জীবেরা যখন প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে তখন এদের ডিম্বাশয়ে সীমিত সংখ্যক অপরিপক্ব ডিম্বাণু থাকে। মাতৃজঠরে মেয়েরা যখন ৫–৬ মাস বয়স্ক হয় তখন ওদের ডিম্বাশয় উল্লিখিত সংখ্যক অপরিপক্ব ডিম্বাণুর অধিকারী হয়। প্রসবের পর মেয়েদের ডিম্বাশয়ে পরিপক্ব ডিম্বাণুর মিয়োসিস বিভাজন-প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়া ডিপ্লোটিন স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সুতরাং মেয়েদের রজঃস্রাব ১২–৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। আনুমানিক এ সময়কালকে প্রথম ও শেষ ডিম্বাণু ত্যাগের সময়সীমা বলে গণ্য করা যায়। অপরাপর সময়ে য়ুসাইট বা অপরিপক্ব ডিম্বাণু কার্যত আকারে বড় হতে থাকে এবং এ সময় এতে পুষ্টি সঞ্চিত হতে থাকে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেও

banglainternet.com

* H. C. Bold, *The Plant Kingdom*, 2nd Ed. (Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1964).

এই সময় সীমা ওসবের প্রজননকালের আয়ুর উপর নির্ভর করে কিছুটা হেরফের হয়। কিন্তু মূল নীতি একই থাকে।

চিত্র ৬.৭ : স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাশয়ের সেকশান। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম থেকে উদ্ভূত হয়ে অপরিপক্ব ডিম্বাণুসমূহকে বিকাশের বিবিধ পর্যায় অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে। ডিম্বাণু আকারে বড় হয়ে ডিম্বাশয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে পড়ে যায়। শেষাবধি গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের প্রাচীর ছিঁড়ে এসব ডিম্বাণু বাইরে বেরিয়ে আসে।

একেবারে শুরুতে প্রাইমারি য়ুসাইট (primary oocyte) বা আদি অপরিপক্ব ডিম্বাণু জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের কাছাকাছি থাকে। পরে এসব আকারে বড় হয়ে ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে পড়ে যায়। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে অপরিপক্ব ডিম্বাণু ফলিকল কোষ (follicle cell) দ্বারা পরিবৃত হয়। ফলিকল কোষ সম্ভবত ডিম্বাণুকে যুগপৎ পুষ্টি ও নিরাপত্তা দান করে। ফলিকল কোষ পরিবৃত ডিম্বাণুকে সব মিলিয়ে গ্র্যাফিয়ান ফলিকল (graffian follicle) নামে অভিহিত করা হয়। পরিবৃত ও পরিবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সময় য়ুসাইট খাদ্য-উপাদান বা কুসুম নির্মাণে রত থাকে। এই খাদ্য-উপাদান আমিষ বা চর্বি জাতীয় হতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাণুতে খাদ্য-উপাদান সমস্ত সাইটোপ্লাজম জুড়ে কুসুম-স্ফটিক বা কুসুম-দানা (yolk spheres or yolk granules) হিসাবে ছড়িয়ে থাকে। ব্যাঙের ডিমের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই কুসুমে ভরা থাকে। শুধু একটি কোনায় সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসকে ঘিরে অবস্থান করে। সাইটোপ্লাজমের তুলনায় কুসুম যে মুরগীর ডিমে অতি-মাত্রায় বেশী থাকে তা সর্বজনবিদিত।

শেষাবধি, গ্র্যাফিয়ান ফলিকল ছিঁড়ে ডিম ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত হয়ে ডিম্বনালীতে আসে। ডিম্বানালীতেই ডিমের নিষেক হতে পারে। ইতোমধ্যে অবশ্য মিয়োসিস

banglainternet.com

প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রক্রিয়া শুরু করায় শুক্রাণু প্রভাব বিস্তার করে। ফলে একটি মাত্র সক্রিয় কোষের সৃষ্টি হয়। অপর তিনটি কোষ বা পোলার বডি (polar body) ঝরে পড়ে এবং নষ্ট হয়ে যায়। এই বিভাজন প্রক্রিয়া ক্রোমোজোমের সংখ্যাকে সার্থকভাবে হ্রাস করে বটে কিন্তু ডিমকে সাইটোপ্লাজম ও কুসুম পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে না। বলাবাহুল্য, ভ্রূণের বিকাশের জন্য সাইটোপ্লাজম ও কুসুম অপরিহার্য।

প্রাইমারী য়ুসাইটের প্রথম মিয়োসিস প্রক্রিয়া কোষ-ঝিল্লীর নিকটেই অনুষ্ঠিত হয়। একেবারে বাইরের নিউক্লিয়াস সামান্য সাইটোপ্লাজমসহ পোলার বডিরূপে

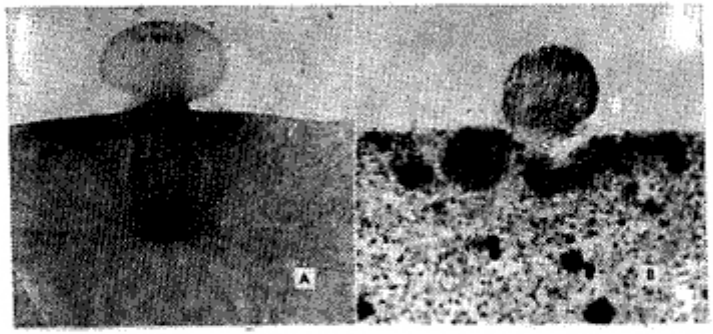

চিত্র : ৬.৮ Whitefish (*Coregonus*)-এর ডিমে পোলার বডি গঠনের দৃশ্য।
(A) প্রথম মিয়োসিস প্রক্রিয়ার তৃতীয় দশায় সৃষ্ট প্রথম পোলার বডি আলাদা হতে দেখা যাচ্ছে।
(B) দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দশা ; এতে দ্বিতীয় পোলার বডি তৈরী হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।
এর মধ্যে প্রথম পোলার বডি দ্বিভাজিত হতে পারে। ফলে তিনটি পোলার বডির সৃষ্টি হয় (গ্রন্থসত্ব General Biological Supply House, Inc., Chicago.)

আলাদা হয়ে যায় (চিত্র ৬.৮)। দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ায়ও অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি হয়ে আলাদা হয়। ইতোমধ্যে প্রথম পোলার বডিটি দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভাজিত হয়। ফলে, মোট পোলার বডির সংখ্যা দাঁড়ায় তিনে। n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী যে নিউক্লিয়াসটি ডিমে থাকে, একে স্ত্রী প্রাক নিউক্লিয়াস (female pronucleus) বলা হয়। স্ত্রী প্রাক-নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমে ডুবে থাকে এবং নিষেককালে শুক্রাণু বাহিত n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হবার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

banglainternet.com

শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস টিউবিউল্‌স্ (seminiferous tubules) বা শুক্রবাহী ক্ষুদ্র নালীতে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। শুক্রাশয় কলার প্রায় নব্বই ভাগই এসব ভাঁজ করা শাখা নালীতে পূর্ণ। প্রতিটি নালীর গাত্রে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম ও সারটোলি কোষ (germinial epithelium and sertoli cells) (চিত্র ৬.৯)

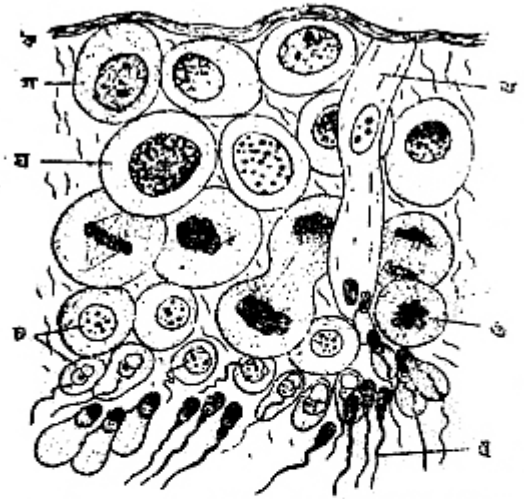

চিত্র ৬.৯ ঃ কোষের বিন্যাস এবং শুক্রবাহী নালীতে শুক্রাণুর ক্রমবিকাশের চিত্র ঃ
(ক) বেসমেন্ট-ঝিল্লী, (খ) সারটোলি কোষ ; (গ) শুক্রাণু মাতৃকোষ — এগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে শুক্রাণু কোষে পরিণত হয়, (ঘ) (ঙ) গৌণ শুক্রাণু কোষ ; (চ) শুক্রাণু (ছ) পরিপক্ব শুক্রাণু।

থাকে। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম থেকে শুক্রাণুর সৃষ্ট হয়। সারটোলি কোষকে 'শুক্রাণুর মাতৃকোষ' বলা হয়। এটি নবসৃষ্ট শুক্রাণুকে পরিপক্ব হওয়ায় সহায়তা দান করে বলে অনুমান করা হয়।

জার্মিনাল এপিথেলিয়ামে আদি মাতৃকোষাবাস বা স্পারম্যাটোগোনিয়া (spermatogonia) থাকে। স্পারম্যাটোগোনিয়া মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্পারম্যাটোগোনিয়া পরিপক্ব হয়ে মুখ্য মাতৃকোষ বা প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইটে (spermatocyte) পরিণত হয়। প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট প্রথম মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় গৌণ মাতৃকোষ বা সেকেণ্ডারি স্পারম্যাটোসাইটে (secondary spermatocyte) পরিণত হয়। সেকেণ্ডারি স্পারম্যাটোসাইটে দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ার দ্বারা চারটি কোষে পরিণত হয়। শেষোক্ত কোষসমূহের প্রাক-শুক্রাণু বা

স্পারম্যাটিড (spermatid) বলা হয়। এই কোষ লক্ষণীয়ভাবে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে স্বয়ংচল (motile) শুক্রাণুর রূপ ধারণ করে।

পরিপক্ব শুক্রাণুর একটি মাথা ও একটি পুচ্ছ থাকে। মাথা অতি ঘন নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। মাথা একটি ক্যাপ দ্বারা আবৃত থাকে। ক্যাপটির নাম এক্রোজোম (acrosome) চিত্র (৬.১০)। স্পারম্যাটিডের গলজি বডি থেকে ক্যাপটি গঠিত হয়

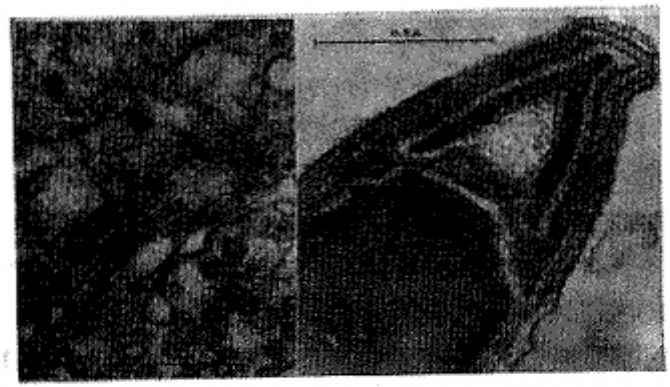

চিত্র ৬.১০ ঃ *Acheta domestica* নামক ক্রিকেট পোকার শুক্রাণু সৃষ্টিকালে গলজি কমপ্লেক্সের (বাম), এক্রোজোমে (ডান) পরিণত হবার দৃশ্য ;
গলজি কমপ্লেক্সের জোড়া-ঝিল্লীর অভ্যন্তরভাগে রীতমতো ফাঁকা জায়গা থাকে। যদিও এতে ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত কিছু ভ্যাকুওলও থাকে। চিত্রের ডান পাশে শুক্রাণুর মাথাকে কালো দাগ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর মজবুত নিউক্লিয়াসের মাথায় এক্রোজোমের ক্যাপ দেখা যাচ্ছে। কোণাকৃতির এক্রোজোম গলজি কমপ্লেক্স দ্বারা গঠিত হয় কিন্তু গলজি কমপ্লেক্সের ঝিল্লীসমূহ কুঁচকে খসে পড়ে এবং এক্রোজোমের অংশে পরিণত হয় না।
(সৌজন্য ঃ Dr. J. Kaye)।

এবং শুক্রাণু এটিকে নিষেককালে ডিম্বাণুকে ভেদ করার কাজে ব্যবহার করে। মাথার ঠিক পেছনের অংশের নাম "মধ্যখণ্ড" (middle piece)। মধ্যখণ্ড মিটোকাণ্ড্রিয়ার সমাবেশেই সৃষ্ট হয়। মধ্যখণ্ড বেড়ে পুচ্ছের চতুষ্পার্শ্বকে খাপের মতো পরিবৃত করে এবং এটি পুচ্ছকে নড়াচড়ায় শক্তি যোগায়। পুচ্ছসূত্রটি একটি সেন্ট্রিওলের অস্বাভাবিক প্রসারণেরই ফল। অন্যান্য সেন্ট্রিওল নিউক্লিয়াসের ঠিক নীচেই অবস্থিত এবং এসব শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে ডিম্বাণুতে ঢুকে। বাস্তবিকপক্ষে, কতিপয়

banglainternet.com

বিশেষ উপাদান ছাড়া অন্য কিছু শুক্রাণুকে পরিপক্বতা লাভে সহায়তা দান করে না। এ বিষয়ে সাইটোপ্লাজমেরও কোন ভূমিকা নেই।

সুতরাং, প্রতিটি শুক্রাণু নাম গোত্রহীন (undifferentiated) কোষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোষে পরিণত হয় এবং স্বীয় শক্তিবলে ডিম্বের কাছে পৌছুতে পারে । শুধু তাই-ই নয় শুক্রাণু ডিমের সংস্পর্শে এলেই একে ভেদ করতেও সক্ষম হয়।

নিষেক

একটি সীমিত সময়-সীমার মধ্যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন অবশ্যই ঘটতে হবে। কারণ, ওসবের জীবনকাল অনির্দিষ্ট নয়। এই নির্দিষ্ট কাল কয়েক মিনিট, কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিনও হতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্ব ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনালীতে যায়। ডিম্বনালী থেকে ডিম্ব জরায়ুতে প্রবেশ করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে নিষেক ঘটতে পারে। অবশ্য, কীট-পতঙ্গরা মাত্র একবারই সঙ্গম করে। পুং কীটপতঙ্গরা স্ত্রী কীটপতঙ্গের দেহে শুক্রাণুসমূহকে একবারেই জমা দিয়ে দেয়। স্ত্রী প্রাণীদের পুরো ডিম পাড়ার মৌসুমে ওসব শুক্রাণু ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মৌমাছির এই ডিম পাড়ার মৌসুম একবছর বা তারও বেশী হতে পারে। বর্তমানে স্তন্যপায়ী প্রাণীর শুক্রাণুকে হিমায়িত করে (freezing) অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, একটি মাত্র পুং পশুর সংরক্ষিত শুক্রাণুর সাহায্যে সে প্রজাতির অসংখ্য স্ত্রী পশুতে কৃত্রিম গর্ভাধান করানো সম্ভব হচ্ছে। পশু প্রজননের ক্ষেত্রে আজকাল এ ধরনের ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এভাবে উন্নতমানের পশুর বীজের সাহায্যে অধিকসংখ্যক উন্নত পশুর জন্ম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

নিষেকের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর প্রাক-নিউক্লিয়াসের সংযুক্তি। অবশ্য এক্ষেত্রে শুক্রাণুই ইন্ধনরূপে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি এমনি নিরাপত্তারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে যাতে ডিম্বাণু স্বয়ং এককভাবে ভ্রূণ-বিকাশে নিয়োজিত হতে না পারে। যদি এরকম ক্ষমতা ডিম্বাণু পেত, তাহলে n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী ভ্রূণের সৃষ্টি হত, ফলে জীবন-চক্র ভয়ানক জটিল হয়ে পড়ত। স্তন্যপায়ী ও এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বাণুকে বিবিধ

কৃত্রিম উপায়ে বিকশিত করা যায়। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে ডিম্বাণুর বিকাশ ঘটে কালে-ভদ্রে।

নিষেক একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াও বটে। কেননা একটি প্রজাতির শুক্রাণু স্বাভাবিকভাবে অপর প্রজাতির ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে না। বর্তমানে জানা গেছে যে, কতিপয় রাসায়নিক উপাদান নিষেকের সহায়ক হয়। এসব উপাদান নিষেক যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় এবং অন্য প্রজাতির শুক্রাণুকে ডিম্বাণুতে প্রবেশে বাধা দান করে। ডিম একপ্রকার প্রোটিন নিঃসৃত করে। প্রোটিনটির নাম ফার্টিলাইজিন (fertilizin)। ফার্টিলাইজিন বিপরীতধর্মী এন্টিফার্টিলাইজিনের (antifertiligin) সাথে বিক্রিয়া করে। ফার্টিলাইজিন একই প্রজাতি-সৃষ্ট শুক্রাণুকে সম্ভবত আকর্ষণ করার কাজ করে। কিন্তু উল্লিখিত রাসায়নিক উপাদান দুটির মধ্যে বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে, তখন শুক্রাণু ডিমের ঝিল্লীর সাথে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায় এবং ডিমের অভ্যন্তরে নীত হয়। অন্যান্য শুক্রাণুর ডিমে প্রবেশ ভিটেলাইন-ঝিল্লী (vitelline membrane) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কারণ এরই মধ্যে ভিটেলাইন-ঝিল্লীতে পরিবর্তন সূচিত হয়। অধিকাংশ ডিমে একেবারে বাইরের আবরণীরূপে এই ভিটেলাইন-ঝিল্লীকে দেখা যায়।

শুক্রাণুর একটি নিউক্লিয়াস ও একটি সেন্ট্রিওলই শুধু ডিম্বাণুতে প্রবেশাধিকার পায়। এই নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে মিশে যায়। সেন্ট্রিওল বিভক্ত হয় এবং প্রথম কোষ-বিভাজনের জন্যে বেম-গঠন শুরু করে। সংক্ষেপে, ডিম্বে শুক্রাণু অনুপ্রবেশের ফলে যা ঘটে তা হল ঃ (১) বিকাশের জন্যে উত্তেজনা পায় (২) এক সেট করে n-সংখ্যক ক্রোমোজোম ভিন্নভাবে স্ত্রী-পুরুষ থেকে বংশ-চারিত্র্য বহন করে এসে মিলিত হয়, (৩) একটি সেন্ট্রিওল উদ্ভূত হয়, যা পরবর্তী কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

বংশগতিতে মিয়োসিসের গুরুত্ব

যৌন প্রজননকারী জীবের জীবনচক্রে মিয়োসিস প্রক্রিয়াকে আমরা যুক্তিসিদ্ধ ও অপরিহার্য অংশরূপে উপস্থাপিত করেছি। অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যার নিরিখে মিয়োসিসকে নিষেকের বিপরীত কর্মকাণ্ড বলে ধরে নিয়েছি। বংশগতির বিচারে আমাদেরকে আরো দুটো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

banglainternet.com

৬.১১ নং চিত্রে ক্রোমোজোমের পৃথগীভবন দেখানো হয়েছে। পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজোমকে যথাক্রমে কালো ও সাদা রঙের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

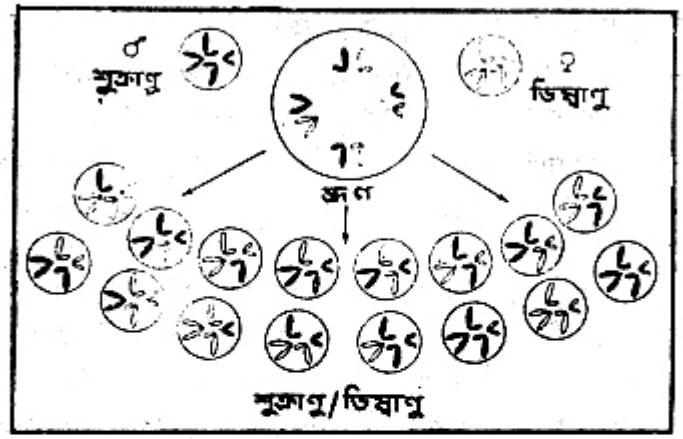

চিত্র ৬.১১ মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ার সময় পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজোমের এলোমেলো পৃথগীভবন দেখানো হয়েছে। পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজোমকে যথাক্রমে কালো ও সাদা রঙের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। ক্রশিং ওভার ও লিংকেজ দেখানো হয়নি। চিত্রটি নকশার সাহায্যে দেখানো হচ্ছে।

প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময় প্রতিটি দ্বিযোজীতে দুটি অনুরূপ ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম দুটির একটি পুরুষ এবং অপরটি স্ত্রী জাতীয় প্রাণী থেকে আসে। বেমে সব দ্বিযোজী ক্রোমোজোম পুরোপুরি এলোমেলোভাবে অবস্থান নেয়। ফলে, তৃতীয় দশায় ক্রোমোজোমসমূহ এলোমেলোভাবে বিতড়িত হয়। সুতরাং n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী প্রতিটি কোষে পিতৃ ও মাতৃ কোষের মিশ্রণ ঘটে। ধরা যাক, মিয়োসিস প্রক্রিয়াধীন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা চার জোড়া। তাহলে এতে ক্রোমোজোমের ১৬ ধরনের সমাবেশ ঘটতে পারে। ক্রোমোজোমের সমাবেশ বা মিশ্রণের ধরনের সংখ্যা, 2^n-এর মূল্যমান হিসাব করে, খুব তাড়াতাড়ি নির্ধারণ করা হয়। যত জোড়া ক্রোমোজোম থাকে সেসবের পরিবর্তে ফর্মুলার n-সংখ্যাটিকে বসানো

হয়। মানুষের কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া। এখানে ক্রোমোজোমের মিশ্রণ ঘটে 2^{23} সংখ্যায়, অর্থাৎ ৮,৩৮৮,৬০৪ সংখ্যায় বা ধরনে। কোন একটি মাত্র শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে শুধু পিতৃমাতৃকোষের সমাবেশ ঘটার সম্ভাবনা উপেক্ষণীয়ভাবে ক্ষীণ।

সন্তান-সন্ততিতে জননকোষের মাধ্যমে পিতৃ ও মাতৃ ক্রোম্যাটিন বিতরণের বিষয়টি কিয়জমা গঠনের ফলে আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুরূপ দুটি ক্রোমোজোমের ক্রোম্যাটিডসমূহের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে কিয়জমা গঠিত হয়। অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয়ের একটি স্ত্রী এবং অপরটি পুং-জননকোষ থেকে আসে। যদি আমরা ধরে নেই যে, ক্রোমোজোম জিন (genes) দ্বারা গঠিত এবং এক জোড়া অনুরূপ ক্রোমোজোমস্থিত জিনসমূহ পরিব্যক্তির (mutation) কারণে অপর অন্যান্য অনুরূপ ক্রোমোজোমস্থিত জিনসমূহের তুলনায় সামান্য স্বতন্ত্র, তাহলে যে অবস্থা দাঁড়াবে তা ৬.১২ নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

কালো রঙের পিতৃ ক্রোমোজোমের জিনসমূহকে ইংরেজি বড় অক্ষর A-E এবং সাদা রঙের মাতৃ ক্রোমোজোমের জিনসমূহকে ইংরেজি ছোট a-e দ্বারা শনাক্ত করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, যে কোন একটি মাত্র ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য জুড়ে ভিন্ন প্রকৃতির শত শত জিন থাকতে পারে। A ও B এবং C ও D জিনের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে কিয়জমা গঠিত হয়েছে। (বংশগতিবিদ্যার সংজ্ঞানুযায়ী ক্রোম্যাটিডের আদান-প্রদান বা বিনিময়কে **ক্রশিং ওভার** (crossing over) এবং A-E ও a-e **লিংকেজ গ্রুপ** (linkage group) বলা হয়। কিয়জমা গঠনের পেছনে প্রকৃত কলা-কৌশল কি সঠিক জানা যায় নি। তবে এটি সম্ভবত সত্যি যে ডিপ্লোটিন স্তরের আগেই কিয়জমা গঠিত হয়। উল্লিখিত সময়ে ক্রোমোজোমের অনুদৈর্ঘ্য দ্বিত্বগঠন স্বচ্ছভাবে ধরা যায়। অবশ্য, গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোষ মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়াধীন হবার আগে, এর ক্রোমোজোমের জিনসমূহের যেরূপ সংঘটন থাকে, সে-সবে কিয়জমা গঠনে এবং লিংকেজ গ্রুপ ভেঙে যাবার ফলে রদ-বদল দেখা দেয়। যেহেতু শেষাবধি ক্রোমোটিডসমূহ চারটি n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী জননকোষে বিতড়িত হয় সেহেতু এটি স্পষ্ট যে প্রতিটি জননকোষ বংশগতির চারিত্র্য বিচারে অন্যান্যের চেয়ে আলাদা।

সুতরাং এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মাতৃ ও পিতৃ ক্রোমোজোমের এলোমেলো পৃথগীকরণ এবং কিয়জমা গঠনের মাধ্যমে লিংকেজ গ্রুপের রদবদলের ফলে মিয়োসিস প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত n-সংখ্যক ক্রোমোজোমধারী কোষে জিনের বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ ঘটার নিশ্চয়তা থাকে। যেহেতু এভাবে সৃষ্ট জননকোষ নিষেকের

banglainternet.com

মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেয় সেহেতু সে সব সন্তানের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত বংশগতির এই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপরে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ক্রিয়াশীল থাকে এবং জীবের ক্রমবিবর্তন ঘটায়। যৌন

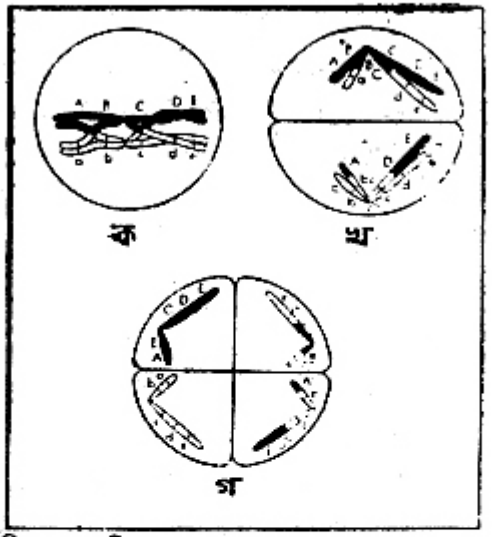

চিত্র ৬.১২ : ক্রসিং ওভারের চিত্র :

(ক) একটি দ্বিযোজী। এতে দুটি ক্রোমোজোমের সমাবেশ ঘটেছে। ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের অনুরূপ। এর একটি পিতৃ (কালো) ও অপরটি মাতৃ (সাদা) ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমদ্বয়ে ক্রসিং ওভার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্রসিং ওভার A ও B এবং C ও D জিনসমূহে দেখা যাচ্ছে।

(খ) তৃতীয় দশায় প্রতিটি পৃথগীকৃত ক্রোমোজোমের ক্রোম্যাটিড দুটি বংশগতির চারিত্র্য বিচারে সদৃশ দেখা যাচ্ছে না।

(গ) ক্রোম্যাটিড পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যে দুটির গঠন-বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির এবং দুটিকে অপরিবর্তিত দেখা যাচ্ছে।

প্রজনন ও এর সম্পূরক নিষেক ও মিয়োসিস প্রক্রিয়া শুধু নূতন জীবের সৃষ্টি করে না, এর ফলে সৃষ্ট স্বতন্ত্র জীবসমূহের মধ্যে ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। এই অর্থে মাইটোসিস ও মিয়োসিস প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। মাইটোসিসে সদৃশ কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রক্রিয়াটিকে এক অর্থে প্রজননের রক্ষণশীল প্রক্রিয়া বলা যায়।

banglainternet.com

সপ্তম অধ্যায়

দেহের বিকাশে কোষের ভূমিকা

আগের কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছি যে, নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ "বিকশিত" হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক আকার ধারণ করে। বিকাশ (development) বলতে কি বোঝায় তা সাধারণভাবে প্রত্যেকেই জানেন। আমরা জানি বিকাশ একটি ক্রমান্বয়িক ও অবিরাম প্রক্রিয়া যা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে। বিকাশ-ক্রিয়ার ফলে জীবদেহ আকার ও ওজনে বাড়ে এবং এতে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে। তদুপরি জীবদেহে নূতন নূতন কার্যধারাও আরোপিত হয়। জীবদেহ পরিপূর্ণতায় পা দিলে বিকাশের গতিও মন্থর হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে বিকশিত হয়ে ভ্রূণাবস্থায় মাতৃ-জঠরে দিন অতিবাহিত করে। তারপর মানুষের দেহে একে একে শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স, যৌন-পরিপক্বতা, দৈহিক পরিপক্বতা, প্রবীণত্ব, বার্ধক্য ও পরে মৃত্যু আসে। জীবনের প্রথম পাদে বিকাশ অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই, তবে নূতন রক্তকোষ, জননকোষ এবং আহত কলার গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদি যা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঘটতে পারে সেসবও বিকাশের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হতে পারে। আবার বার্ধক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াসমূহ যথা কোষের ফাঁকে ফাঁকে কোলাজেন সঞ্চয় এবং হাড়ের সন্ধিস্থলে অস্থিকলা গঠন ইত্যাদিকেও বিকাশের আওতাভুক্ত করা যায়। অবশ্য, এসব বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা দেহের কার্য ও বিকাশগত চূড়ান্ত পর্যায় লাভের পরেও অব্যাহত থাকে। এখানে যে সব সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবলই বিস্তৃত বর্ণনামূলক। জৈবিক ঘটনা হিসাবে বিকাশের এ কৌশল সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনা খুব কম ধারণাই সৃষ্টি করে। এ জন্যে বিকাশ সম্বন্ধে কোষস্তর থেকে আলোচনা শুরু করা উচিত। কারণ, কোষই জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। সে সঙ্গে আমাদেরকেও কতিপয় প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হয়। আমরা জানি ডিমের ডিএনএ এবং সাইটোপ্লাজমে নিষিক্ত ডিম্বাণুর শক্তিসমষ্টি সঙ্কেতরূপে নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু এই শক্তি কি ভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে একটি সুষ্ঠুভাবে গঠিত জীবদেহে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ যথোপযুক্ত স্থানে থাকে ও নির্দিষ্ট

banglainternet.com

আকারে রূপ পায়। আবার এসব অঙ্গ এর যথাযথ কার্য সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোষও অর্জন করে থাকে। এসব কি করে হয়?

বিকাশ সম্পর্কিত সমস্যা পুরোপুরি একটি জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়া। জীববিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত প্রশ্ন এই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই অধ্যায়ে বিকাশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বৈশিষ্ট্যসমূহ হল **বৃদ্ধি** (growth), **পৃথগীভবন** (diffirentiation) ও **অখণ্ডত্ব** (integration)। উপরিলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিটিতে কোষের ভূমিকা কি তাও এই সাথে আলোচিত হবে।

বৃদ্ধি

ভরের বৃদ্ধিকেই জীবদেহের বৃদ্ধিরূপে গণ্য করা হয়। কোষের আয়তন বৃদ্ধির ফলে এই বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু প্রায়শ মাইটোসিস ক্রিয়াজনিত কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিই দেহবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, কোষের প্রতিলিপি নির্মাণ প্রক্রিয়াই বৃদ্ধি-প্রক্রিয়ারূপে গণ্য হয়। কোষ চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ থেকে এর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে এবং সেসব রসদকে রূপান্তরিত করে কোষবস্তুতে পরিণত করে। এরপর কোষটি এরই অনুরূপ কোষের জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে মানুষের ডিমের কথা বিবেচনা করা যায়। মানুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর ওজন যথাক্রমে এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও এক গ্রামের বিশ কোটি ভাগের এক ভাগ। ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশুর ওজন দাঁড়ায় প্রায় সাত পাউণ্ড বা ৩২০০ গ্রাম। এতে দেখা যায় যে, নয় মাসের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণুর ওজন প্রায় তিরিশ কোটি গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে নব জাতকের দেহকে আদি নিষিক্ত কোষের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ, শিশুর দেহ কতিপয় কোষের সমষ্টি নয়। যদি তাই হতো তাহলে দেহটি মানুষের গুণাগুণ বর্জিত একটি কোষপিণ্ডে পরিণত হতো। জঠর-বন্দী অবস্থায় পুরো সময় ধরে ভ্রূণের বৃদ্ধির হার সব সময় এক থাকে না। অন্যান্য প্রক্রিয়াও এতে অংশ নিয়ে কোষকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, ঠিক যেভাবে একজন পটুয়া অথবা একজন স্থপতি মাটি দিয়ে তাদের প্রার্থিত জিনিসটিকে গড়ে তোলে এবং এতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আরোপ করে।

বৃদ্ধি প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে **বৃদ্ধির আপেক্ষিক হার** (relative rate of growth) হল একটি। বৃদ্ধির আপেক্ষিক হারের বদৌলতে অঙ্গের আকার নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও বোঝানো যায়। দেহের কতিপয় অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় দ্রুত বা ধীরে বাড়তে পারে। বিকাশকালে কতিপয় বৈশিষ্ট্য আগে দেখা যেতে পারে এবং অন্যগুলি দেখা দেয় পরে। এ সবই বৃদ্ধির আপেক্ষিক হারের জন্যেই হয়ে থাকে। ৭.১ নং চিত্রে মানুষের দেহে বৃদ্ধির হার কিভাবে অঙ্গসমূহের পরস্পরের আপেক্ষিক অনুপাতের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তাই দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মাথা ও গলা আকারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, একেবারে কম বয়সে পায়ের চেয়ে হাত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অবধি ধড় কম বেশী স্থিরভাবে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।

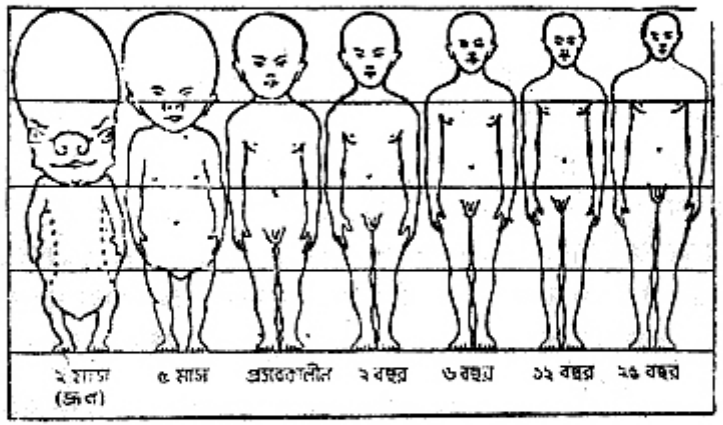

চিত্র ৭.১ ঃ মাতৃ-জঠরে ও প্রসবান্তে মানুষের দেহের আকার ও গঠনের অনুপাত দেখানো হয়েছে।
(সৌজন্য ঃ H. B. Glass, *Genes and the man*, New York : Teachers College, Columbia Univ. Bureau of Publication, 1943, after Morris)

সুতরাং, বৃদ্ধি বলতে ঠিক কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি নয়। এটি একটি জটিল ধরনের কোষবৃদ্ধি-প্রক্রিয়া। বৃদ্ধির কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন এবং কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সক্রিয় হয়। এসবে বৃদ্ধির হারও হয় ভিন্ন। বৃদ্ধির বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহ সমন্বিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট গঠনের বিকাশ ঘটায়। এই নির্দিষ্ট গঠন ও কার্যধারার কারণে একটি মানুষ অপর একটি মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকে। একই কারণে, মানুষ ও পশুতে, একটি অর্কিড ও পদ্মে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

banglainternet.com

পৃথগীভবন

পৃথগীভবন কোষের গঠন ও কার্যগত একক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যে-কোন একটি সাধারণ কোষ প্রগতিশীল পরিবর্তনের সাহায্যে বিশেষ কোষে পরিণত হয়। ফলে, সক্রিয় জীবদেহেও ভিন্নতা আরোপিত হয়ে থাকে। যেমন, মানবদেহে বর্ধনশীল কোষ রূপান্তরিত হয়ে অসংখ্য ভিন্নধর্মী কোষে পরিণত হয় এবং এ সব কোষ দেহটিকে গঠন করে। স্নায়ু, পেশী, পরিপাক, রেচন, রক্ত-সংবহন এবং শ্বাসকোষ নামে পরিচিত।

জড়জগতে পৃথগীভবন প্রক্রিয়ার অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া নেই। এ সম্বন্ধে জীবন্ত দেহ থেকেই যা অল্পবিস্তর জানা গেছে। জীবন সৃষ্টিশীল বলেই এই প্রক্রিয়াকে সৃষ্টিশীল বলা যায়। সব কোষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা থাকে, পৃথগীভবনে সৃষ্ট বিশেষ কোষে গঠন ও কার্যগত দিক থেকে, সেসবের চেয়ে অদ্ভুত কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকে। ৭.২ নং চিত্রে এ ধরনের বিশেষ কোষের উদ্ভব ও প্রগতিমূলক পৃথগীভবনের দৃশ্য চিত্রিত আছে। প্রদর্শিত কোষের নাম মেলানোসাইট (melanocyte)। এই কোষ মানুষের ত্বকের বর্ণ নির্ধারণ করে। জীবজগতের বংশগতির চারিত্র্য পরিবর্তনে যেমন পরিব্যক্তির প্রভাব পড়ে, মানুষের কর্ম প্রয়াসে যেমন কল্পনার অবদান থাকে তেমনি বিবিধ বিকাশধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পৃথগীভবনের ভূমিকা রয়েছে।

মেলানোসাইটের গঠন পদ্ধতি বিশদভাবে পরীক্ষা করা যাক, যেহেতু কোষের অভ্যন্তরে পৃথগীভবন প্রক্রিয়ার এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। মোনোসাইট উদ্ভূত হয় মেলানোব্লাস্ট থেকে। ভ্রূণের নিউরাল ক্রেস্টই (neural crest) মেলানোব্লাস্টের অবস্থানস্থল। নিউরাল ক্রেস্ট থেকে মেলানোসাইট বহিস্ত্বক বা অন্তস্ত্বকের দিকে স্থানান্তরগমন করতে পারে। স্থানান্তরে গমনের সময় এসবের আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে (চিত্র ৭.২)। এরা এসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাও গঠন করে। দানাসমূহের নাম মেলানোজোম (melanosome)। রঞ্জক পদার্থ মেলানিন (melanin) মেলানোজোমের সাথে সংবদ্ধ থাকে।

৭.৩ নং চিত্রে মেলানোজোমের পৃথগীভবনের বিভিন্ন স্তরে প্রদর্শিত হয়েছে। সাইটোপ্লাজমের মুক্ত রাইবোজোম থেকে সরু সূত্রাকার মেলানোজোমের উদ্ভব ঘটে। সম্ভবত সরু সূত্রসমূহ প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয়। এসব সূত্র ক্রমে ক্রমে জড়ো হয়ে পুরু সূত্রের আকার ধারণ করে। সূত্রসমূহের উপর মেলানিন জমা হওয়ায়

শেষাবধি সূক্ষ্ম সূত্র সব ঢাকা পড়ে এবং এসব ঝিল্লী-সদৃশ খামে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিপক্ব মেলানোজোম একটি ইলেকট্রন-ঘন বস্তু। এর আভ্যন্তরিক গঠন প্রকৃতি দেখা যায় না।

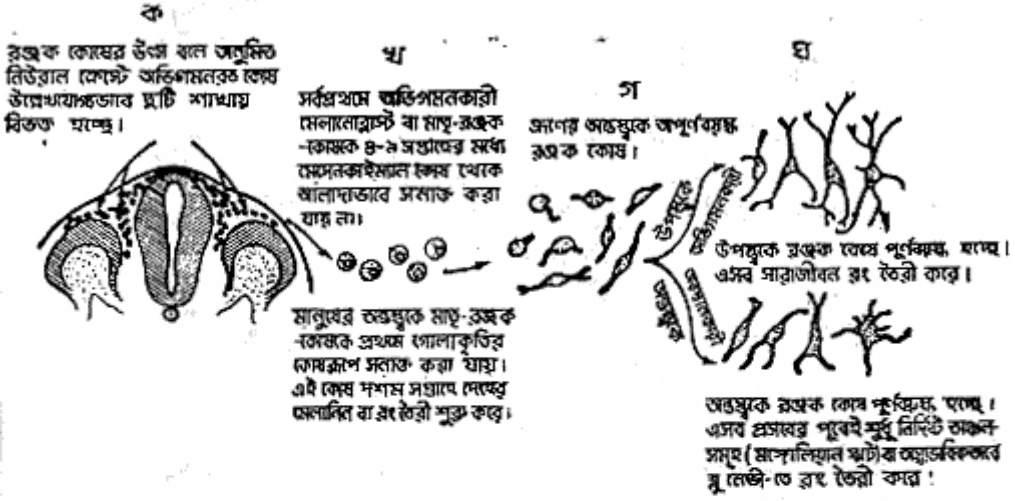

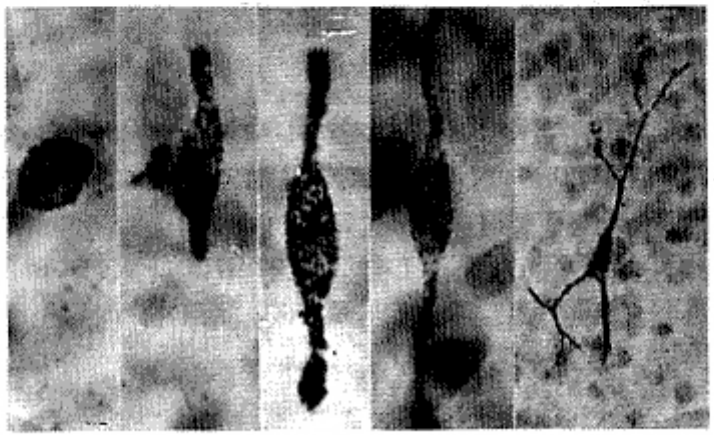

চিত্র ৭.২ঃ মানবদেহে মেলানিন উৎপাদনকারী কোষসমূহের উৎস ও এসবের পৃথগীভবন ঃ
উপরে ; ভ্রূণের নিউরাল ক্রেস্টে মেলানোব্লাস্ট কোষসমূহের উদ্ভব ঘটে। ক্রেস্ট থেকে কোষসমূহ স্থানান্তরিত হয় এবং এসবের পৃথগীভবন ঘটে। বহিস্ত্বক বা অন্তস্ত্বকে অবস্থান নেবার উপর এদের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করে। অন্তস্ত্বকে থাকলে, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, এসব প্রসবকাল পর্যন্ত মেলানিন উৎপাদন করে, কিন্তু বহিস্ত্বকে থাকলে এরা মৃত্যু পর্যন্ত মেলানিনের উৎপাদন অব্যাহত রাখে। (সৌজন্য ঃ Dr. A. A. Zimmermann from A. A. Zimmermann and S. W. Becker, Jr. Illionis Monographs in Medical Science,VI, 1939, 1-39)
নিচে ঃ পাঁচটি কোষের পরপর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সর্ব বামে গোলাকার মেলানোব্লাস্ট ও সর্ব দক্ষিণে পৃথগীভবন প্রক্রিয়াজাত মেলানোসাইট রয়েছে।

banglainternet.com

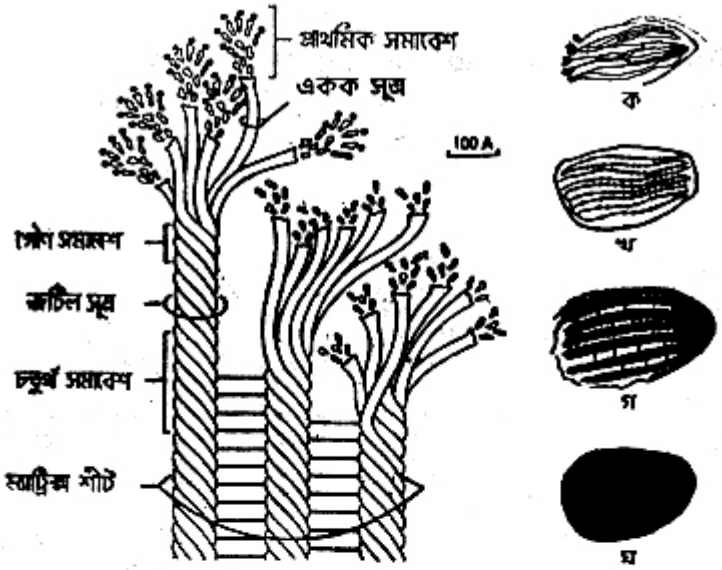

চিত্র ৭.৩ ঃ মেলানোজোম পৃথগীভবনের নমুনা ঃ

ডান ঃ বিকাশের চারটি স্তর, Matrix Sheet-এর মধ্যে সূত্র গঠন (ক) ক্রমশ মেলানিনের সংযোজন ঘটে ও শেষাবধি মজবুত আকারের মেলানোজোমের আবির্ভাব (খ, গ, ঘ) হয়।.

বাম ঃ সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোম থেকে প্রোটিন সূত্রের উদ্ভবের বিশদ বিবরণ (কালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা) এবং ছয়টি সূত্রের সমাবেশে জটিল সূত্রের সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

(সৌজন্য ঃ Dr. F. Moyer)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর ত্বকের বর্ণকে অনেকগুলি জ্ঞাত জিন প্রভাবিত করে। বিকাশশীল মেলানোজোমের সাথে এসব জিনকে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, সূত্রের সংখ্যা ও বিন্যাস, মেলানোজোমে মেলানিনের চারিত্র্য ও বিতরণ এবং মেলানোজোমের আকৃতি, গঠন ও বিতরণে ওসব জিন প্রভাব বিস্তার করে। নিউক্লিয়াসের জিন, সাইটোপ্লাজমের উপাদানসমূহে, পৃথগীভবনের সময় কিভাবে পরিবর্তন আনে, উপর্যুক্ত বর্ণনা এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পৃথগীভবন বনাম বৃদ্ধি

পৃথগীভবন ও বৃদ্ধির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রক্রিয়া দুটিকে পরস্পরের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা যায়। এর কারণ অবশ্য জানা যায় না। কতিপয় সদৃশ কোষ বিবিধহারে অনবরত বহুভাজিত হয়। এরই অপর নাম বৃদ্ধি। আবার অসংখ্য কোষের

সমাবেশ থেকে কিছু কোষ আলাদা হয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটির নাম পৃথগীভবন। পৃথগীভবনের এই প্রক্রিয়া কোষের বহুভাজনে বাধা দান করে। ফলে, পৃথগীভবনের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে ততই কোষের বিভাজনের সম্ভাবনা কমতে থাকে। এভাবে কোষটি একটি নির্দিষ্ট কার্যধারায় শর্তাবদ্ধ (committed) হয়ে পড়ে এবং এটি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে না।

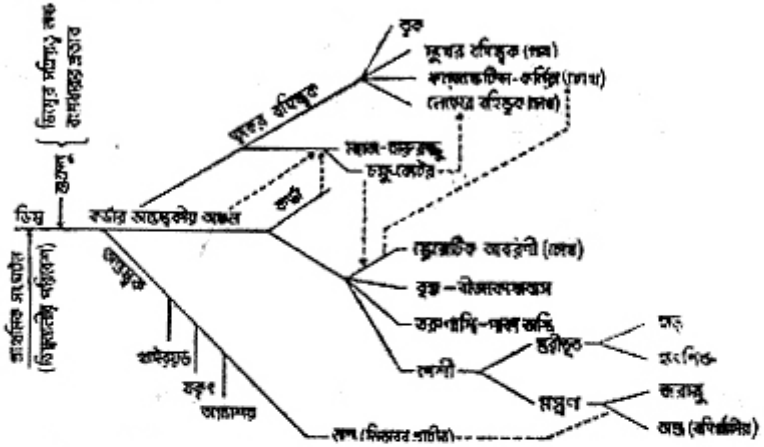

চিত্র ৭.৪ ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীতে অনির্দিষ্ট ডিম্ব থেকে পরিপক্ব কলা গঠনের গতিশীল পৃথগীভবনের নমুনাকে নক্শার সাহায্যে দেখানো হচ্ছে। প্রথমে তিনটি প্রধান কলাস্তর (বহি, মধ্য ও অন্তস্ত্বক) সৃষ্টি হয়। এরপর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের কোষসমূহ এ-সব স্তর থেকে ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকে। বিকাশকালে একটি কলার উপর অপর কলার প্রভাবকে ড্যাশ চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, চোখের কোষ বহি ও মধ্য এই উভয় স্তর থেকে সৃষ্ট হয়।

(সৌজন্য ঃ Dr. H. B. Willier)

কোষ 'শর্তাবদ্ধ' হয় বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই তা আরো একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ৭.৪ নং চিত্রে নক্শার সাহায্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিকাশের ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোষসমূহ পরিপক্বরূপে প্রায় চূড়ান্ত রূপ পায় তখন এসবের পৃথগীভবন ঘটে। আবার পৃথগীভবনের ফলে এসবের বৈশিষ্ট্য যখন অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে তখন এদের পরিবর্তিত হবার ক্ষমতা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। ইংরেজ ভ্রূণতত্ত্ববিদ প্রফেসর সি. এইচ. ওয়েডিংটন বিকাশশীল চিত্রে (চিত্র নং ৭.৫) নক্শার সাহায্যে এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি একটি সাধারণ কোষকে পাহাড় শীর্ষ থেকে গড়ানো একটি বলের সাথে তুলনা করেছেন। বলটির চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো নির্ভর করে এর চলার পথে উপত্যকার সংখ্যার উপর।

banglainternet.com

চিত্র ৭.৫ ঃ শর্তবদ্ধ নয় এরূপ একটি কোষ (বলের সাহায্যে দেখানো হয়েছে) পৃথগীভবনের একটি খাতে পড়ে কিভাবে নির্দিষ্ট কাজের জন্য শর্তবদ্ধ হয়ে পড়েছে — এরই নক্‌শা।

(সৌজন্য ঃ C. H. Waddington, The Strategy of the genes. New york : Macmillan, 1957.)

আমরা যা বলছিলাম তাকে আরো নির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। ৭.৬ নং চিত্রে এম্ফিওক্সাসের প্রাথমিক বিকাশের ধারা দেখানো হয়েছে। এর চার কোষ স্তরের সময় যদি ঝাঁকিয়ে কোষ চারটি আলাদা করা যায়, তাতেও দেখা যাবে, প্রতিটি কোষ বিকশিত হয়ে একটি স্বাভাবিক জীবে পরিণত হবে। যদিও প্রাণীর দেহটি তুলনামূলক বিচারে ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। যদি একটি চুলের ফাঁস দিয়ে ব্লাস্টুলাকে ছিদ্র করি এবং একে দ্বিখণ্ডিত করি তাহলেও এর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অবশ্য গ্যাস্ট্রুলা স্তরে আঘাত দিলে ভ্রূণের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। এতে অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, গ্যাস্ট্রুলার কোষসমূহ আঘাতের ফলে কোন উপাদান হারিয়ে ফেলে যা পূর্বে ছিল। এর থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে আহত ভ্রূণের অংশদ্বয় পরস্পরের সমান থাকে না। তাহলে গ্যাস্ট্রুলা স্তরে কতিপয় কোষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় যদিও এসবের তখনও কোন পরিবর্তন ঘটে না। ভ্রূণের প্রতি অঞ্চলের এসব নির্ধারিত কোষ শর্তবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

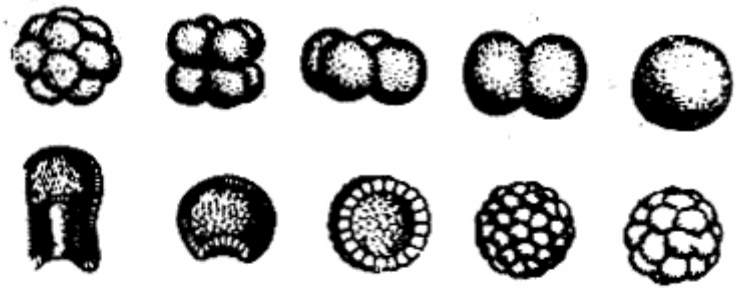

চিত্র ৭. ৬ ঃ এম্ফিওক্সাসের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় ; এতে ডিম্ব (উপরের সারির সর্ববামে) থেকে ব্লাস্টুলা (নীচের সারির মাঝে) হয়ে গ্যাস্ট্রুলা (নীচের সারির সর্বডানে) পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। যদিও গ্যাস্ট্রুলা অবধি ভ্রূণের আকার সব স্তরে প্রায় সমান কিন্তু বিভাজন ও চতুষ্পার্শ্বস্থ কোষের চাপে এসবের কোষে আকার ও আকৃতিতে অনবরত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

(সৌজন্য ঃ R. Gerard, Unvesting Cells, New york, Harper, 1949)

একজন ভ্রূণতত্ত্ববিদ অন্য উপায়ে সমস্যাটির সমাধান পেতে প্রয়াস পাবেন। তিনি একটি ভ্রূণের কতিপয় কোষ কেটে নিয়ে সেসবকে অপর একটি ভ্রূণে প্রতিস্থাপন করবেন। যদি তিনি অপরিপক্ব ও পৃথগীভবন ঘটেনি এমন এক গ্রুপ কোষকে অপর ভ্রূণের ভবিতব্য মাথার অংশে স্থাপন করেন তাহলে প্রতিস্থাপিত সেসব কোষ শেষোক্ত ভ্রূণের মাথার অংশে পরিণত হবে। যদি দেহের ভবিতব্য পৃষ্ঠদেশে প্রতিস্থাপন করেন, তাহলে সেসব পৃষ্ঠ-পেশীর অংশে পরিণত হবে। আর দেহের পশ্চাৎভাগে রাখলে তা লেজের অঙ্গীভূত হবে। যদি তিনি তুলনামূলক বেশী বয়স্ক ভ্রূণ থেকে 'শর্তবদ্ধ' কোষ অনুরূপ উপায়ে ভ্রূণে প্রতিস্থাপন করেন তাহলে সেসব কোষ প্রতিস্থাপিত ভ্রূণের অংশে পরিণত হবে না। বরং সেসব কোষ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য জাহির করবে এবং এমনকি শর্তবদ্ধ এসব কোষ হয়তো এদের চতুষ্পার্শ্বস্থ কোষসমূহকে পরিবর্তিত করে দেবে। এ পরীক্ষাটি মুরগীর ভ্রূণে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ভ্রূণের ভবিতব্য পায়ের কুঁড়ির সাথে পরিপক্ব বা বিকাশপ্রাপ্ত পায়ের কোন মিল নেই। একটি অপরিণত মুরগীর ভ্রূণ থেকে এ ধরনের একটি কুঁড়িকে তুলে অপর একটি ভ্রূণের দেহগহ্বরে প্রতিস্থাপন করলে কুঁড়ির কোষসমূহ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। শেষাবধি এই কুঁড়ি বিকশিত হয়ে দেহ-গহ্বরে একটি পরিণত পায়ের সৃষ্টি করে। পায়ের হাড় ও পেশী যথাযথভাবে গঠিত হয় (চিত্র ৭.৭)। স্মরণযোগ্য যে, প্রতিস্থাপনের সময় উল্লিখিত কুঁড়িতে হাড় বা পেশী ছিল না। ওয়েডিংটনের নক্‌শানুযায়ী, কুঁড়িটি এরই মধ্যে সেই কথিত "উপত্যকায়" অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে পায়ের নির্মাণ কাজ শুরু করে।

banglainternet.com

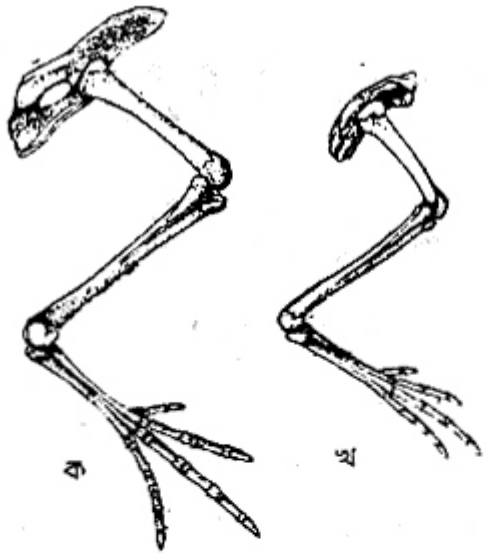

চিত্র ৭.৭ : প্রতিস্থাপিত একটি অঙ্গের যুক্তিনিষ্ঠ স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশের উদাহরণ।

(ক) ডিম্ব থেকে বেরোনোর ১৮ দিন পর মুরগীর ভ্রূণের পায়ের স্বাভাবিক হাড়।

(খ) উল্লিখিত পায়ের চেয়ে ছোট পা। কিন্তু এতে সব হাড় রয়েছে। এটি একটি পায়ের কুঁড়ি থেকে (৮.৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত উপাঙ্গ-কুঁড়ির অনুরূপ) সৃষ্টি হয়েছে। এই কুঁড়িটিকে একটি মুরগীর ভ্রূণ থেকে নিয়ে অপর একটি মুরগীর ভ্রূণের দেহ-গহ্বরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিস্থাপনের সময় কুঁড়িতে পেশী বা হাড়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু এর কোষসমূহ পূর্বেই পা-গঠনের জন্যে 'শর্তবদ্ধ' হয়ে পড়েছিল। শর্তবদ্ধ হয়ে পড়াটাই পৃথগীভবন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কুঁড়ির ভিন্ন পরিবেশ প্রতিস্থাপিত হবার পরেও চলতে থাকে।

(V. Hamburger and M-Waugh, *Physiological Zoology*, XIII, 1940, 367-380)

সেই উপত্যকাতে কুঁড়িটির গড়ানো শুরু হয়েছিল এবং এই এখানে গড়ানো ছাড়া এর গত্যন্তর ছিল না।

বিনষ্ট বা অর্জনরূপে পৃথগীভবন

কোষে দৃশ্য পরিবর্তনের অনেক আগে পৃথগীভবন শুরু হয়। এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারাই প্রথমে আরম্ভ হয় এবং একবার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেলে আপাতত এর বিরাম হয় না। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে এসব

পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, পুরনো কার্যপ্রবাহের বিনষ্টি বা নূতন কার্যধারা অর্জনের মাধ্যমে কোষের পৃথগীভবন ঘটে। সম্ভাব্য এসব বিষয়কে বিশদভাবে বিবেচনা করা দরকার। কারণ, বিনষ্টি ও অর্জন শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থবহ হলেও এদের মধ্যে বৈপরীত্য হয়তো খুব বেশী নেই।

নিষিক্ত আদি ডিম্বের কোন কোষ থেকে পরিণত স্নায়ুকোষটি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। যদিও আকার এবং কার্যগত বিচারে পরিণত স্নায়ুকোষটির সাথে আদি কোষের তফাৎ অনেক। বিকাশকালে পরিবর্তিত কোষ আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে না এবং আদি ডিম্বকোষটি এর বিশাল ক্ষমতাকে একটি বিশেষ গুণ আরোপ করার কারণে বিসর্জন দেয়। স্নায়ুকোষের এই বিশেষ গুণটি হল পরিবহণ ক্ষমতা যা স্নায়ুর বৈশিষ্ট্যরূপে আদৃত। যদি একটি স্নায়ুকোষকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় তাহলে এর একজনকে পুনর্গঠিত হতে দেখা যায় কারণ, কোষ পুনর্গঠিত হবার সমুদয় ক্ষমতা হারায় না। আপরদিকে, এই পরিণত কোষটি বিভাজিত হয়ে নূতন কোষের জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং একটি স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে গেলে অন্য স্নায়ুকোষ এর শূন্যস্থান পূরণ করে না। স্নায়ুকোষ বিভাজন ক্ষমতা হারায় বটে কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিনিময়ে একটি নূতন ক্ষমতা অর্জন করে। এই ক্ষমতার বলে স্নায়ুকোষ দ্রুত ও সফলভাবে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ পরিবহণ করতে পারে।

আমরা অবশ্য অনুমান করতে পারি যে, পৃথগীভবনের আওতাধীন কোষসমূহ যে সব কার্য সম্পাদনে পারদর্শী সেসব কাজ ডিম্বকোষও সম্পাদনে সক্ষম ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত এসব ক্ষমতা কোষের বিভিন্ন অংশে সংযুক্ত ছিল যা কোষ বিভাজনের ফলেই স্বাতন্ত্র্য পেয়ে থাকে। এই সম্ভাবনাকে অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু ভ্রূণ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এর দেহ থেকে কতিপয় কোষকে আলাদা করে ফেলা হয়, তখন সেসব কোষকে বিকশিত হয়ে স্বাভাবিক প্রার্থিত জীবের জন্ম দিতে দেখা যায়। এর থেকে উল্লেখিত ধারণার সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। এর চেয়েও একটি অনুরূপ নির্ভরযোগ্য অনুমান করা যায়। ডিম্বে তথ্যবাহী কোড (code) হিসাবে থাকে ডিএনএ। ডিএনএ কোষের সর্বগুণের আধার। কোষের পৃথগীভবন ঘটলে এতে উল্লিখিত গুণরাজির কিছু অংশ ব্যয়িত হয় এবং অপরাংশ চাপা পড়ে বা এমনকি বিনষ্ট হয়। মুরগীর ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের বিকাশকালের পর্যালোচনায় আলোচিত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।

banglainternet.com

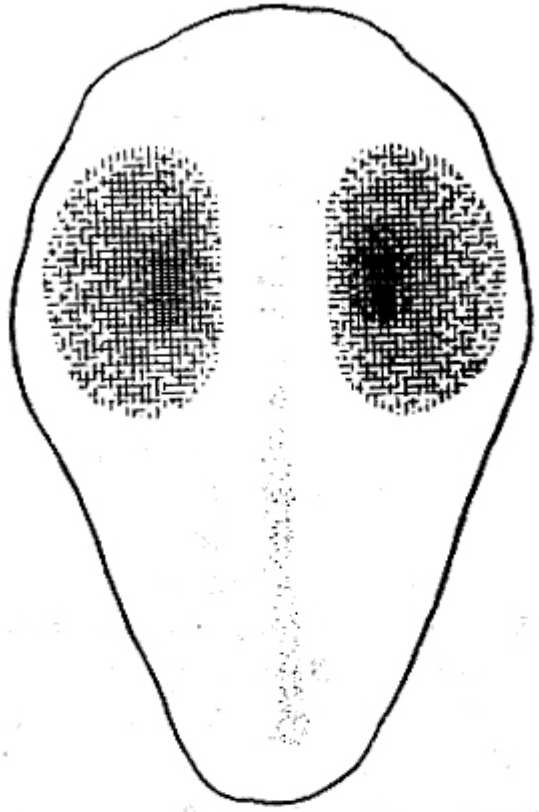

চিত্র ৭.৮ ঃ মুরগীর ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড নির্মাণকারী অঞ্চল। এই অঞ্চল থেকে কোষ নির্দিষ্ট স্থানে যায় এবং হৃৎপিণ্ড নির্মাণ করে। কোষ প্রথমে লেজের দিকে যায় এবং পরে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের (ক্ষুদ্র ফোঁটা যুক্ত অঞ্চল) মাধ্যমে মধ্যস্তকে (কোষের মধ্য স্তর) গমন করে। পরে এসব কোষ প্রিমিটিভ স্ট্রিকের শীর্ষদেশের উভয় পাশে জড়ো হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে কি পরিমাণ কোষের আগমন ঘটবে তা cross-hatching-এর তীব্রতার উপর নির্ভর করে।
(সৌজন্য ঃ Dr. Mary E. Rawles.)

ডিম্ব থেকে বেরনোর ২৪ ঘণ্টা পর মুরগীর ভ্রূণে এর হৃৎপিণ্ডটিকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুরু হয় দ্বিতীয় দিনে। ৭.৮ নং চিত্রে ভ্রূণের অন্যান্য অংশ থেকে হৃৎপিণ্ড নির্মাণকারী কোষসমূহকে হৃৎপিণ্ডাঞ্চলে ধাবমান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জানা দরকার, হৃৎপিণ্ড নির্মাণকারী কোষসমূহ প্রথম কখন, কোন্ পর্যায়ে হৃৎপিণ্ড-কোষ হিসাবে শনাক্ত হতে শুরু করে। এটি জানতে হলে

banglainternet.com

কোষসমূহ কখন রাসায়নিক উপাদান গঠন শুরু করে তা জানতে হয়। বলাবাহুল্য, এসব রাসায়নিক উপাদান হৃৎপিণ্ডকোষের বিশেষত্ব জ্ঞাপক। উপাদানসমূহ প্রোটিন গঠিত। হৃৎপিণ্ডের প্রোটিনের ৭৫ শতাংশ জুড়ে থাকে **একটিন** (actin), **মাইওসিন** (myosin) এবং **ট্রোপোমাইসিন** (tropomysin)। হৃৎপিণ্ডের পেশীর সংকোচনের জন্যেই এসব প্রোটিন ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের মাইওসিন পায়ের পেশীর মাইওসিনের চেয়ে আলাদা। রাসায়নিক পরীক্ষায় এর তফাৎ ধরা পড়ে। একটিন ও মাইওসিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোষ ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশ পর্যায়ে এ সব প্রোটিন গঠন করে, ভ্রূণবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে নয় (চিত্র ৭.৯)। আবার একটিনের আগে মাইওসিসের আবির্ভাব ঘটে এবং মাইওসিন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকে যদিও একটিন ও মাইওসিন একই অঞ্চলে বিরাজ করে থাকে। কোষের স্থানান্তরগমন

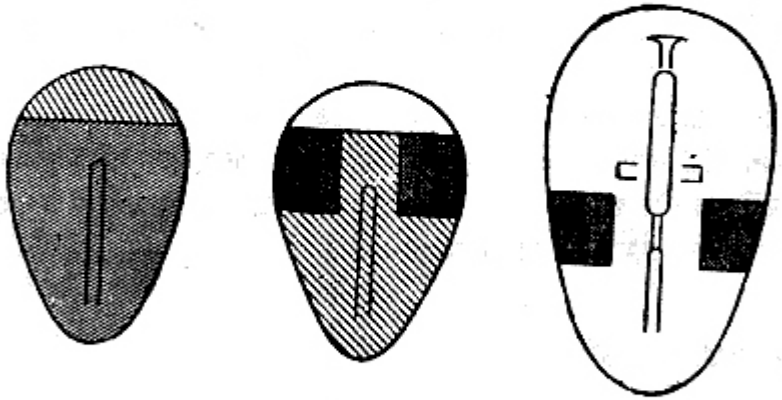

চিত্র ৭.৯ ঃ মুরগীর ভ্রূণের তিন পর্যায়ে হৃৎ-পেশীর প্রোটিনের বিতরণের নক্‌শা ; হৃৎপিণ্ডে মাইওসিনের (cross hatched area) পরে একটিনের (ফোঁটা) সৃষ্টি হয়। একটিন ভ্রূণের সীমাবদ্ধ অঞ্চল থাকে কিন্তু ভ্রূণের বিকাশের সাথে সাথে মাইওসিন আরো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। cross hatching-এর ঘনত্ব মাইওসিন গঠনের তীব্রতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।
(সৌজন্য ঃ Dr. J. Ebert)

প্রক্রিয়ার ফলে একই অঞ্চলে প্রোটিন দুটির সমাবেশ ঘটে। কিন্তু সম্ভবত কতিপয় কোষ মাইওসিন সংশ্লেষের ক্ষমতা হারায় অথচ হৃৎপিণ্ড নির্মীতব্য অঞ্চলে অন্য সব কোষের মাইওসিন সংশ্লেষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

banglainternet.com

মজার কথা হল হৃৎ-কোষসমূহ হৃৎ-পেশী কোষের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আকৃতি পাবার আগে এবং হৃৎপিণ্ডাঞ্চলে আসার আগে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ধরা পড়ে ও এদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়। মাইওসিনের প্রাথমিক সংশ্লেষের সময় এর বিপরীত এন্টিমাইসিন-A ব্যবহার করে হৃৎপিণ্ড নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করা যায়।

হৃৎপিণ্ড-গবেষণা থেকে জানা যায় যে কোষ-প্রোটিনের পরিবর্তনকেই মূলত পৃথগীভবন বলা যায়। সব না হলেও অধিকাংশ কোষের আকারগত বৈশিষ্ট্যের রাসায়নিক গঠনে রয়েছে প্রোটিন। এ সবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের পেছনে প্রোটিন-পরিবর্তনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে কার্যকরী থাকে। বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তনেও অবশ্যই প্রোটিন পরিবর্তনের ইতিহাস বিজড়িত থাকে। কারণ, কোষের সমুদয় বিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক যে এনজাইম তা প্রোটিন ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু অধিকাংশ দেহকোষের নিউক্লিয়াসমূহকে পরস্পর সদৃশ দেখায় সেহেতু আমরা ধারণা করতে পারি যে পৃথগীভবনের সময় অধিকাংশে কোষীয় পরিবর্তন সাইটোপ্লাজমেই ঘটে থাকে। এ থেকে আরো একটি অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। কোষের নির্দিষ্ট আচরণসমূহ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং এসব স্থায়িত্ব অর্জন করে। একইভাবে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস স্বীয় স্থায়িত্ব অর্জনের ক্ষমতা রাখতে পারে। আমরা এখনও রাসায়নিক সংজ্ঞায় এসবের মানে কি তা জানতে পারি নি।

নিউক্লিয়াসের পৃথগীভবন

নিউক্লিয়াসও স্বকীয়ভাবে কিছু পরিমাণে পৃথগীভবনের প্রক্রিয়াভুক্ত হতে পারে। নিউক্লিয়াসে এক সেট ডিএনএ সম্বলিত জিন থাকে। ডিএনএ কোষের নিয়ন্ত্রক এবং কোষের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু যকৃৎ ও স্নায়ুকোষের নিউক্লিয়াস কি এক? সবসময় সব জিন কি সক্রিয় থাকে? সম্ভবত দুটি ক্ষেত্রেই উত্তর হবে 'না'। যদিও এ সম্বন্ধে চুলচেরা তথ্য পাওয়া ভার। কিন্তু কতিপয় গবেষণায় এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে ব্লাস্টুলার একটি কোষ থেকে একটি নিউক্লিয়াস তুলে অপর একটি ডিম্বে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্বে উল্লেখিত ডিম্ব থেকে আগেই এর স্বীয় নিউক্লিয়াসটিকে সরিয়ে নেওয়া যায়। নিউক্লিয়াস সরানো ও প্রতিস্থাপনকালে আহত ডিম্বটি বিপর্যয় কাটিয়ে প্রতিস্থাপিত নিউক্লিয়াসসহ স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য গ্যাস্টুলা স্তরের পরের

পর্যায়ের ভ্রূণকোষ থেকে নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপিত হলে ডিম্বের বিকাশ হয় অস্বাভাবিক ও আংশিক। পৃথগীভবনের আওতাধীন বা 'শর্তবদ্ধ' কোষের নিউক্লিয়াস

চিত্র ৭.১০ : *Drosophila melanogaster*–এর লালাগ্রন্থির ক্রোমোজোম।

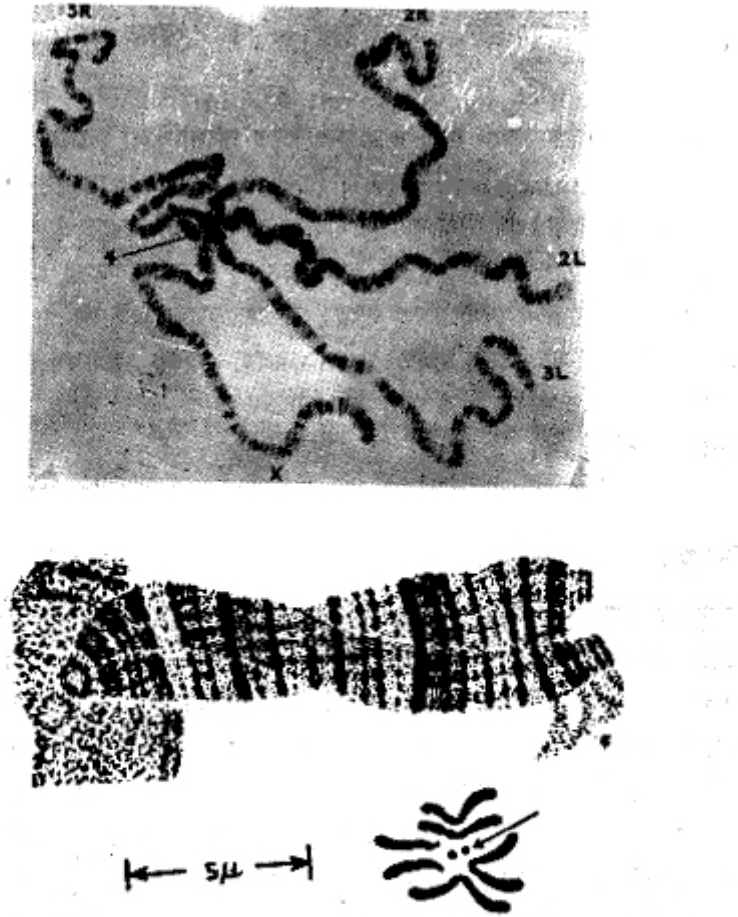

উপরে : স্ত্রী ড্রসোফিলার লালাগ্রন্থি থেকে নেওয়া থেঁতলানো কোষ। এতে X ক্রোমোজোম, অটোজোমের শাখাসমূহ (2L, 2R, 3L, 3R) এবং ছোট 4-ক্রোমোজোম দেখা যাচ্ছে। দ্বিসূত্রী ক্রোমোজোম আছে, তবে অনুরূপ ক্রোমোজোমদ্বয়কে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত দেখা যায় এবং উভয়ে কেন্দ্রমূলে হেটেরোক্রোমাটিন দ্বারা সংযুক্ত থাকে। সংযোগস্থলের নাম ক্রোমোসেন্টার।

(সৌজন্য : Dr. B. P. Kaufmann)

মধ্যখানে : 4-ক্রোমোজোমের বিবর্ধিত চিত্র। নকশায় ক্রোমোজোমকে ফানি আকৃতির দেখায়। অপসৃয়মান ক্রোমোসেন্টার বাঁয়ে থাকে এবং দুটি অনুরূপ ক্রোমোজোম নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে।

নীচে : গ্রন্থিকোষ থেকে সংগৃহীত দ্বিতীয় বিভাজক ক্রোমোজোম। তীরের সাহায্যে 4-ক্রোমোজোমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটিকেই ক্রোমোজোমের আকারগত পার্থক্য নিরূপণের জন্য স্কেলও আঁকা হয়েছে।

(সৌজন্য : C. B. Bridges, *Journal of Heredity*, 26, 1935, 60-64).

banglainternet.com

বিকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন। তদুপরি পৃথগীভবনের আওতামুক্ত কোষের যে বিশাল কর্মক্ষমতা থাকে তা-ও এতে অনুপস্থিত থাকে। আমরা এখনো জানি না শক্তির সীমাবদ্ধতা এসব কোষে কিভাবে আরোপিত হয়। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, পৃথগীভবন প্রক্রিয়া যুগপৎ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসে চলতে পারে।

আমরা আরো জানি যে কোন কোন সময় ক্রোমোজোমও আকারগতভাবে পৃথগীভবনের প্রক্রিয়াভুক্ত হয়। ৭.১০ নং চিত্রে ড্রসোফিলা মেল্যানোগ্যাস্টার *Drosophila melanogaster* নামক মাছির লার্ভার লালাগ্রন্থির কোষসমূহে বৃহদাকার ফালি ফালি ক্রোমোজোম দেখা যাচ্ছে। সাধারণ ক্রোমোজোম বেড়ে ও লম্বা হয়ে এসব ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়। লালাগ্রন্থি ছাড়া অন্যান্য কলার কোষের ক্রোমোজোমেও বিকাশকালে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। ক্রোমোজোমের এই নির্দিষ্ট ফালি গঠনের এবং পরিবর্তনের সূত্রে এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সম্ভবত এসব ফালিতে জিনসমূহ কোন এক পর্যায়ে সক্রিয় কিন্তু অন্য সবে নিষ্ক্রিয় থাকে। এসব সম্ভাব্য বিষয় আরো গবেষণার দাবি রাখে।

অখণ্ডত্ব

এ মুহূর্তে আমরা নিষিক্ত ডিম্বকে একটি উল্লেখযোগ্য কোষরূপে গুরুত্ব দিতে পারি। একে মুখ্যত সরল জীবদেহ বা অবিকশিত জীবদেহ বলা যায়। গৌণভাবে একে মাত্র একটি কোষরূপে গণ্য করতে পারি যদিও ক্ষমতার বিচারে একে অন্য একটি কোষ থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যায়। কেননা এটি একটি পূর্ণ জীবদেহের বিকাশ ঘটাতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি বৃদ্ধি ও পৃথগীভবন প্রক্রিয়ার ফলে জীবদেহের বিকাশ ঘটে। কোষের প্রেক্ষাপটে বিকাশকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, শুরুতে যেসব কোষ সাধারণ সরল প্রকৃতির ও সমরূপী ছিল সেসব ক্রমশ জটিল প্রকৃতির ও বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তনসাধ্য, বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন কোষ অপরিবর্তনীয় আকার ধারণ করে। তদুপরি সাধারণ কার্যক্ষম কোষ উচ্চতর বিশেষ গুণমণ্ডিত ও বিশিষ্ট কার্যক্ষমতাসম্পন্ন কোষে পরিণত হয়।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য বৃদ্ধি, বৃদ্ধির আপেক্ষিক হার ও পৃথগীভবন যথেষ্ট বলে বিবেচিত নয়। ডিমের নিষেক থেকে জীবদেহের মৃত্যু পর্যন্ত পুরো বিকাশকাল কোষের গঠন এবং আচরণের একত্ব ও শৃঙ্খলা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। কোষের গঠন

ও আচরণের এই একত্ব ও শৃঙ্খলাকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। ডিম, বীজ, ভ্রূণ ও লার্ভা এদের থেকে উদ্ভূত পরিণত জীবদেহের মতোই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডিম, বীজ ইত্যাদির বিকাশের ধারা যদিও পুরোপুরি বোধগম্য নয়, তথাপি এদের পরস্পরের আচরণে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এরা জীবন্ত জীবদেহে পূর্ণ কর্মক্ষম। এরা অখণ্ডরূপে বিকশিত হয়। শুধু এক গুচ্ছ কোষরূপে বিকাশলাভ করে না।

একত্বের এই বিষয়টিকে আমরা অখণ্ডত্ব বলে অভিহিত করছি। কিন্তু আমাদেরকে এও স্বীকার করতে হচ্ছে যে এর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ব্যাপার এবং এর চেয়েও কঠিন হল বিষয়টিকে উপলব্ধি করা। অখণ্ডত্বকে বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অণু, কোষ, কলা ও অঙ্গের সংঘটন সম্পর্কে গভীর ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই যে এ সকল বিষয়ে আমাদের কেবল আংশিক জ্ঞানই আছে। আমাদের জানা আছে যে অখণ্ডত্ব কতিপয় ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, রাসায়নিক উত্তেজনার কথা প্রথমে ধরা যায়। হরমোন উত্তেজকের মধ্যে একটি। কোষের চলাচলের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে বীজকোষাবাস গঠনকারী কোষ ও যে সমস্ত কোষ ব্লাস্টুলায় ভিতরমুখী স্তরসৃষ্টির মাধ্যমে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ের গোড়াপত্তন করে সে সব কোষের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত কোষ-বিক্রিয়াকে একটি ফ্যাক্টর বলা যায়। কোষ-বিক্রিয়ার ফলে চোখের মতো জটিল অঙ্গের (চিত্র ৭.৪) সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৃতীয় ফ্যাক্টররূপে গণ্য করা যায় পৃথগীভবন প্রক্রিয়াকে। এই প্রক্রিয়ায় অবিকশিত উপাঙ্গ-কুঁড়ি একটি পূর্ণাঙ্গ পায়ে পরিণত হয়। এমনকি সেই উপাঙ্গ-কুঁড়িকে এর বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরালেও সেটির বিকাশ অব্যাহত থাকে।

আমরা অখণ্ডত্ব বিষয়ক কতিপয় প্রশ্ন তুলে এর গুরুত্বকে উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। অবশ্য সেসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজো জানা নেই। প্রাণী একটি পরিণত আকার কেন পায় আর কেনই বা এর দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়? জীবদেহের জীবনপ্রবাহ নির্ধারণ করে কে? জীবদেহের এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গের আকারগত সম্পর্ক কে নির্ধারণ করে? দেহের আকারের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে কিভাবে? বিকাশের এক পর্যায়ে অপর পর্যায়কে প্রভাবিত করে কিভাবে? বিকাশকে জীবনের সার্বিক প্রক্রিয়ারূপে উপলব্ধি করার আগে এসব ও অন্যান্য অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হয়। বিকাশের কিছু কিছু স্বরূপকে কোষীয় স্তরের সাহায্যে যাচাই

banglainternet.com

করা যেতে পারে এবং ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যসব বিষয়, যেমন আকারের সংঘটনটিকে উচ্চতর মানের সংঘটন বলে মনে হয়, যেখানে, স্বতন্ত্র কোষ গৌণ ভূমিকা পালন করে। কোষ-বৃদ্ধি ও কোষের নিয়ন্ত্রণ থেকে কোষ মুক্ত হয়ে কোষ স্বেচ্ছাচারী হবার ফলেই ক্যানসারের উৎপত্তি হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের ভবিষ্যতের বিকাশশীল চিন্তাধারার উপরই ন্যস্ত। আমাদের ভবিষ্যতের এই বিকাশ রাসায়নিক চেক ও ব্যালান্স পদ্ধতি দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

banglainternet.com

অষ্টম অধ্যায়

দেহের মৃত্যুতে কোষের ভূমিকা

যে কোন জীবের একটি জীবনকাল থাকে। জীবটি যে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এই জীবনকাল সে প্রজাতির বৈশিষ্ট্যও বটে। কতিপয় ক্ষেত্রে জীবনকাল বরং খুবই সীমিত ; যেমন কিছুসংখ্যক মৌসুমী ঝিঁঝি পোকা মাত্র সতের বছর বাঁচে (আর এজন্যে এরা 17 years Cicada নামে পরিচিত — অনু)। অবশ্য সাধারণত আমরা জীবনকালকে গড়পড়তা হিসাবেই বিবেচনা করে থাকি। কিছু কীট পতঙ্গ কয়েকদিন, বর্ষজীবী উদ্ভিদ কয়েক মাস, মানুষ সত্তর এবং ওক গাছ গড়ে ২৫০-৩০০ বছর বাঁচে। পশ্চিম উপকূলীয় সিকোইয়া (Sequoia) এবং ক্যালিফোর্নিয়ার হোয়াইট মাউন্টেনের (White mountain) ব্রিস্টল কোণ পাইন (Bristle-cone pine) জাতীয় উদ্ভিদ সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। এ জাতীয় উদ্ভিদ কয়েক হাজার বছরও বাঁচে।

কোষেরও অনুরূপ জীবনকাল থাকে। পুরো জীবনকাল অতিবাহিত করার পর কোষ অস্তিত্ব হারায়। জীবদেহের মত বিভিন্ন ধরনের কোষ, এমনকি একই জীবদেহের বিভিন্ন কোষের জীবনকাল কম বা বেশী হতে পারে। তবুও এটি বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত যে কিছু সংখ্যক কোষের মৃত্যু নেই। এককোষী একটি জীবদেহ বিভাজিত হয়ে দুটি নূতন অপত্য কোষের জন্ম দেয়। তাহলে অপত্য কোষদ্বয়ের জীবনের অংশে পরিণত হয় উল্লিখিত এককোষী জীবদেহটি। এভাবে প্রজাতিটি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কোষের অবিরাম বিভাজন-কাজ চলবে। সুতরাং, এই কোষটির জীবন অবিচ্ছিন্ন ধারায় অপরের মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে। (এ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাধিকারক্রম অনুসরণ করলে আমরা অতীতের কোন একটি আদি কোষের সন্ধান পাব — অনু)। যৌন প্রজনন-সৃষ্ট জীবদেহের মধ্যে জননকোষই অমরত্বের দাবিদার। কারণ, জননকোষই একমাত্র কোষ যা বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে প্রজাতির বংশধারাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু দেহের অন্যান্য কোষে মৃত্যু একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। কারণ, এই প্রক্রিয়ার যদি রদ-বদল ঘটে তাহলে জীবদেহের কর্মক্ষমতা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। জীবদেহের মৃত্যু ছাড়াও, জৈবিক

banglainternet.com

সমস্যারূপে, কৌষীয়-মৃত্যুর দুটি ব্যাপক পর্যায় থাকে ঃ (১) কোষ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে সমপরিমাণ নূতন কোষকে অবশ্যই ওসবের স্থান পূরণ করতে হয়, (২) স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ার ফলেও কোষের মৃত্যু হয়ে থাকে।

কোষ প্রতিস্থাপন

অনুমান করা হয় যে মানবদেহ প্রতি সাত বছর পর পর নবজন্ম লাভ করে। সাত বছর সমসয়ীমার মধ্যে মানুষের দেহ পুরনো কোষ বর্জন করে এবং এর স্থলে দেহে নূতন কোষ প্রতিস্থাপিত হয়। এই হিসাব যদি নির্ভুল হয় তাহলেও বিভ্রান্তিজনক। কারণ, দেহের কোন কোন অঙ্গে অবিরাম কোষ প্রতিস্থাপিত হওয়া আবশ্যক অথচ অন্যান্য অঙ্গের কোষসমূহ প্রতিস্থাপনে অক্ষম। জন্মের সময়ে সমুদয় স্নায়ু ও পেশীকোষ গঠিত হয় এবং জীবদেহটি যতদিন বাঁচে ততদিন এসব কোষ কর্মক্ষম থাকে। অবশ্য আহত বা বাতিল কোষের কথা ভিন্ন। স্নায়ুকোষ বিনষ্ট হলে অন্য স্নায়ুকোষ এর বদলে প্রতিস্থাপিত হয় না। পুরোপুরি পৃথগীভবন প্রক্রিয়াধীন স্নায়ুকোষ বিভাজনের ক্ষমতা হারায়। কাজেই স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপিত হবার মত কোন কেন্দ্র থাকে না। দীর্ঘদিন থেকে ধারণা ছিল যে উল্লিখিত তথ্য পেশীকোষের বেলায়ও প্রযোজ্য, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় যে পেশীকোষের সীমিত প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা থাকে। কোন অঙ্গের স্থির আকার দেখে এতে কোষ প্রতিস্থাপনের হার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোষের অবস্থান জানা যাচ্ছে না, ততক্ষণ, অঙ্গের এই স্থির আকার শুধু এটুকুই প্রমাণ করে যে এতে কোষের ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটেনি। পুরনো কোষের মৃত্যু হবার ফলে সমপরিমাণ নূতন কোষ উৎপাদিত হয়।

কিছু সংখ্যক জীববিজ্ঞানী মানবদেহে প্রতিদিন শতকরা ১–২ ভাগ কোষের মৃত্যু ঘটছে বলে অনুমান করেন। সুতরাং যদি কোন কোষের মৃত্যু না ঘটে এবং কোষ-বিভাজন স্বাভাবিক থাকে তাহলে ৫০ বা ১০০ দিন পর দেহের ওজন দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াতো। যদি দেহের ওজন স্থির থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে অনুমিত মৃত কোষসমূহের স্থলে নূতন কোষ প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আর এসব কোষের সংখ্যা কোটি কোটি। যেহেতু এসব কোষ স্নায়ু বা পেশীতে উৎপন্ন হয় না সেহেতু নিশ্চয়ই দেহের কোথাও কতিপয় সক্রিয় কেন্দ্র আছে যেখানে কোষের এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলছে। উদাহরণস্বরূপ, সেসব কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষী দেহগাত্র, রক্ত, পরিপাকতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি। দেহের অন্যান্য অঙ্গে কোষ প্রতিস্থাপনের হার তুলনামূলকভাবে

অনেক কম। যেমন, একটি যকৃৎকোষের গড় জীবনকাল হল প্রায় ১৮ মাস। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে যদি যকৃতের একটি টুকরোকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে সেখানে বিভাজনরত কোষের সংখ্যা দেখতে পাব খুবই কম। অপরদিকে, মানুষের যকৃতের একটি অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কোষ প্রতিস্থাপনের হার বেড়ে যায় এবং যতক্ষণ প্রায় পুরোপুরি মেরামত না হচ্ছে ততক্ষণ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

মানবদেহের বর্হিভাগ প্রতিরক্ষী স্তর দ্বারা আবৃত। এই স্তরকে মূলত ত্বক বলা যায়। ত্বকে সমস্ত নালী দ্বার, চোখের কর্নিয়া এবং রূপান্তরিত ত্বকজাত নখ ও লোম থাকে। এই সমস্ত অঙ্গের কোষসমূহ অনবরত মরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে থাকে। ত্বক খসে পড়ে এবং বাড়ন্ত নখ ও লোম মৃত কোষ দ্বারা গঠিত হয়। তাহলে, প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াকে আপেক্ষিক দ্রুত প্রক্রিয়াই বলা যায়। অভ্যন্তরস্থ কোষসমূহ অনবরত বিভাজিত হচ্ছে এবং ত্বকের উপরিভাগে আসতে বাধ্য হচ্ছে। একেবারে বাইরের কোষসমূহ মরে শক্ত হয়ে যায় (চিত্র ৮.১) বাহুর ত্বকে বিভাজিত কোষকে বিভাজন স্থল থেকে বহিস্ত্বকে আসতে আনুমানিক ১২–১৪ দিন সময় লাগে। মৃত কোষ পুরু হয়ে জমার ফলে হাতের তালুতে কড়া পড়ে। এসব অঞ্চল দিয়ে সুচ ঢুকালে ব্যাথাবোধ হয় না বা রক্ত বের হয় না। (কোষসমূহ মৃত বলেই ব্যাথা লাগে না বা রক্ত ঝরে না — অনু)।

চোখের কর্নিয়া একটি বিশেষ ধরনের ত্বক। এতে কোষের মৃত্যু ও প্রতিস্থাপনের হার বেশী। বস্তুতপক্ষে, সক্রিয় কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য কর্নিয়া একটি চমৎকার আদর্শ কলা। কর্নিয়া মাত্র কয়েক স্তর পুরু কোষ দ্বারা গঠিত। ফলে একে তুলে (স্যালাম্যাণ্ডার ইঁদুর এ কাজের জন্য উত্তম) বন্ধক (fixative) ও রঞ্জকের (stain) মধ্যে রেখে আস্ত টুকরোকে স্লাইডে মাউন্ট (mount) করা যায়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে কর্নিয়ার বহির্ভাগে মৃত কোষ এবং এর নীচে সক্রিয় বিভাজনরত কোষসমূহকে দেখা যায়।

রক্তে রক্তের কোষ উৎপাদিত হয় না। অস্থির মজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকা ও লসিকা, প্লীহা ও থাইমাস গ্রন্থি থেকে শ্বেত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। লোহিত ও শ্বেত কণিকা এবং রক্ত রস মিলে রক্ত গঠিত হয়। রক্ত কণিকা বা কোষের গড় অনুপাত হল ; শ্বেত কণিকা — এক ঃ লোহিত কণিকা ৪০০–৫০০। সাধারণত রক্ত গঠনকারী অঞ্চলসমূহ কোষের অনুপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। নূতন উৎপাদিত কোষকে স্থান ছেড়ে দেবার প্রয়োজনে অবশ্যই অধিক সংখ্যক রক্তকোষকে মৃত্যুবরণ করতে

banglainternet.com

হয়। নতুবা রক্ত সংবহন তন্ত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রতি ধরনের কোষ আপেক্ষিক ধ্রুব-হারে মৃত্যুবরণ করে। আমাদেরকে যে কোন একটি কোষ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা লোহিত রক্ত কণিকার কথা বিবেচনা করতে পারি।

চিত্র ৮.১ ঃ মানবদেহের ত্বকের সেকশান। এতে নীচের বা অভ্যন্তরভাগের বিভাজন অঞ্চল থেকে বহির্ভাগের কঠিন স্তরের মৃত কোষের অঞ্চল পর্যন্ত কোষের ক্রম-পরিণতি দেখা যাচ্ছে। বহিস্থক অবিরাম খসে যায় কিন্তু এতে অনবরত কোষ প্রতিস্থাপিত হয়। এসব কোষ উল্লিখিত অভ্যন্তরভাগ থেকেই আসে।

banglainternet.com

লোহিত কণিকার জীবনকাল প্রায় ১২০ দিন। এই কোষ নিউক্লিয়াসহীন। রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে বাহিত হবার সময় কোষ নিউক্লিয়াসটিকে হারায়। অনবরত প্রবহমান এই যানের মেরামতের আর কোন সুযোগ থাকে না। রক্ত কণিকা (লোহিত) ক্রমে শীর্ণ হয় এবং শেষাবধি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কতিপয় নির্দিষ্ট ধরনের রোগ এদের জীবন-কালকে কমিয়ে দিতে পারে। মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত রোগী ও চন্দ্রিকা-কোষ (sickle-cell) রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত রোগীতে লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল কমে গিয়ে যথাক্রমে দাঁড়ায় ৮৫ ও ৪২ দিনে। এক্ষেত্রে কোষের মৃত্যুর হারের সাথে কোষ প্রতিস্থাপনের হার তাল মিলাতে পারে না। ফলে লোহিত রক্ত কণিকার স্বাভাবিক পরিমাণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয়। লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি রক্তশূন্যতার জন্ম দেয়। লোহিত রক্ত কণিকার জীবনকাল কমে যাবার কারণ জানা যায়নি।

পরিপাকতন্ত্রের কোষেও কোষের মৃত্যুর হার অত্যধিক বেশী। মানবদেহে মৃত্যুর হার জানা যায়নি। তবে ইঁদুরের অন্ত্র-গাত্রের কোষসমূহ প্রতি ৩৮ ঘণ্টা পর পর প্রতিস্থাপিত হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে।

উদ্ভিদজগতে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যথা শৈবাল ও ছত্রাকে মৃত্যুর মাধ্যমে কোষের ঘাটতি হয় কম। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদেকোষের মৃত্যুর হার ও ঘাটতি অনেক বেশী। ওষুধি উদ্ভিদে প্রতি মৌসুমে গ্রাউণ্ড কলার (ground tissue) উপরের কোষসমূহ মরে যায়। একটি বড় গাছের কথা ধরা যাক। পাতা, ফুল ও ফলের (শুধু বীজই জীবিত থাকে) মাধ্যমে গাছ প্রতি বছর বেশ পরিমাণ কোষ হারায়। কিন্তু কাঠ ও বাকল নির্মাণে যে সব মৃত কোষ অংশ নিচ্ছে সবগুলোকে বিবেচনা করলে এবং প্রাণিদেহের কোষ-মৃত্যুর হারের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে বৃক্ষে কোষ-মৃত্যুর হার অনেক বেশী। তবু কোষের উচ্চ মৃত্যু হার অস্তিত্বের ঘোষণা দেয় যেহেতু মৃতকোষই জীবিত কোষের জীবনপ্রবাহ বজায় রাখায় সহায়তা দান করে।

আয়ুষ্কাল ও কোষ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে উচ্চতর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদকে প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও এটি গণ্য করার মতো। একটি গাছ এর 'তারুণ্য' ও শক্তি সংরক্ষণ করে দুই উপায়ে। প্রথম উপায় হল, গাছ আনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পৃথগীভবন ও বিভাজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয়ত এসব প্রক্রিয়ার সমান্তরালে ও সমগতিতে কোষের মৃত্যু ঘটে। বৃক্ষ পাতা তৈরির মাধ্যমে এর কোষসমূহ বাতিল করে অথবা এসবকে মৃত সহায়ক কলা যথা কাঠ, বাকল

banglainternet.com

ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে। জীবন্ত কোষ যতই তরুণতর থাকে গাছও সে পরিমাণ কম 'বয়স্ক' হয়ে থাকে। অপরদিকে, একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়ার সাহায্যে আয়ু লাভ করে। অর্থাৎ এর দেহের সর্বাধিক সংখ্যক কোষকে জীবিত ও কর্মক্ষম থাকতে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সব কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় সেসব কোষের মৃত্যু অবধারিত। এরই ফলে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর বা যে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবনকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘতম জীবনের অধিকারী গাছের চেয়ে কম।

কোষের মৃত্যু ও স্বাভাবিক বিকাশ

আমরা যখন কোষের স্বাভাবিক বিকাশের কথা ভাবি তখন স্বাভাবিক উপায়ে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এদের পৃথগীভবনের মাধ্যমে বিশেষ কোষে পরিণত হওয়া এবং বিবিধ তন্ত্রে ও অঙ্গে এসব কোষের গ্রুপবদ্ধ হওয়ার বিষয় বিবেচনায় রাখব। উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি গতিশীল ও সৃষ্টিশীল। কাজেই কোষের মৃত্যুকে বিকাশের শক্তিশালী ও অপরিহার্য শর্তরূপে মেনে নেওয়া অনেকটা খাপ ছাড়া মনে হতে পারে। যাহোক বিকাশের ক্ষেত্রে কোষের মৃত্যু দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুটির একটি বহুলজ্ঞাত রূপান্তর ক্রিয়া (metamorphosis) এবং অপরটি অঙ্গসমূহে দেহাবয়বের আকৃতি দান। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিকে বিকাশের একটি পর্যায়রূপে সম্প্রতি গণ্য করা হচ্ছে।

রূপান্তর ক্রিয়ার ফলে দুটি পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, দেহের আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে (লার্ভা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবদেহের সৃষ্টি)। দ্বিতীয়ত, জীবননির্বাহ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে দেহের অঙ্গসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়ার দুটি সুপরিচিত উদাহরণের কথা উল্লেখ করা যায়। ব্যাঙাচি রূপান্তরিত হয়ে ব্যাঙে পরিণত হয় আর শুঁয়া পোকা মূককীট হয়ে পরে প্রজাপতি বা মথে রূপান্তরিত হয়।

ব্যাঙাচি ব্যাঙে রূপান্তরিত হয় বটে কিন্তু আকারের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে না। আমেরিকার লিওপার্ড (Leopard frog) ব্যাঙে রূপান্তর ঘটতে সময় লাগে প্রায় এক বছর। ডিম থেকে বেরনো ব্যাঙাচি ও রূপান্তর ক্রিয়া শুরুর পূর্ব মুহূর্তের ব্যাঙাচির আকৃতি একই ধরনের। রূপান্তরের সময় ব্যাঙাচি লেজ হারায় এবং এর দেহে পা গজায়। লেজ হারানোর ব্যাপারে ভ্রমণশীল ফ্যাগোসাইট (phagocyte) নামক কোষই দায়ী। এসব কোষ রক্তবাহিত হয়ে লেজে আসে। লেজে

এসে এরা পেশী, স্নায়ু, ত্বক ও অন্যান্য কলাকে গ্রাস করতে শুরু করে। শেষাবধি লেজের ত্বক কুঁচকে যায় এবং ফলে লেজ খাটো হয়ে একটি স্মারক চিহ্নের আকার পায়। সে সময় পরিপাক ও রেচন তন্ত্রসমূহের কলা পুনরায় অত্যাধিক সংঘটিত হয়। কৃত্রিম উপায়ে আলোচিত প্রক্রিয়াকে মন্থর বা দ্রুত করা যায়। থাইরয়ড গ্রন্থির (thyroid gland) হরমোনের সাহায্যে ব্যাঙের রূপান্তর ক্রিয়াকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উল্লেখযোগ্য, এই হরমোনে আইওডিন থাকে। অত্যধিক হরমোন ব্যবহার করলে প্রক্রিয়া দ্রুত হয় এবং কম ব্যবহার করলে প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়ে। শুধু তাই-ই নয় একে দীর্ঘদিন ব্যাঙাচি পর্যায়ে রেখে দেওয়া সম্ভব হয় এবং এর আকৃতিকেও অপরিবর্তিত রাখা যায়।

পতঙ্গসমূহে রূপান্তর প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকারের এবং কোষের মৃত্যু এখানে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবসময় বড় ঘটনারূপে বিবেচ্য নয়। সহজতম রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কলার কোষসমূহ প্রাপ্তবয়স্ক রূপান্তরিত দেহে অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং সেসব কোষ একই ধরনের কলার সৃষ্টি করে। এ ধরনের ফলাফল পেতে বৃদ্ধি ও পৃথগীভবনের মধ্যে সামান্যমাত্র প্রভেদ থাকলেই চলে। এসব অসম্পূর্ণ রূপান্তর (incomplete metamorphosis) প্রক্রিয়ায় লার্ভা পরিপক্ব হয়ে প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হবার সময় দেহের গঠনে মাত্র সামান্য পরিবর্তন আসে। অসম্পূর্ণ রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পঙ্গপাল, ঘাস ফড়িং ও আরশোলা।

সম্পূর্ণ রূপান্তর (complete metamorphosis) প্রক্রিয়ায় লার্ভা ও প্রাপ্ত-বয়স্কের দেহের গঠনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। লার্ভা বা শূককীট মূককীটে রূপান্তরিত হয়। এসম শূককীটের ত্বক কঠিন আকার ধারণ করে এবং কুঁচকে গিয়ে গুটির সৃষ্টি করে। এর ইংরেজি নাম পিউপারিয়াম (puparium)। মূককীট হবার সময় শূককীটের প্রায় সমুদয় কলা নষ্ট হয়ে যায়। মূককীটের সৃষ্টি হবার সময় প্রাপ্তবয়স্কের বিকাশ শুরু হয়। প্রাপ্তবয়স্কের কলাসমূহ সমাঙ্গ-কুঁড়ি (imaginal bud) থেকে উদ্ভূত হয়। সমাঙ্গ-কুঁড়িসমূহ কিন্তু শূককীট অবস্থায় গঠিত হয় অথচ শূককীটের কলা নষ্ট হবার সময় কুঁড়িসমূহ অক্ষত থেকে যায়। এই কুঁড়িকে স্থায়ী ভ্রূণ কলার অঞ্চলরূপে গণ্য করা যায়। শূককীটাবস্থায় কুঁড়িতে বৃদ্ধি ও পৃথগীভবনের শক্তি সুপ্ত থাকে। বৃদ্ধি হরমোন বা জুভেনাইল হরমোন (juvenile hormone) শূককীটের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কমে গেলে এবং রূপান্তর সাধনকারী হরমোন পুরো সক্রিয় হয়ে ওঠলে বাডসমূহ বা কুঁড়িগুলি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

banglainternet.com

৮.২ নং চিত্রে ড্রসোফিলা (*Dosophila*) নামক মাছির লার্ভায় বিভিন্ন স্থানে কতিপয় সমাঙ্গ-কুঁড়িকে দেখা যাচ্ছে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের অধিকাংশ কোষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় কিন্তু অন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র, পেশী এবং ত্বক পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

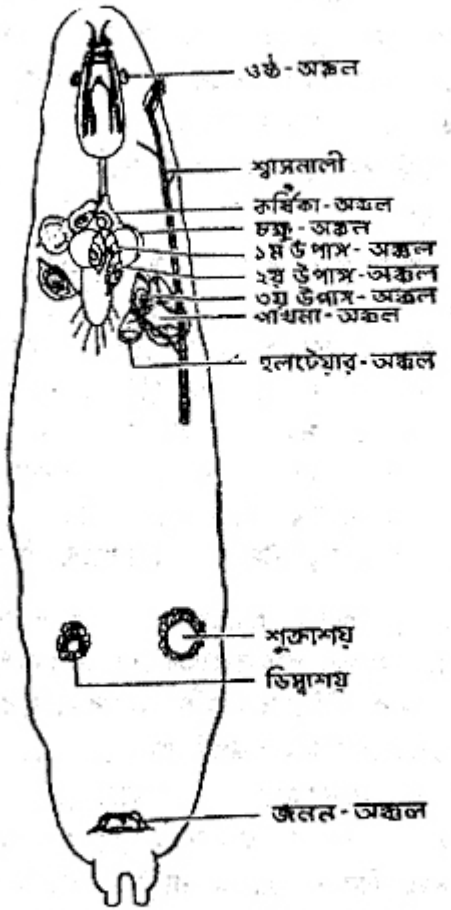

চিত্র ৮.২ : ড্রসোফিলার (*Drosophila*) পরিণত শূককীটের সমাঙ্গ-কুঁড়ি। রূপান্তর প্রক্রিয়াকালে শূককীটের স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া অধিকাংশ অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্কের দেহ-নির্মাতা কলাসমূহ সমাঙ্গ-কুঁড়ি থেকে উদ্ভূত হয়। এই সব কলার কতিপয়কে চিত্রে দেখা যাচ্ছে। শূককীটের দেহেই সমাঙ্গ-কুঁড়িসমূহ গঠিত হয় ; কিন্তু শূককীটের দেহে এর হরমোনের প্রভাব খর্ব না হওয়ার আগে কুঁড়িসমূহে পশ্চগীভবন প্রক্রিয়া চলতে পারে না।

(সৌজন্য : Dr. Bodenstein, *Biology of Drosophila*. M. Demerec, New York : Willey, 1950)

banglainternet.com

আমরা কোষের শেষ প্রকারের মৃত্যুর বিষয়ে বিবেচনা করব। এসব মৃত কোষ অঙ্গ-সমূহের আকৃতিদানে অংশ গ্রহণ করে। কোষের মৃত্যু ও বৃদ্ধির হারের উপর দেহের গঠন নির্ভরশীল। রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অঙ্গসমূহের বিকাশের সময়, অধিক সংখ্যক কোষের বৃদ্ধি হলে, বিকাশের ক্ষেত্রে সে সব বাড়তি কোষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে সৃষ্ট উল্লিখিত কোষসমূহ লার্ভা বা শূককীটে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের দেহে এ সব কোষের কোন প্রয়োজন নেই। ফলে, এ সবকে অপসারিত হতে হয় (যেমন ব্যাঙাচির লেজ খসে পড়ে)। অথবা কোন অঙ্গে নিঃসারক নালী গঠনের কথা ধরা যাক। নালীতে অবশ্যই ছিদ্র থাকবে। এই ছিদ্র এর অভ্যন্তরস্থ কোষসমূহের মৃত্যুর ফলেই সৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, নালীর ছিদ্র থেকে এসব কোষ বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয় না। কলার (tissue) উভয় প্রান্ত জুড়ে অনেক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কলার উভয় পাশের কিনারা পরস্পরের সাথে মিশে যায়। অঙ্গসমূহের মধ্যে চোখের ও স্নায়ুতন্ত্রের কিয়দংশের কথা উল্লেখ করা যায়। লক্ষণীয় যে কলার কিনারা যেখানে মিশে সেখানে কোন জোড়া দেখা যায় না। এটি সম্ভব হয় কোষ-মৃত্যুর ফলে। হাত ও পায়ের আঙ্গুল এভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যদি বিচ্ছিন্নকরণ সম্পূর্ণ না হয় তা হলে দু'আঙ্গুলের ফাঁকে মধ্যচ্ছদার (diaphragm) সৃষ্টি হয়।

অঙ্গ গঠনে কোষ-মৃত্যুর ভূমিকা বিষয়ক অন্যতম একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা যায়। কোষ-মৃত্যুর মাধ্যমে মুরগীর ভ্রূণের দেহ-গাত্র থেকে কি ভাবে পাখা মুক্ত হচ্ছে তা ৮.৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তাই-ই নয় কোষ-মৃত্যু পাখাটিকে বৈশিষ্টমণ্ডিতও করেছে। এক্ষেত্রে কোষসমূহ সারিবদ্ধভাবে মৃত্যুবরণ করে। এই সারি দেহ থেকে শুরু করে পাখার শীর্ষদেশ বরাবর সামনে ও পেছনে প্রলম্বিত থাকে। এভাবে সারি সারি কোষ-মৃত্যুর ফলে পাখার কনুই দেহগাত্র থেকে আলাদা হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল এই যে, যখন এসব কোষকে অপসারণ করে ভ্রূণের অন্য অংশে রোপণ করা হয় তখন এ সব কোষ নির্ধারিত সময়ে (আনুমানিক চার দিনের মাথায়) মারা যায়। এতে আরো বিস্ময়কর এই যে, কোষসমূহ যে অন্যস্থানে প্রতিস্থাপিত তা এদের মৃত্যুর ধরন দেখে বোঝা যায় না। এরা যেন এদের মূল অবস্থানে থেকেই মৃত্যুবরণ করল। এ সব কোষের অভ্যন্তরে কোন অজ্ঞাত পরিবর্তন ঘটে যাবার দরুন এদের মৃত্যুকালও পূর্ব নির্ধারিত হয়ে যায়। যখন বিনাশকাল উপস্থিত হয় তখন মৃত্যুর হাত থেকে এদের পরিত্রাণ পাবার উপায় থাকে

banglainternet.com

না। যদি এই ঘটনার নেপথ্যে অনুষ্ঠিত কলাকৌশল সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমরা ওয়াকিফহাল হতে পারি তাহলে বার্ধক্য সম্পর্কিত ব্যাপক সমস্যাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব। তখন জীবের জীবনকালও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব।

চিত্র ৮.৩ : ডিম থেকে বেরনোর ৭২ ঘন্টা পর মুরগীর ভ্রূণকে নক্‌শার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। মাথার নীচে পাখার কুঁড়ি গঠিত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। cross-hatched অঞ্চলের কোষসমূহ মরে যায়, ফলে পাখার কানা বা কনুই অঞ্চল মুক্ত হয়ে দেহগাত্র থেকে আলাদা হয়ে যায়।

banglainternet.com

পরিভাষা

বাংলা ইংরেজি

অকেলাসিত — amorphous
অক্ষিপট — retina
অগ্ন্যাশয়িক কোষ — pancreatic cell
অতিবেগুনী রশ্মি — ultraviolet ray
অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ — longitudinal section
অণুনলিকা — micro-pipette
অণুশল্য ব্যবচ্ছেদ — micro-surgery
অণু-সুঁই — micro-needle
অন্ত-প্লাজমীয় জালি — endoplasmic reticulum.
অন্তত্বক — endodermis, dermis
অন্তস্রাবী গন্থি — endocrine gland
অন্ত্র — intestine
অনাক্রম্য — immunological
অপত্য কোষ — daughter cell
অপত্য নিউক্লিয়াস — daughter nucleus
অপরিপক্ব ডিম্বাণু — oocyte
অবলোহিত রশ্মি — infrared rays
অভিলক্ষ্য — objective
অমেরুদণ্ডী — invertebrate
অম্ল — acid
অর্ধগুণী — haploid
অস্থিকলা — bone tissue
আকরিক — minerals
আণবিক ওজন — molecular weight
আদি কোষ — proto cell
আদি মাতৃ কোষাবাস — spermatogonia
আন্ত্রিক কোষ — intestinal cell
আন্তঃকৌষীয় — inter cellular
অভ্যন্তরীণ গঠন — internal anatomy
আসঞ্জনশীল — adhesive
আলো গ্রাহী — light receptor
আলোক পদ্ধতি — optical system
আলোক সংশ্লেষণ — photosensitive
আলো সুবেদী — photosensitive
আস্রবণ প্রক্রিয়া — osmosis
আঁশের কোষ — lint cell

আহিত শক্তি — charged form of energy
উৎপাদক কোষ — assembly cell
এককেন্দ্রিক — concentric
এক কোষী — unicellular
কলা — tissue
কলারসায়ন — histochemistry
কর্ণপ্রদাহ — mumps
কড় পড়া — callouse
কিউটিন — cutin
কিয়জমা — chiasma
কুসুম — yolk
কুসুম স্ফটিক — ylok sphere
কুঁড়ি — bud
কেন্দ্রাতিগ — centrifuge
কৈশিকনালী — capillary
কোষতত্ত্ব — cell theory
কোষ বহির্গত উপাদান — extracellular substance
কোষরসায়ন — cytochemistry
কৌষীয় অঙ্গসংস্থান — cellular morphology
কৌষীয় প্রাণসত্তা — cytoplasm
কৌষীয় ভিত্তি — cellular basis
ক্রান্তি গুণাংক — critical factor
ক্রান্তিমান — critical value
ক্ষুদ্রান্ত — small intestine
গর্ভাধান — fertilisation, insemination
গুটি — puparium
গৌণ প্রাচীর — secondary wall

banglainternet.com

ঘনীভবনের হার — concentration gradient
চক্ষু-স্নায়ু — optic nerve
চটচটে — viscous
চতুর্থ দশা — telophase
চন্দ্রিকা কোষ — sickle cell
ছত্রাক — fungus
জননকোষ — gamete
জরায়ু — uterus
জারণ — oxidation
জিন — gene
জীবজনি — biogenesis
জীবনচক্র — life cycle
জীবরসায়নবিদ — biochemist
জীবাণু — germ
জোড় বদ্ধকরণ — pairing
জৈব-সংশ্লেষ — biosynthesis
ঝিল্লী-তন্ত্র — membrane system
ঝিল্লী-দশা — membrane phase
ঝিল্লীবদ্ধ — membrane closed
টোপর — cap
ডিম্বনালী — oviduct
ডিম্বাণু — ovum
ডিম্বাশয় — ovary
ডোরা পেশী — striated muscle, striped muscle
তরুণাস্থি — cartilage
তেজস্ক্রিয় — radioactive
তৃতীয় দশা — anaphase
দন্ত মীনা — enamel of teeth
দন্তসীনা — dentine of teeth
দশা — phase
দশা-বৈসাদৃশ্য শনাক্তকারী — phase-contrast microscope
দশামধ্যক — interphase
দানাদার — grannular
দ্বি-কণ্ডুলন — double helix
দ্বিগুণী — diploid
দ্বিতীয় দশা — metaphase
দ্বিযোজী — bivalent
দেহসন্ধি — joints
দ্রবণ — solution
দ্রব — solute
ধমনী — artery
নমনীয় — pliable
নলিকা — tubule
নিষেক — fertilization
পরকলা — lens
পত্র হরিৎ — chlrophill
পরমাণু পর্যায় সারণী — periodic table of atoms
পরিপক্ক আঁশ — lint
পরিপাক তন্ত্র — digestive system
পরিবাহী কোষ — transporting cell
পরিবেশ-দূষণ — pollution of environment
পরিব্যক্তি — mutation
পরিস্রাবণ — filtration
পরোক্ষ নিউক্লিয় বিভাজন — karyokinesis, n - mitosis
পলকাটা — faceted
পলিও — poliomyelities
পাতানো — embedding
পীত জ্বর — yellow fever
পুনর্জননরত কোষ — regenerative cell
পুরু পেশী-সূত্র — myosin
পেকটিন — pectin
পেশী-সূত্র — myofibril

পৌষ্টিক নালী — altimentary canal.
প্রক্ষেপক — projector, ocular
প্রজনন — reproduction
প্রজনন তন্ত্র — reproductive system
প্রতিপ্রভ পর্দা — flouresescent screen
প্রথম দশা — prophase
প্রস্থচ্ছেদ — cross section
প্রাক কোষ — pre-existing cell
প্রাক নিউক্লিয়াস — pronucleus
প্রাক প্লাস্টিড — proplastid
প্রাক লোহিত রক্ত কণিকা — pre-erythrocyte
প্রাক শুক্রাণু — pre-spermatid
প্লীহা — spleen
ফুসফুস — lungs.
বন্ধক — fixative
বহির্কংকাল — exoskeleton
বহিস্ত্বক — epidermis
বহুকোষী — multicellur
বংশধারা — generation
বংশগতি — heredity
বিজারণ — reduction
বিপাক ক্রিয়া — metabolism
বিবর্ধন — magnification
বিশ্লেষণ ক্ষমতা — resolving power
বিবর্তনবাদ — evolution theory
বৃক্ক — kidney
বৃক্ককোষ — renal cell
বেম — spindle
ব্যাপন — diffusion
ভর — mass
ভিত্তি-উপাদান — ground substance
ভেদ্যতা — permeability
ভৌতিক অস্থিত্ব — physical reality
ভ্রূণ — embryo
ভ্রূণবিদ্যা — embryology
মধ্যত্বক — mesoderm
মাতৃকোষ — mother cell
মূককীট — pupa
মৌলিক একক — basic unit
মৃত কোষ — dead cell
যকৃৎ — liver
যকৃৎ কোষ — hepatic cell
যৌগিক অণুবীক্ষণযন্ত্র — compound microscope
যৌন দ্বিরূপিতা — sexual dimorphosis
রক্তনালী — blood vessel
রক্তকোষ — blood cell
রক্তের লোহিত কণিকা — red blood corpuscle
রজঃস্রাব — menustration
রঞ্জক — stain
রঞ্জককোষ — melanocyte
রাসায়নিক বন্ধনী — chemical bond
রূপান্তর ক্রিয়া — Metamorphois
লসিকা — lymph
শারীরবৃত্ত — physiology
শ্বাসকেন্দ্র — respiratory centre
শিরা — vein
শুক্রকীট — sperm
শুক্রবাহী নালী — seminiferous tubules
শুক্রাণুর ক্যাপ — acrosome
শুক্রাণু পুচ্ছ — sperm tail
শুক্রাশয় — testis
শ্বেতসার — starch
শ্বেত রক্ত কণিকা — white blood corpuscle, leucocyte
শৈবাল — algae
সমাঙ্গ কুঁড়ি — imaginal bud
সরু পেশী সূত্র — actin
সংকোচনশীল কোষ — contractive cell
সংযোজী কলা — connective tissue
স্তম্ভাকৃতি কোষ — collumner cell
সংশ্লেষণ — synthesis

banglainternet.com banglainternet.com

সান্দ্র — viscous
সুবেদী — sensative
সঙ্গম — copulation
স্বতঃজনন — spontaneons generation
স্নায়ু মাতৃ কোষ — neuroblast
স্নায়ু কোষ — nerve cell
স্নায়ু-তরঙ্গ — nerve impulse
স্তন্যপায়ী — mammal
স্নায়ু-সূত্র — nerve fibre
স্থিতিস্থাপক — elastic
হাম — measles
হৃৎপিণ্ড — heart

পরিভাষা (২)
ইংরেজি বাংলা

acid — অম্ল
acitn-adhesive — একটিন, সরুপেশী সূত্র
alage — শৈবাল
alimentary canal — পৌষ্টিকনালী
amorphous — অকেলাসিত
anaphase — তৃতীয় দশা (কোষ বিভাজনের)
annual plant — বর্ষজীবী উদ্ভিদ
aquatic organism — জলজ জীব
artery — ধমনী
artificial insemination —কৃত্রিম গর্ভাধান
assembly cell — উৎপাদক কোষ
astral ray — তারার রশ্মি

Besement membrane— বেসমেন্ট-ঝিল্লী
biochemist — জীব রসায়নবিদ
biogenesis – জীবজনি
biosynthesis — জৈব সংশ্লেষ
bivalent — দ্বিযোজী
blood serum — রক্তরস
blood vessel — রক্তনালী
bone tissue — অস্থিকলা

callouse — কড়
cap — টোপর
capillary — কৈশিক নালী
cartilage — তরুণাস্থি
cellular morphology — কৌষীয় অঙ্গ সংস্থান
centrifuge — কেন্দ্রাতিগ
chemical bond — রাসায়নিক বন্ধনী
chlorophill — ক্লোরোফিল, পত্রহরিৎ
cilia — সিলিয়া
collumner cell — স্তম্ভাকৃতি কোষ
compound microscope — যৌগিক অণুবীক্ষণযন্ত্র
concentric — এককেন্দ্রিক
concentration gradient — ঘনীভবনের হার
copulation — সঙ্গম
critical factor — ক্রান্তি গুণাংক
critical value — ক্রান্তিমান
cross section — প্রস্থচ্ছেদ
cube — ঘনফল, ঘনক
cytochemistry — কোষ-রসায়ন
cytoplasm — সাইটোপ্লাজম, কৌষীয়-প্রাণসত্তা
cytoskeleton — সাইটোকংকাল

daughter nucleus — অপত্য নিউক্লিয়াস
dead cell — মৃত-কোষ
dentine — দন্তসীনা
dermis — অন্তত্বক
diffusion — ব্যাপন
differentiation — পৃথগীভবন
digestive system — পরিপাকতন্ত্র
diploid — দ্বিগুণী

elastic — স্থিতিস্থাপক
electron beam — ইলেক্ট্রনরশ্মি
electron microscope — ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র
electron-sensitive — ইলেক্ট্রন-সুবেদী
electromagnetic spectrum — তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী
embedding — পাতানো
embryo — ভ্রূণ

banglainternet.com
banglainternet.com

embryology — ভ্রূণবিদ্যা
embryonic cell — ভ্রূণ কোষ
enamel of teeth — দন্তমীনা
eucell — প্রকৃত কোষ
endocrine gland — অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি
endodermis — অন্তত্বক
endoplasmic reticulum — অন্ত-প্লাজমীয় নালী
environment — পরিবেশ
enzyme — এনজাইম, জারক রস
epidermis — বহিস্ত্বক
evolution theory — বিবর্তনবাদ, ক্রমবিকাশ তত্ত্ব
exoskeleton — বহির্কংকাল
extracellular substance — কোষ বহির্গত উপাদান

faceted — পলকাটা
fertilization — গর্ভাধান, নিষেক
filtered — পরিস্রুত
fixative — বন্ধক
flourescent — প্রতিপ্রভ
foetus — ভ্রূণ
fungus — ছত্রাক

gamete — জনন কোষ
generation — বংশধারা
germ — জীবাণু
grannular — দানাদার
ground substance — ভিত্তি উপাদান

haploid — অর্ধগুণী, n-ক্রোমোজোম
heart — হৃৎপিণ্ড
heredity — বংশগতির ধারা, উত্তরাধিকার
histochemistry — কলা-রসায়ন

imaginal bud — সমাঙ্গ কুঁড়ি
immunological — অনাক্রম্য
infrared rays — অবলোহিত রশ্মি
intercellular — আন্তঃকৌষীয়
internal anatomy — অভ্যন্তরীণ গঠন
interphase — দশামধ্যক, পর্যায়-মধ্যক
intestine — অন্ত্র
intestinal cell — আন্ত্রিক কোষ
invertebrate — অমেরুদণ্ডী

joints — দেহ-সন্ধি
juvenile hormone — বৃদ্ধি আনয়নকারী হরমোন

karyoknesis — পরোক্ষ নিউক্লিয় বিভাজন
kidney — বৃক্ক

lamellar — স্তরবিশিষ্ট
larva — শূককীট, লার্ভা
lens — লেন্স, পরকলা
leucocyte — শ্বেত রক্তকণিকা, লিউকোসাইট
life cycle — জীবনচক্র
light microscope— সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র
light receptor — আলোকগ্রাহী
lint — পরিপক্ব আঁশ
lint cell — আঁশের কোষ
living system — জীবিত তন্ত্রসমূহ
longitudinal section — অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ
lungs — ফুসফুস
lymph — লসিকা

macromolecule — বড় অণু
magnification — বিবর্ধন
mammal — স্তন্যপায়ী প্রাণী
matrix — ম্যাট্রিক্স, ধাত্র
measles — হাম
mechanical force — যান্ত্রিক বল
melanin — রঙ
melanocyte — রঞ্জক কোষ, মেলানোসাইট
metabolism — বিপাক ক্রিয়া
metabolic fuel — বিপাক জ্বালানী
Metaphase — দ্বিতীয় দশা (কোষ বিভাজনের)
microscope — অণুবীক্ষণযন্ত্র
microcosm — ক্ষুদ্র জগৎ
microfibril — মাইক্রোফিব্রিল, ক্ষুদ্র আঁশ
micro-needle — অণু-সুঁই
micro-pipette — অণু নলিকা
micro-surgery — অণু শল্য ব্যবচ্ছেদ
mineral — আকরিক
miosin — পুরু পেশী সূত্র
mitosis — মাইটোসিস, পরোক্ষ নিউক্লিয় বিভাজন
molecular weight — আণবিক ওজন
mother cell — মাতৃকোষ
multicellular — বহুকৌষীয়
mutation — পরিব্যক্তি
mycoplasm — মাইকোপ্লাজম
myofibril — পেশীসূত্র, মাইওফিব্রিল

natural selection — প্রাকৃতিক নির্বাচন
nerve fibre — স্নায়ুসূত্র
nerve impulse — স্নায়ুতরঙ্গ
neuroblast — স্নায়ুকোষ
nuclear mebrane — নিউক্লিয়ঝিল্লী
nuclear sap — নিউক্লিয়রস

objective — অভিলক্ষ্য, অবজেকটিভ
ocular — প্রক্ষেপক
oocyte — অপরিপক্ব ডিম্বাণু
optic nerve — চক্ষু স্নায়ু
osmosis — আস্রবণ প্রক্রিয়া
ova — ডিম্বাণু
ovary — ডিম্বাশয়
oviduct — ডিম্বনালী
oxidation — জারণ

pairing — জোড়বদ্ধকরণ
pancreatic cell — অগ্ন্যাশয়িক কোষ
periodic table of atoms — পরমাণুর পর্যায়-সারণী
permeability — ভেদ্যতা
phase — দশা, পর্যায়
phase contrast — দশা-বৈসাদৃশ্য
microscope — শনাক্তকারী অণুবীক্ষণযন্ত্র
photographic plate — আলোক-চিত্রের প্লেট
photosensitive — আলো সুবেদী
photosynthesis — আলোক-সংশ্লেষণ
physiology — শারীরবৃত্ত
pinacocytosis — পিনাকোসাইটোসিস
pliable — নমনীয়
poliomyelities — পলিও
pre-erythrocyte — প্রাক-লোহিত রক্ত কণিকা
pre-existing cell — প্রাক-কোষ
primary spermatocyte — মুখ্য মাতৃকোষ
pronucleus — প্রাক-নিউক্লিয়াস
prophase— প্রথম দশা (কোষ বিভাজনের)
pupa — পিউপা, মূককীট
puparium — গুটি

radiocative — তেজস্ক্রিয়

banglainternet.com

red blood cell — লোহিত রক্ত কণিকা
reduction — বিজারণ
regenerative cell — পুনর্জননরত কোষ
renal canal — বৃক্ক কোষ
reproductive system — প্রজনন তন্ত্র
resolving power — বিশ্লেষণ ক্ষমতা
retina — অক্ষিপট

secretory tube — নিঃসারক নালী
secondary wall — গৌণ প্রাচীর
seminiferous tubules — শুক্রবাহী নালী
senility — বার্ধক্য
sensitive — সুবেদী
sickle cell — চন্দ্রিকা কোষ
small intestine — ক্ষুদ্রান্ত
solution — দ্রবণ
sperm — শুক্রকীট
sperm tail — শুক্রাণু পুচ্ছ
spermatid — প্রাক-শুক্রাণু, স্পারমেটিড
spermatogonia — আদি মাতৃকোষাবাস, স্পারমেটোগোনিয়া
spindle — বেম
spleen — প্লীহা
spontaneous generation— স্বতঃজনন
stain — রঞ্জক
starch — শ্বেতসার
stellate — তারা
striated muscle — ডোরা পেশী
syngamy — গর্ভাধান
synthesis — সংশ্লেষ

tadpole — ব্যাঙাচি
telophase — চতুর্থ দশা
testis — শুক্রাশয়
tissue — কলা
tonoplast — ভ্যাকুওল ঝিল্লী, টোনোপ্লাস্ট
transporting cell — পরিবাহী কোষ
tubule — নলিকা

ultraviolet rays — অতিবেগুণী রশ্মি
unicellular — এককোষী
unit — একক
uterus — জরায়ু

vein — শিরা
virulent — তীব্র ক্ষতিকর
viscous — সান্দ্র
volume — আয়তন

yeast — ঈস্ট
yellow fever — পীত জ্বর
yolk — কুসুম

zygote — নিষিক্ত ডিম্বাণু

banglainternet.com

গ্রন্থপঞ্জী

Bourne, G. H. *Division of Labor in Cells.* New York : Academic Press, 1962.

Butler, J. A. V., *Inside the Living Cell,* New York : Basic Books, 1959.

Darlington, C. D., *Chromosome Botany* : London. Allen and Unwin, 1959.

Gerard, R. W., *Unresting Cells.* New York : Harper, 1940.

Greeson, R. A. R. *Essentials of General Cytology.* Edinburgh : University Press, 1948.

Hoffman, J. G. *The Life and Death of Cells.* New York : Hanover, 1957.

Hughes, A., *A History of Cytology.* New York: Abelard-Schuman, 1959.

Mcleish. J. and B. Snoad, *Looking at Chromosomes.* New York : St. Martin's Press, 1958.

Bloom W. D. W. Fawcett *A Text book of Histology.* Philadelphia : Saunders, 1962.

Strehler. B. L. *Time, Cells and Aging.* New York : Academic Press, 1962.

Swanson. C. P., *Cytology and Cytogenetics.* Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1957.

Wilson, E. B. *The Cell in Development and Heredity.* New York. Macmillan, 1925.

banglainternet.com

শব্দপঞ্জী

অক্সিডেটিভ ফসফোরাইল্যাশন, ৩৩
অখণ্ডত্ব, ১২৬
অগ্ন্যাশয় কোষ, ৭৫
অতিবেগুণী রশ্মি, ২
অণু-নলিকা, ১২
অণুবিন্যাস, ১৬
অণুবীক্ষণযন্ত্র, ১৫
অণু-সুঁই, ১২, ৩৭
অণু-শল্য, ১২
অণুর সাথে সংযোজন পদ্ধতি (mode of linkage) ৯৬
অন্তপ্লাজমীয় জালি, ২১, ২২, ২৫, ৭৩
অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, ২৪
অপটিক্যাল সিস্টেম, ৮
অপত্য কোষ, ৯৭
অবলোহিত রশ্মি, ২
অর্ধগুণী, ১০৬, ১১০, ১১৩

একটিন, ৬৯, ১৩৭
এক্রোসোম, ১১৯
এন্টিফার্টিলাইজিন, ১২১
এডেনিন, ৯৬
এমিবা, ১৬, ১০২, ১০৩
এস্ফিওক্সাস, ১৩২
এসেট্যাবুল্যারিয়া, ৩৭, ৩৮, ৫৩
এস্ট্রাল রে (তারার রশ্মি), ৯২
আঁদ্রে লোফ, ৭
আকারের উদ্ভব ও বিকাশ (morphogenesis), ১৪১
আদি অপরিপক্ব ডিম্বাণু, ১১৬
আদি কোষ, ৭৭, ৭৮
আদি মাতৃ কোষাবাস, ১১৮
আন্তকৌষীয় উপাদান ও কোষের বার্ধক্য, ৪৯
আন্তকৌষীয় সিমেন্ট, ৪২
আর. এন. এ. ২৬, ৪০, ৯৭
আলো-গ্রাহী কোষ, ২৫
আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্র, ২, ১০, ১৫
আলোকচিত্রের প্লেট, ২
আলোক দীপন, ১০
আলোক বর্ষ, ২
আলোকরশ্মি, ২
আলোক সংবেদী, ২৫
আলোক সুবেদী, ২
আসঞ্জনশীলতা, ৪১

ইউগ্লিনা, ২৯
ইমাজিন্যাল বাড, ১৪৯
ইলাস্টিন, ৪৮, ৪৯, ৫০
ইলেকট্রন, ১০
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র, ১০, ১৫, ১৬, ১৯
ইলেক্টন সংবেদী, ১০

ঈস্ট — ৫২

উইলিয়াম বেট্‌সন, ৮২
উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর, ৪২
উৎপাদক কোষ, ৭৩

একক, ২
এ, টি, পি, ৬৮
এডিনোসিন ট্রাইফসফেট, ৩১
এনজাইম, ২৪
এন্টিবডি, ৭৩
এম, জি, শ্লাইডেন, ৪
এরগ্যাস্টোপ্লাজম, ২২
এংস্ট্রম, ৯, ১০, ১৫
এলিয়াম সেপা (পেঁয়াজ), ৮৫
এপিথেলিয়েল কোষ, ১১৮
এসিট্যাবুলারিয়া, ৩৭

ওয়াই ক্রোমোজোম, ১০৭
ওয়াটসন-ক্রিক ডিএনএ মডেল, ৯৭
ওসমিয়াম, ২৬

কলচিসিন, ৮৯
কর্নিয়া, ১৪৫
কর্ক-কোষ, ৪
কলা কালচার, ৯৯
কলা রসায়ন, ১১
ক্যান্সার, ১৪২
ক্যারোটিনয়ড, ২৮
ক্যারিওকাইনেসিস, ৮৬
কিউটিন, ৪৫
কিয়সমা গঠন, ১১২
কুঁড়ি, ১৩৪
কুসুম, ৬৪, ১১৭
কুসুম দানা, ১১৬
কুসুম স্ফটিক, ১১৬
কেরাটিন, ৭৩
কোড, ১৩৫
কোপ্রোইটিন, ৪৬
কোলোজেন, ৪৮, ৪৯
কোষ, ৩, ১২, ৬৪
কোষকেন্দ্র, ৯৩
কোষকিল্লী, ১৭
কোষতত্ত্ব, ৪
কোষতত্ত্ববিদ, ১২
কোষ বহির্গত উৎপাদনসমূহ, ৪১, ৫০
কোষ প্লেট, ৯৩, ৯৯
কোষস্থিত ফাঁক (pit or pit fields), ৪৬
কোষ প্রতিস্থাপন, ১৪৪
কোষের আকার ও কাজ, ১৪
কোষের বিপাক ক্রিয়া ও আকার, ৬১
কোষের আকৃতি, ৫২-৫৮
কোষের আকার, ৫৯-৬৬
ক্রান্তিগুণাঙ্ক, ৯
ক্রান্তিমান, ৬১
ক্রিস্টি, ৩২
ক্লোরোপ্লাস্ট, ৩০
ক্রোম্যাটোফোর, ২১
ক্রোম্যাটিড, ২২
ক্রোমোমেয়ার, ৯৮
ক্রোমোজোম-যোজক স্থাপন, ১১০
ক্রসিং ওভার, ১২৩
কৃত্রিম গর্ভাধান, ১২০

খাঁজ-সৃষ্টি (process of furrowing), ৯৩
খাদ্য-ভ্যাকুওল, ৩৬

গলজি এপারেটার্স, ৭১, ৭৩
গলজি কমপ্লেক্স, ২৫, ৭৩
গলজি-কিল্লী, ৭৫
গলজি-বডি, ১১৯
গর্ভাধান, ১০৪
গ্যাস্টুলা, ১৩২
গামা রশ্মি, ২

banglainternet.com
banglainternet.com

গুয়ানিন, ৯৬
গোত্রহীন, ১২০
গৌণ-প্রাচীর, ৪২
গ্রাউন্ড কলা, ১৪৭
গ্র্যানা, ২৮
গ্র্যাফিয়ান ফলিকল, ১১৬

চতুর্থ দশা, ৯১
চন্দ্রিকা কোষ, ১৪৭
চৌম্বক লেন্স, ১৫

জটিল অণুবীক্ষণযন্ত্র, ৯
জননকোষ, ১০৪
জননকোষীয়, ১০৬
জরায়ু, ১২০
জাইগোট, ১০৪
জাইগোটিন, ১১০
জারণ, ৩৩
জার্মিনাল এপিথেলিয়াম ; ১১৫-১৬, ১১৮
জিন, ৯৬
জীবনের ভিত্তি, ১-১২
জীবজনি, ৮৩
জীবনকাল, ১৪৭
জুভেনাইল হরমোন, ১৪৯
জোড়বদ্ধ হওয়া, ১১০

ঝিল্লী-দশা, ৩২
ঝিল্লীর ভেদ্যতা, ৩২
ঝিল্লী-সিস্টেম, ১৪

টান, ৫৫
টেলিস্কোপ, ২
টোনোপ্লাস্ট, ৩৫
ট্র্যাডেসক্যানসিয়া, ১০০
ট্রাপামাইওসিন, ১৩৭

ডারউইন, ৪
ডায়াগ্রাম, ১৩
ডায়াকাইনেসিস, ১১২
ডায়াটম, ৫৩
ডিক্টিওজোম, ২৬
ডি. এন. এ. ৪০, ৯৭
ডিনোফ্ল্যাজিলেট, ৫৩
ডিপ্লোটিন, ১১২, ১২৬
ডিম্বনালী, ১২০
ডিম্বাণু, ১০৪, ১১৫
ডিসোক্সি রাইবোজ নিউক্লিইক এসিড, ৯৬
ডেসমিড, ৫৩
ডেসমোজমস, ২০
ডোরা পেশী, ৬৯
ড্রসোফিলা মেল্যানোগ্যাস্টার, ১৩৯, ১৪০

তরল দশা, ৩২
তরুণাস্থি, ৪৭
তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী, ২
তুলনামূলক কোষবিদ্যা, ৬৬
তৃতীয় দশা, ৯১

থাইরয়েড গ্রন্থি, ১৪৯
থাইসিন, ৯৬
থিয়োডর শোয়ান, ৪

দশা-বৈসাদৃশ্য শনাক্তকারী অণুবীক্ষণযন্ত্র, ১১
দ্বশামধ্যক, ৮৬, ৯১
দানাদার অন্ত প্লাজমীয় জালি, ২৩
দ্বি-কুণ্ডলন, ৯৭
দ্বিগুণী, ১০৬
দ্বিতীয় দশা, ৮৮
দ্বিযোজী, ১১০
দীপন, ৯
দেহরক্ষা, (Protection), ৪১
দ্বৈত প্রকৃতি, ১৬
দৃঢ় ও টেকসই করা (elasticity), ৪১

ধাত্র, ৩৩

নমনীয়তা, ৪০
নিউক্লিয়াস, ১৪, ৩৭
নিউক্লিয়াসের পৃথগীভবন, ১৩৮-৪০
নিউক্লিওলাস, ৩৯
নিউক্লিইক এসিড, ৮৮
নিউক্লিয় ঝিল্লী, ২২, ৩২
নিউক্লিয় রস, ৩৯
নিউরাল ক্রেস্ট, ১২৯
নিউরোব্লাস্ট, ১০০
নিষিক্ত ডিম্বাণুস্থিতি, ১০৬
নিষেক, ১০৪
নিরক্ষীয় অঞ্চল (equator of the spindle), ৭৮
নীল-সবুজ শৈবাল, ৭৯
নৈর্বাচনিক ভেদনযোগ্য ঝিল্লী, ১৬

পত্র হরিৎ, ২৮
পলিও, ৮০
পলিস্যাকারাইড, ৪১
পরমাণু পর্যায় সারণী, ৩
পরিবাহী কোষ, ৭১
পরিব্যক্তি, ২২৩
পর্যায় মধ্যক, ৮৬
পরোক্ষ নিউক্লিয় বিভাজন, ৮৬
পাইরিমাইডিন, ৯৬
পাতানো, ১৫
পানি ধারণ (water retention), ৪১
পারমিয়াসেস, ১৭
পারস্পরিক সম্পূরক তত্ত্ব, ৭
প্যাকাইটিন, ১১২
পিউপারিয়াম, ১৪৯
পিউরিন, ৯৬
পিনোসাইটোসিস ১৭
পি, পি, এল, ও (Pleuropneumonia like organism), ৫৯, ৬০, ৬৬
পীতজ্বর, ৮০
পেকটিন, ৪২
পেশীসূত্র, ৬৯
পোলার বডি, ১১৭
পৌষ্টিক তন্ত্র, ৭২
প্লাজমা কোষ, ৭৪, ৭৫
প্লাজমা ঝিল্লি., ১৪-২০, ৩২
প্লাস্টিড, ২৮, ৩০
প্রকৃত কোষ, ৭৭
প্রতিপ্রভ পর্দা, ১০
প্রথম দশা, ৮৮
প্রাইমারী স্পারম্যাটোসাইট, ১১৯
প্রাইমারী য়ুসাইট, ২০
প্রাক-জীবন, ৮৩
প্রাক-লোহিত রক্ত কণিকা, ৭৪
প্রাক-প্লাস্টিড, ৩০
প্রাক শুক্রাণু, ১১৮
প্রাকৃতিক নির্বাচন, ১২৪
প্রোটোজোয়া, ৩৬

banglainternet.com banglainternet.com

প্রোজেক্টর বা প্রক্ষেপক, ৯
পৃথগীভবন, ২৭, ১২৮, ১৩০
পৃথগীভবন বনাম বৃদ্ধি, ১৩০
পৃষ্ঠটান, ১৬, ৫২

ফলিকল কোষ, ১১৬
ফসফোরিক অ্যাসিড, ৯
ফ্যাগোসাইট, ১৪৮
ফ্যাগোসাইটোসিস, ১৭
ফাঁকা অঞ্চল (cisternae), ৩৫
ফার্টিলাইজিন, ১২১
ফ্লাজেলা, ৩৭, ৭০
ফিব্রোসাইটি, ৯৯

বন্ধক, ১১, ১৫, ১৪৫
বর্ণালী, ২
বহিস্ত্বক, ১৪৬
বাইভ্যালেন্ট, ১১০
বার্স্ট কোষ, ৩২
ব্যয়িত শক্তি, ৬৮
ব্যাকটেরিয়া, ৩১, ৫২
ব্যানিস্টার, ৯৭
ব্যাপন, ৬১
বিকশিত, ১২৫
বিকাশ, ১২৫
বিবর্তনবাদ, ৪
বিবিধায়ন, ৭
বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ৯, ১০, ১৫
ব্রিস্টল কোন পাইন, ১৪৩
বেম, ৮৮
বেম-প্রোটিন, ৯২
বেম-প্রোটিন সূত্র, ৯৮
বেসফেট ঝিল্লী, ৪৭
ব্লাস্টুলা, ১৩২
বৃক্ক কোষ, ৭২
বৃক্ক নলিকা, ৭৩
বৃদ্ধি, ১২৬
বৃদ্ধি হরমোন, ১৪৯
বৃদ্ধির আপেক্ষিক হার, ১২৬

ভাইরাস, ৮০
ভ্যাকুওল, ৩৫
ভিটেলাইন-ঝিল্লী, ১২১
ভিত্তি উপাদান, ৪৬
ভিসিয়া ফেবা (বড় সীম), ৮৫
ভেদ্য ক্ষমতা, ৪১
ভৌতিক একক, ৩
ভ্রূণ, ১২৮-১৩৭

মধ্যখণ্ড, ১১৯
মধ্যচ্ছদা, ১৫১
মধ্য ল্যামেলা, ৪১
মসৃণ পেশী, ৭১
মাইওসিন, ৬৯, ১৩৭
মাইওসিস, ১০৪
মাইওফিব্রিল, ৬৯
মাইকোপ্লাজম, ৫৯
মাইক্রন, ২, ৩, ৯, ১৫
মাইক্রোটোমী, ১৫
মাইক্রোভিলি, ২০, ৭২, ৭৩
মাইটোসিস, ৮৬, ১০৪, ১২৪
মাউন্ট, ১৪৫
মাতৃকোষ, ৯৭
মাতৃকোষাবাস, ১১৮
মানুষের ডিম, ১২৬
ম্যাক্স হ্যামারলিং, ৩৭
ম্যাট্রিক্স, ৩২
মিটোকণ্ড্রিয়া, ২৫, ২৮, ৩১-৩৪
মিটোকণ্ড্রিয়া-ঝিল্লী, ১৭
মিলিমিটার, ২, ৩
মুখ্য প্রাচীর, ৪২
মুখ্য মাতৃকোষ, ১১৯
মুককীট, ১৪৯
মূল শীর্ষের বিভাজনরত কোষ, ৮৫
মেটামরফসিস, ১৪৮
মেট্রিক পদ্ধতি, ৩
মেলানিন, ৫৮, ১২৮, ১৩০
মেলানোজোম, ১২৯, ১৩০
মেলানোব্লাস্ট, ১২৯
মেলানোসাইট, ১২৮, ১২৯

রক্তরস, ১৪৫
রক্তশূন্যতা রোগ, ১৪৭
রজঃস্রাব, ১১৬
বড় নিউক্লিয়াস, ২৫
রঞ্জক, ১১
রঞ্জনরশ্মি, ২
রবার্ট হুক, ৪
রাইজয়েড, ৫৩
রাইবোজম, ২৩, ৭৩
র‍্যাবিজ, ৮০
রুডল্‌ফ্‌ ফিরখভ, ৬
রূপান্তর ক্রিয়া, ১৪৮
রেচন তন্ত্র, ৭২
রেটিনা, ১৩
রেটিকুলীন, ৪৮
রডি ফ্রান্সিস, ৮৩

লাইসোজোম, ৩৪
লালাগ্রন্থি, ১৩৯
ল্যামিলি, ২৮-৩৫
লিউকোসাইট, ৫৯
লিউপার্ড ব্যাঙ, ১৪৮
লিগনিন, ৪৫
লিন্ট, ৪৪
লিন্ট কোষ, ৪৪
লিপিড, ১৬
লিপো-প্রোটিন, ৩২
লিংকেজ গ্রুপ, ১২৩
লুই পাস্তুর, ৫৯
লুঝুলা, ১১০
লেপটোটিন, ১০৯
লোহিত রক্ত কণিকা, ৭৩, ১৪৫

শততমিক পদ্ধতি, ৩
শর্করা, ৯৬
শর্তবদ্ধকোষ, ১৩৩
শুক্রাণু, ১০৪, ১১৫
শুক্রাণু-পুচ্ছ, ৩৬
শুক্রাশয়, ৭৫
শূককীট, ১৪৯
শ্বেত কণিকা, ৫৯, ১৪৫
শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি, ২-৩
শোয়ান কোষ, ২০
শৈবাল, ৩০

সমাঙ্গ বাঁড়ি, ১৪৯
সমুদ্র সজারু, ৪৭

banglainternet.com banglainternet.com

স্বতঃজনন, ৮৩
স্তম্ভাকার কোষ, ৭২
সংকোচনশীল কোষ, ৬৮
সাইটোকাইনেসিস, ৮৬
সাইটোপ্লাজম, ৮, ১৪, ২১, ২৩
সাইটোপ্লাজমীয়-ক্ষুদ্রাঙ্গ, ২৭
সাইটোসিন, ৯৬
সারটোলি কোষ, ১১৮
সারকোলেমা, ৬৯
সারকোমেয়ার, ৭০
সালোক-সংশ্লেষণ, ২৮
স্যাটেলাইট কোষ, ২৩
সিন্যাপসিস, ১১০
সিলিয়া, ৩৬
সি, এইচ, ওয়েডিংটন, ১৩১, ১৩২
সুবেদী, ২
সুস্থিত কাল, ১১০
সেন্ট্রিওল, ৩৬, ৩৭, ৯২, ৯৮
সেন্ট্রোজোম, ৩৫, ৩৬, ৯১
সেবাসিয়াস গ্রন্থি, ২৪
সেমিনিফেরাস টিউবিউলস, ১১৯
সেলুলোজ, ৪৩
স্ট্রোমা, ২৮
স্ত্রী প্রাক-নিউক্লিয়াস, ১১৮
স্নায়ুকোষ, ২০, ২১, ৫৭
স্পাইরোগাইরা, ৩০
স্পারম্যাটিড, ১১৯
স্পারম্যাটোগোনিয়া, ১১৯
স্পারমাটোসাইট, ১১৮

হাইড্রোল্যাসেস, ৩৪
হাম, ৮০
হায়ালুরোনিডেজ, ৪৭
হায়ালুরোনিক এসিড, ৪৬
হিমোগ্লোবিন, ৭৩
হিস্টোন, ৪০, ৯৭
হোয়াইট মাউন্টেইন, ১৪৩
হ্রাসপ্রাপ্ত, ১০৬

যুসাইট, ১১৫

banglainternet.com